বৃষ্টিতে ভেজার বয়স

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭১, ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রচ্ছদপট

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শব্দগ্রন্থন

টেকনোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ণ, ১৫৯/১এ বি. বি. গাঙ্গুলী
স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

নৃপেন - তপু - দীপু - পল্টু
'মিত্র ও ঘোষের'
কনিষ্ঠদের

বৃষ্টিতে ভেজার বয়স

এক

সেই সাতসকালে ঘুম ভেঙেছে আজ। তখনও গাছগাছালি আঁধারমাখা। কাকগুলো ডাকবে কি ডাকবে না ভাবছে। সূর্য পৃথিবীর নিচে। তার উঠে আসতে ঢের দেরি, কিন্তু তারা জানান দিচ্ছে আগাম আসা না-আলো এক মোলায়েম দ্যুতি, যা পথঘাটকে করেছে কিছুটা দৃশ্যমান!

বিছানা ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মনে হল আলো জ্বালা দরকার। ঘরের ভেতরটা এখনও আবছা। আলো জ্বাললেন কুহেলি। সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় বিকশিত হল তাঁর প্রতিবিম্ব। লম্বায় পাঁচফুট আট ইঞ্চি, ওজন বাষট্টি, কোথাও মেদের প্রকাশ নেই। একদা নিতম্ব ছাড়ানো চুল ছেঁটে ছেঁটে এখন কাঁধের সীমারেখায়। গত কুড়ি বছরে সময় স্থির হয়ে আছে সর্বাঙ্গে। এই এখন বিছানা থেকে উঠেছেন অন্তর্বাসহীন অবস্থায়। কিন্তু বুকের ঢেউ তেমনই উত্তাল। শুধু, চোখের নিচে হাঁসের পায়ের ছাপ পড়ছে কয়েকদিন হল। কোন কিছুই সেটাকে নির্মূল করতে পারছে না, বাইরে বেরুবার সময় অবশ্য সাময়িক অদৃশ্যে রাখা যায়। আজ সকালে চোখের তলার রেখাগুলোকে যেন আরও স্পষ্ট বলে মনে হল।

তিনতলা বাড়ি। একতলায় ভাড়াটে থাকে। দোতলায় তিনি একা। তিনতলায় ছোট মেয়ে, ছোট ছেলে। বাকিরা সবাই এই শহরেই। তাদের সবাই জানে আজকে এই বাড়িতে আসতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ আসবে না। যেমন বড় ছেলে। সে অধ্যাপনা করে। এই বাড়িটাকে সে পছন্দ করে না। কুহেলি অনেকবার তাকে ডেকেছেন, সামনে বসে কথা বলতে বলেছেন কিন্তু তাতেও সে রাজি নয়। বাকিরা আসবে। অনিচ্ছা থাকলেও আসতে হবে। কলকাতা শহরের মাঝখানে এত বড় বাড়ির ভবিষ্যৎ অংশীদার ওরা। না এলে যদি অধিকার হাতছাড়া হয়ে যায়। কুহেলি স্বীকার করতে বাধ্য, তাঁর বড় ছেলে ব্যতিক্রম।

সকাল সাতটায় ফুলওয়ালা এসে গেল। দোতলার হলঘরের এক প্রান্তে সদানন্দের ছবিটি গতকালই পরিষ্কার করিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে বলেছিলেন কুহেলি তাঁর পরিচারিকাকে। ফুলওয়ালা সেই ছবিকে দাঁড় করিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে বলল, 'খুব ভাল ফুল মা, তিনদিনেও পচবে না।'

কুহেলি দেখলেন সদানন্দের গম্ভীর মুখের চারপাশে ফুলের বলয়। টেবিলটিতেও ফুলের সাজ। খানিক বাদে আলোওয়ালা এল। দুপাশ থেকে দুটো আলোর ফোকাস ফেলল ছবির ওপর। বলল, 'মা, বিকেল হলে এই সুইচটা টিপে দেবেন। ছবিতে আলো ভরে যাবে।'

আর একটু বেলা হলে ক্যাটারারকে টেলিফোন করলেন কুহেলি, 'আমার স্বামী যা যা খেতে ভালবাসতেন তা আপনারা জানেন। গতবার ফ্রাই নিয়ে কমপ্লেন ছিল। উনি মচমচে ফ্রাই পছন্দ করতেন। এবার যেন ভুল না হয়।'

'না ম্যাডাম! এবার সব ঠিক থাকবে।' ক্যাটারার বলল, 'নাম্বার অফ হেডস একই থাকছে তো?'

'হ্যাঁ। বাড়লে আপনার সুবিধে কিন্তু পেমেন্ট তো আমাকেই করতে হবে।'

'না, না, মানে আমি ব্যবসা ভেবে বলিনি। ঠিক আছে খাবার ঠিক মতো পৌঁছে যাবে। ও হ্যাঁ, কততম জন্মদিন যেন এটা?'

'জন্মদিন নয়,' কুহেলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ ওঁর মৃত্যুদিন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

এই প্রশ্নটা শুনতে হয়েছিল গত বছরে যখন অনুষ্ঠানটা চালু করেছিলেন। বড় মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছিল, 'মা, বাপীর জন্মদিনে না করে মৃত্যুদিনে এসব করছ যে?'

'এ বাড়িতে কখনও কারও জন্মদিন পালন করা হয়েছে?'

বড় মেয়ে মাথা নেড়েছিল, 'না, হয়নি। তাই বলে মৃত্যুদিনে খাওয়া দাওয়া হৈ হৈ করা কি ঠিক?'

এই মেয়ে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। মাত্র সতেরো বছরের ব্যবধান ওঁদের মধ্যে। একেবারে সাদামাটা নিপাট আটপৌরে। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কুহেলি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলেন, 'তোমার বাবার মৃত্যুদিন মানে আমার মুক্তিদিন। মুক্তিদিন মানে উৎসবের দিন।'

অবাক চোখে তাকিয়েছিল বড় মেয়ে। যেভাবে তাকালে মনে হয় বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ঠিক সেইভাবে। চোখ সরিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকে যেটুকু দেখেছ তাতে কি মনে হচ্ছে আমি ভুল বলছি? হ্যাঁ, আজ আমার মুক্তির দিন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, অন্য ছেলেরা বা ছোটমেয়ে এ নিয়ে একটাও কথা বলেনি।

দুপুরে ফোন এল মিস্টার পাকড়াশির, 'ম্যাডাম কি খুব ব্যস্ত?'

'কি বলছেন মিস্টার পাকড়াশি! আপনি ফোন করেছেন, এ আমার সৌভাগ্য।'

'অনেক ধন্যবাদ, আমাকে এই সম্মান দিলেন বলে। হ্যাঁ, যে কারণে ফোন করছিলাম, আমার কিছু জমি আছে বালিগঞ্জ লেকের ধারে। গোবিন্দপুরের দিকটায়। যতদূর জানি মিস্টার সেনও কাঠা দশেক জমি কিনেছিলেন জলের দামে। এখন তো ওসব জায়গা দারুণ ডেভলপ করছে। ভাবছিলাম ওখানে হাউসিং কমপ্লেক্স করে ফ্ল্যাট বিক্রি করব। প্রচুর প্রফিট। আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে কথা বলা যেতে পারে।'

কুহেলি দশ সেকেন্ড সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'এ ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে।'

'আপনি আজ কীরকম ব্যস্ত?' মিস্টার পাকড়াশি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ বাড়িতে ছেলেমেয়েরা আসবে। কথা না হোক, আপনি এলে খুব খুশি হব।'

'না না। আপনাদের পারিবারিক সম্মেলনে আমার উপস্থিতি ঠিক হবে না।'

'সম্মেলন আবার কি? আজ মিস্টার সেনের মৃত্যুদিন। সেই উপলক্ষেই, চলে আসুন। আটটা নাগাদ। প্লীজ! বাই।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুহেলি।

অদ্ভুত ব্যাপার! সদানন্দ সেন যে লেকের ধারে দশ কাঠা জমি কিনেছিলেন তার কোন রেকর্ড বাড়িতে রেখে যাননি। লোকটা নিজেকে ছাড়া কাউকে কিছু জানতে দিতে চাইত না। মিস্টার পাকড়াশি ফোন না করলে তিনি চিরকাল এ ব্যাপারে অন্ধকারেই থাকতেন। মিস্টার পাকড়াশি সদানন্দ সেনের বন্ধু নন। ব্যবসাব সূত্রে পরিচয়। এই বাড়িতে এসেছিলেন মাত্র দু'বার। সদানন্দের একটা অভ্যেস ছিল, এ বাড়িতে যেই আসুক তার সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিতেন। সেসময কুহেলি যে অবস্থায় থাকুন তাকে ছুটে আসতে হত বসার ঘরে। 'ইনি অমুক, ইনি আমার মিসেস। যাও, চা বা কফি পাঠিয়ে দাও।' শুধু এইটুকু। কুহেলির মনে হত উনি আগন্তুককে দেখাতে চাইতেন তার স্ত্রী কীরকম সুন্দরী। ছোট মেয়ে হওয়ার বছর খানেক বাদে এক রাত্রে নেশার ঘোরে বলেছিলেন, 'এতগুলো বাচ্চা বিইয়েছ তবু শরীরের বাঁধন এত টাইট থাকে কি করে? অ্যাঁ?'

সদানন্দের জীবদ্দশায় ফোন করেননি মিস্টার পাকড়াশি। আজ এতদিন পরে করলেন কারণ তাঁর স্বার্থ আছে। কিন্তু নিজের স্বার্থের কারণে তিনি অজান্তেই তাঁর সামনে আর একটি প্রাপ্তির হদিস রাখলেন। লোকটির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা দরকার।

তিনবছর আগে সদানন্দ সেন তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ কুহেলি জানেন না। কোন উইল তো দূরের কথা, কোন ডায়েরিতেও লিখে যাননি কোথায় কী রেখে যাচ্ছেন। নিজের ব্যবসাটা একটা বড় কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে পাঁচবছরের চুক্তিতে মাসিক মোটা টাকা পেয়েই খুশি ছিলেন। কোন ঝামেলা নেই, মাসের এক তারিখেই পেয়ে যাচ্ছেন টাকা। সেটা চার বছর হয়ে গেল।

আর একটি বছর শেষ হলে ওই টাকা পাওয়া যাবে না। ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি অর্থ সাহায্য আশা করেন না। বড় না হয় তাকে ত্যাগ করেছে, মেজ ভাল চাকরি করে। তার ওপর সঞ্চয়িতা চিট ফান্ডে টাকা ঢেলে মোটা সুদ রোজগার করেছে। ওই চিটফান্ড ভরাডুবি হওয়ার ঠিক আগে সে টাকা তুলে নিয়েছিল। বুদ্ধিমান বলেই এই বয়সে ভাল বিষয় সম্পত্তি করে ফেলেছে। সেজ

ছেলে ব্যবসা করে। নেহাতই গোবেচারা। দুজনের কারও মনে হয়না এবাড়ির খরচের একটা অংশ ওদের বহন করা উচিত। ছোটছেলে এখনও নাবালক। সে তার ছোটদিদির সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে। ছোটদিদির বয়স এখন সতেরো।

দুপুরে তিনতলায় উঠলেন কুহেলি। রেডিওতে হিন্দি গান বাজছে আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট মেয়ে সমানে নেচে যাচ্ছে। দর্শক ছোট ছেলে। সে হাততালি দিচ্ছে। মাকে তিনতলায় উঠে আসতে দেখে থেমে গেল ওরা।

ছোট মেয়ের নাম পাখি। কাছে এসে বলল, 'রিহার্সাল দিচ্ছি মা।'

'কিসের রিহার্সাল?'

'ফিল্মি ড্যান্স কম্পিটিশান। স্কুল থেকে নাম চেয়েছে।'

'স্কুল থেকে?' অবাক হলেন কুহেলি। আজকাল স্কুলে ফিল্মের নাচের প্রতিযোগিতা হয়? মেয়ের দিকে তাকালেন। পড়াশুনায় কখনই উৎসাহ পায়নি। শেষ ধাপ অবধি উঠেছে কি করে সেটাই বিস্ময়। যেভাবে ফিল্মের নাচের রিহার্সাল দিচ্ছে সেভাবে যদি পড়াশুনা করত!

ছোট ছেলের নাম শুদ্ধ। তার দিকে তাকালেন, 'তোমার কি খবর?'

'নাচ দেখছি!'

'পড়াশুনা?'

'আমার ভাল লাগে না।'

'বাঃ। বড় হয়ে কি করবে?'

'আমি দিদির সেক্রেটারি হব।'

'বাঃ। দিদির সেক্রেটারির দরকার কেন হবে?'

'ফিল্মস্টাররা তো নিজেরা কথা বলে না। তাদের সেক্রেটারি বলে। দিদি একদিন খুব বড় ফিল্মস্টার হবে। আমি ওর সেক্রেটারি হয়ে সব দেখাশোনা করব।'

দুই ছেলে-মেয়ের দিকে তাকালেন কুহেলি। ছোট মেয়ের চেহারা খুবই সুন্দর। ফিগারও চমৎকার। পড়াশুনা যে হবে না তা বোঝাই গেছে, ফিল্মে অভিনয় করে যদি জীবনে দাঁড়াতে পারে, করুক। কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

নেমে এলেন নিচে, নিজের ঘরে। টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলে খুব মিষ্টি গলায় বললেন, 'হেলো।'

'উঃ, কুহেলিদি, তোমার গলায় এত মধু কি করে ঝরে বল তো। আমি যদি ছেলে হতাম প্রথম দিনেই তোমার প্রেমে পড়ে যেতাম।' শিবানীর গলা।

'তাই!'

'ইস। তুমি যেন জানো না।'

'কেমন চলছে?'

'ভাল। শোন, আজ সন্ধেবেলায় ফ্রি আছো? একজন তোমার সঙ্গে আলাপ

করতে চায়। একদিন বোধহয় দূর থেকে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখেছিল।'

'একজন!'

'বিখ্যাত মানুষ। তুমি শোভন দাশগুপ্তের নাম শুনেছ?'

'বাঃ। শুনব না কেন? বিখ্যাত লেখক।'

'শুধু বিখ্যাত লেখক নয়। ওঁর সব লেখাই সিনেমা হয়। দারুণ চিত্রনাট্য লেখেন। শোভনদা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আসবে?'

'আজ হবে না ভাই। শুনে আমারও খুব ইচ্ছে করছে কিন্তু—!'

'কিছু কাজ আছে?'

'কাজ মানে, আজ আমার মুক্তিদিবস। তাই ছেলেমেয়েদের ডাকি, সবাই মিলে একটু খাওয়াদাওয়া করি!' হাসলেন কুহেলি।

'মুক্তিদিবস কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না!'

'জেলখানায় বন্দি ছিলাম, এই দিনটায় মুক্তি পেয়েছিলাম। ঠিক আছে, তোমরাই বরং চলে এসো। ন'টার মধ্যে ছেলেমেয়েরা ফিরে যায়, তারপর আমরা আড্ডা মারব।'

'যেতে পারি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'বিন্দুমাত্র না।'

টেলিফোন রেখে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন কুহেলি। শিবানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মেয়ের স্কুলে। কোন এক অনুষ্ঠানে। তখন সদানন্দ অসুস্থ। কিডনি কাজ করছে না। সেই সঙ্গে হাইসুগার। প্রথম আলাপেই বলেছিল, 'বাঃ, আপনি তো খুব সুন্দরী। সিনেমায় নামেন না কেন?'

কুহেলি জবাব দিয়েছিলেন, 'শুনেছি নামলে আর ওঠা যায় না, তাই।'

খুব হেসেছিল শিবানী। তারপর ফোনে কথা। বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শিবানীর স্বামী জাহাজে চাকরি করেন। ছয়মাস বাইরে থাকেন। তখন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন? স্বামীর রোজগারও ভাল। প্রচুর ছেলে বন্ধু শিবানীর। কিন্তু তাদের কারও বয়স পঁয়তাল্লিশের নিচে নয়। এ ব্যাপারে ওর বক্তব্য, 'আমার বন্ধুরা সবাই বিবাহিত, ছেলে-মেয়ের বাবা। তাই পিছুটান আছে। সব ছেড়েছুড়ে আমাকে বিয়ে করতে পাগল হবে না। আর ওই বয়সের স্বচ্ছল পুরুষদের হাতে ভাল টাকা থাকে। ফলে সন্ধেগুলো আরামসে কাটে। এরা সবাই জানে কর্তা এলে ছয়মাস আমার দেখা পাবে না। সে-সময় কেউ বিরক্ত করে না।'

'যদি জানাজানি হয়ে যায়?'

'কি জানবে? সপ্তাহে একবারের বেশি আমি একজনের সঙ্গে মিশি না। কার সঙ্গে জড়াবে আমাকে? তুমি এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ওদের।'

আলাপ করতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সদানন্দের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত।

চোখ বন্ধ করলেই এই জীবনটা সিনেমার মতো সামনে চলে আসে। কী ভয়ঙ্কর দিনগুলো পার করে এসেছেন তিনি।

বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সে। পাত্রের বয়স ত্রিশ কিন্তু নিজের বিশাল বাড়ি, রমরমা ব্যবসা। মায়ের একটু আপত্তি ছিল পাত্রের বয়স নিয়ে। বড় মামার আপত্তিতে সেটা টেঁকেনি।

ফুলশয্যার রাত্রে শাশুড়ি কাছে ডাকলেন তাঁকে, 'শোন বউমা, তোমাকে একটা কথা বলি। একমাত্র ছেলে, বিয়ে করবে না বলে পণ করেছিল, শেষতক রাজি করিয়েছি। কেন বিয়ে দিয়েছি তা জানো তো?'

মাথা নেড়েছিলেন কুহেলি।

'বংশধর চাই। দশমাসের মধ্যে মা হতে হবে তোমাকে। ও একটু বারমুখো আছে। তা কোন্ ছেলেই বা না থাকে। একটা বাচ্চা হয়ে গেলে দেখবে তোমার আর খারাপ লাগবে না। তাকে নিয়েই সময় কেটে যাবে।' শাশুড়ি বলেছিলেন।

রাত্রে দরজা বন্ধ করে স্বামী বললেন, 'আমি রোজ মাল খাই। গন্ধটা তোমাকে সহ্য করতে হবে। গেঁয়ো মেয়েছেলের মতো কান্নাকাটি কোরো না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে আজ, চটপট শাড়িটাড়ি খোল।'

খাটের মাঝখানে ফুলের বিছানায় সিঁটিয়ে বসেছিলেন কুহেলি। তখন তাঁর বয়স যা তাতে যৌন অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। অত্যন্ত আব্রু রেখে চলতে অভ্যস্ত একটি কিশোরীকে শাড়িটাড়ি খুলতে বললে সে তো চোখে অন্ধকার দেখবেই।

শাড়ি খুলল। জামা ছিঁড়ল, সায়াও। যত দ্রুত বাধা সরানো যাবে তত যেন লক্ষ্যবস্তুতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে। তারপর শরীর ছিঁড়ল। ছিঁড়তে ছিঁড়তেই উৎসাহ চলে গেল নতুন বরের, নেশায় ঢলে পড়লেন বিছানায়। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে কুহেলির মনে হল, যাক, আজ রাতের মতো হয়তো নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু তখনই তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা দেখে চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল। মনে পড়ল বিয়ের আগে বউদিদের পরামর্শ এবং উপদেশ, তার শরীরের ভেতর একটা পর্দা ছিল। সেটা চিরকালের জন্য ছিন্নভিন্ন হল আজ রাত্রে।

পরদিন শাশুড়ি হেলতে দুলতে ঘরে এলেন, 'ঘুম থেকে উঠেই স্নান করেছ তো?'

মাথা নেড়েছিলেন কুহেলি, না।

'সেকি! যাও তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো। ওসবে শরীর বাসি করে বসে আছ? তোমার কি লজ্জাঘেন্না বলে কিছু নেই? যাও!'

এটা ঠিক, শাশুড়ি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। যতই কথা শোনান, কিন্তু জীবন কি, তাকে কিভাবে মেনে চললে সমস্যা কমে তা প্রায় হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। মধ্যরাত্রে ফোন এল, অতিরিক্ত পান করা হয়ে গেছে বলে

পতিদেবতা বন্ধুর বাড়িতে থেকে যাবেন। শোনামাত্র বুক নিংড়ে জল উঠে আসত চোখে। শাশুড়ি সেটা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'কার জন্যে কাঁদছ তুমি? সে তো পুরুষ। পুরুষ মানুষের জন্যে কেঁদে মরে কী লাভ! প্রয়োজনের সময় ওদের ব্যবহার করবে, অন্যসময় মুখ ফিরিয়ে থাকবে। কখনই জড়াবে না। মন জড়ালেই কেঁদে মরতে হবে। তুমি আমাকে খাওয়াপরা আর মাথার ওপর ছাদ দিয়েছ, আমি তোমার সন্তান পেটে বয়েছি নয় মাস, ব্যাস শোধ হয়ে গেল দেনা।'

দশমাসের মাথায় সন্তান এসে গেল পৃথিবীতে। প্রথম সন্তান ছেলে। সদানন্দ হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। বাড়িতে বন্ধুদের নিয়ে এসে বাহারি মদের আয়োজন করালেন। যেন পৃথিবীতে এই প্রথম কারও একটি পুত্র সন্তান জন্মাল।

শাশুড়ি ঠিকই বলেছিলেন। ছেলেকে নিয়ে দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছিল কুহেলির। যেন ও একটা পুতুল আর ওকে নিয়ে পুতুলখেলা। এ বাড়িতে কিভাবে বাচ্চা বড় হয় তা শিখিয়ে দিয়ে শাশুড়ি চলে গেলেন তার বোনের সঙ্গে পুরী ভ্রমণে। অবশ্য তখন এবাড়িতে কাজের লোকের অভাব ছিল না। স্বামী যখন ঘুমাতে এই ঘরে আসতেন তখন বাচ্চাটাকে কাজের লোকের কাছে পাঠাতে হত। যার জন্মে গর্বে স্বামী আটখানা হয়েছিলেন, নেশা হওয়ার পর তার কান্না সহ্য করতে তিনি পারেন না। ঘরে ঢুকেই তার চিৎকার, 'এটা এখানে কেন? হোয়াই?'

'যদি ওকে দেখতে চান?'

'ওই বাঁদরছানাকে দেখার কোন ইচ্ছা আমার নেই, বলে দিলাম। ও যখন কথা কইবে, হাঁটতে শিখবে তখন আমার কাছে পাঠাবে। মনে থাকে যেন। একি? হোয়াট ইজ দিস? তুমি আমার লিগ্যাল ওয়াইফ কি না? উত্তর দাও?'

'হ্যাঁ। তাই তো!'

'তাই তো? তাহলে কাপড় ছাড়োনি কেন? আমি তো অন্যায় কিছু করছি না। আমার আইনসম্মত বউ-এর সবকিছু দেখার আইনসম্মত অধিকার আমার আছে। সাহেবরা বিছানায় জামাপ্যান্ট পরে শোয় না। ওপেন, ওপেন—!' কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল দ্রুত।

শরীর। শুধু শরীর ছাড়া আর কিছুর চাহিদা ছিল না সদানন্দের। কুহেলি জানতেন তাঁর স্বামীর ব্যবসা আছে। সারাদিন নাকি তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দ্বিতীয় বার পেটে সন্তান আসতেই শাশুড়ির কাছে কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন কুহেলি। শাশুড়ি বলেছিলেন, এইটে হয়ে যাক, তারপর আর না। ওকে লুকিয়ে আমি তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসব যাতে আর বাচ্চা না হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার আগেই শাশুড়ি মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে।

মেয়ে হল। ফুটফুটে মেয়ে। পতিদেবতা আদিখ্যেতা করে বললেন, 'মা এসেছে আবার এই সংসারে, মেয়ের চেহারা নিয়ে।'

দুটো বাচ্চা তো বটেই, পুরো সংসারটা ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে বসল উনিশ বছরের কুহেলির কাঁধে। এই সময় বাঙালি মেয়েদের শরীর হয় মুটিয়ে যায় নয় ক্ষয়ে যায় দ্রুত। কিন্তু কুহেলির কোনটাই হল না। দিনরাত পরিশ্রম করেও বিশ্রামের জন্যে মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। দ্বিতীয় বাচ্চা পৃথিবীতে আসার পর মাস কয়েক স্বামী তাঁর বিছানামুখো হননি। তারপর যখন আবার সক্রিয় হতে চাইলেন তখন জীবনে প্রথমবার আপত্তি জানিয়েছিলেন কুহেলি।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সদানন্দ। তারপর রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'ন্যাকামি কোরো না। মেয়েমানুষের পেট খালি রাখতে নেই। রাখলেই ওখানে বদ মতলব কিলবিল করবে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় খোল। আমার আবার ঘুম পাচ্ছে।'

সন্তানের পর সন্তান আসছে অথচ শরীরের কলকব্জাগুলো একটুও বিকল হচ্ছে না। তবে সদানন্দ সন্তানদের দেখাশোনার জন্যে কাজের লোক রেখেছিলেন দু-দুজন। ছোটটি হয়ে যাওয়ার পরেও কুহেলি স্বামীকে তুমি বলতে পারেননি। একদিন বললেন। সেইরাতে বেশ বেশি পান করেছিলেন সদানন্দ। ভাল করে দাঁড়াতে পারছিলেন না। রোজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেন নিজের হাতে, আজ সেই খেয়ালও ছিল না। জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু বলে চেয়ারে বসে পড়লেন। মাথা ঝুঁকে পড়ল।

বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলেন কুহেলি। তারপর বললেন, 'চমৎকার।'

সদানন্দ হাতটা তুলে দাঁড়াতে বলতে গেলেন, পারলেন না।

'আজ আমি কথা বলব।'

'কথা? কি কথা!' জড়ানো কণ্ঠস্বর, মুখ নিচু।

'তুমি আমাকে সন্তান উৎপাদন করার যন্ত্র ছাড়া কিছু ভাবো না। আমি কথা বলতে বাধ্য হলে তোমাকে আপনি বলতাম। তুমি কখনও আমাকে তুমি বলতে বলনি। আজ ইচ্ছে করে তুমি বলছি। কেন বলছি জানো? আজ তোমাকে খুব সামান্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার।' বললেন কুহেলি।

'সামা— সামান্য—!'

'হ্যাঁ, যে নিজের শরীরের সুখ ছাড়া কিছুই জানে না। দিনের বেলায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আমি আনন্দ পাই, খুশি হই, এমন কাজ করেছ কখনও? এক বেলার জন্যেও কোথাও বেড়াতে নিয়ে গিয়েছ আমাকে? শোন, একটা কথা আজ স্পষ্ট বলি,' কুহেলি স্বামীর দিকে তাকালেন। বুঝলেন ওই চেয়ারটার সঙ্গে এই মুহূর্তের সদানন্দর কোন পার্থক্য নেই। নেশায় তলিয়ে গিয়েছেন তিনি। তবু মানুষটার শরীর তো সামনে আছে। মন খুলে কথা বললেন কুহেলি, 'আমি তোমাকে ভালবাসি না। এক ফোঁটাও না। তুমি মরে গেলে আমি বেঁচে যাব কারণ তোমার সঙ্গে আমাকে শুতে হবে না। আর একটা কথা, বছরের পর বছর তুমি

আমার সঙ্গে শুয়ে আনন্দ পেয়েছ। আমি কি পেয়েছি? সন্তানের পর সন্তান। একটি বারের জন্যেও আমি কখনও আনন্দিত হইনি।'

কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না সদানন্দের। চোখ বন্ধ, মাথা ঝুঁকে পড়েছে তার। সে-রাতে খুব নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছিলেন কুহেলি।

দিন তিনেক বাদে নিত্যকর্ম শেষ করে সদানন্দ বললেন, 'তোমাকে নিয়ে কখনও কোথাও বেড়াতে যাইনি, চল, কাল ডায়মন্ডহারবার বেড়িয়ে আসি।'

'ডায়মন্ডহাববার!' অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়াব দরকার নেই। সকালেই বেরিয়ে যাব। শিয়ালদা থেকে একঘণ্টার পথ। দুপুরে ওখানেই খেয়ে বিকেলে ফিরে আসব। তৈরি থেকো।'

বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে সে থাকে ডায়মন্ডহারবারে। তার কাছে শুনেছেন সেখানে বিরাট গঙ্গা নদী আছে। এক ঘণ্টার পথ আর কতটুকু? ফুড়ুৎ করে শেষ হয়ে যাবে। তবু কোথাও তো যাওয়া হচ্ছে। মন ভাল হয়ে গেল। সদানন্দ ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর ঘুম আসছিল না। হঠাৎ খেয়াল হল, সারাদিন এই মানুষটার সঙ্গে যে কাটাবেন, কী কথা বলবেন? বেড়াতে গিয়ে লোকে হৈ চৈ করে, হাসিগল্পে মেতে থাকে, এই লোকটি পাশে থাকলে মুখ বন্ধ করে দিন কাটাতে হবে, হোক, তবু তো একটা নতুন জায়গা দেখা হবে। দুপুরে বাইরে খাওয়া এই প্রথম হবে, সেটাও কম নয়। তারপরেই চমকে উঠলেন। হঠাৎ এতদিন বাদে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলল কেন ও? তাহলে কি—? বুকের ভেতরটা কীরকম করতে লাগল। ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকাতেন তিনি। তবে কি সেই রাত্রে চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ, মাথা ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও তাঁর বলা সব কথা শুনেছিল মানুষটা? তাই তিনদিন বাদে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে? তাহলে তো বাকি কথাগুলোও ওর কানে গিয়েছে। খুব ধন্দে পড়ে গেলেন কুহেলি।

একটা বাস্কেটে জলের বোতল, মিষ্টি, বিস্কুট, তোয়ালে নিয়ে ওরা শিয়ালদা স্টেশনের দক্ষিণ প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছিলেন সকাল সাড়ে আটটায়। প্ল্যাটফর্মের এক-পাশে তাঁকে দাঁড়াতে বলে সদানন্দ গেলেন টিকিট কাটতে। ঘন ঘন মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, কোন্ ট্রেন কখন ছাড়বে। শিয়ালদা-দক্ষিণ থেকে শুধু লোকাল ট্রেন ছাড়ে। ডায়মন্ডহারবার ট্রেন এইসময় আধঘণ্টা পরপর।

'কেমন আছেন?'

প্রশ্নটা কানে আসতে মুখ ফেরালেন কুহেলি। গায়ের রঙ ময়লা কিন্তু প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গিনী এক মহিলা, যার পরনে আঁটোসাটো সালোয়ার কামিজ, চোখে রোদ চশমা, কাঁধে সরু স্ট্র্যাপের ব্যাগ, হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন।

'আমি ঠিক—!' মাথা নাড়লেন কুহেলি।

'কুহেলি তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সুভদ্রা। আমরা একসঙ্গে ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে যাচ্ছি।'

'ও। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে?'

'সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হতে বললেন আপনি এখানে অপেক্ষা করছেন। বললেন, দেখেই চিনতে পারবে। ওর মতো সুন্দরী ওখানে কেউ নেই। সত্যি ভাই, অতগুলো বাচ্চার মা হওয়া সত্ত্বেও কি সুন্দর ফিগার রেখেছেন। এই, আমি যাচ্ছি বলে রেগে যাচ্ছেন না তো?'

নীরবে মাথা নেড়ে না বলেছিলেন কুহেলি।

সুভদ্রা হাসলেন, 'নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি কোত্থেকে উদয় হলাম। আসলে ঘটনাটা খুব সিম্পল। আপনার স্বামী আর আমার স্বামী একই ব্যবসা করেন। সেই সূত্রে আমাদের আলাপ। গতকাল বললেন, আপনাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাননি, যেতে পারেননি। আপনাকে কোন আনন্দই দিতে পারেননি। তাই আজ ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হল আপনি নাকি বেশি কথা বলেন না, কম্যুনিকেট করেন না। সারাটা দিন খুব একঘেঁয়েমিতে কাটবে। আমি যদি যাই তাহলে দুজনের সঙ্গে কথা বলতে পারব। শুনে আমার স্বামী বললেন, ওঁর একটা কাজ আছে, নইলে নিজেই আসতেন। আমাকে জোর করে পাঠালেন প্রক্সি দেওয়ার জন্যে।'

'ও।'

এইসময় সদানন্দ টিকিট নিয়ে এলেন, 'চল, ট্রেন দিয়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে।'

সেসময় লোকাল ট্রেনে ফার্স্টক্লাস কামরা থাকত। ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা সেটা এড়িয়ে চলতেন। তাছাড়া এখন শিয়ালদা ছেড়ে যাওয়ার যাত্রী খুব কম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো ফাঁকা পড়ে আছে, তাই ফার্স্টক্লাসের কামরায় উঠে দেখা গেল চতুর্থ যাত্রী নেই। পুরো কামরাটাই তাদের দখলে।

ট্রেন ছাড়ার মুখে তিনজনে বসেছিলেন পাশাপাশি। কুহেলি জানলার ধারে। সদানন্দ বললেন, 'সুভদ্রা, একটা গান গাও।'

'না! এখন না।' আদুরে আপত্তি বাজল সুভদ্রার গলায়।

'কেন না?'

'তোমার বউকে বল গাইতে।'

'সর্বনাশ। যে কথা বলে না সে গাইবে গান?'

সুভদ্রা তাকালেন, 'এই কুহেলি, তুমি গান গাইতে পার না?'

'না।' মাথা নিচু করলেন কুহেলি।

'তুমি কি পারো?' প্রশ্ন করেই হেসে উঠলেন সুভদ্রা। মুখ ঘুরিয়ে জানলা

দিয়ে বাইরে তাকালেন কুহেলি। কলকাতা নড়ছে বাইরে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর সরে সরে যাচ্ছে পেছনে। একেবারে রেল লাইনের গা ঘেঁষে বাড়ি করে আছে যারা তাদের ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা হাঁ করে ট্রেন দেখছে। কেউ কেউ রান্না চাপিয়েছে, ঝগড়া করছে কয়েকজন। সিনেমার দৃশ্যের মতো সব পালটে পালটে যাচ্ছে। তারপর আকাশটা হঠাৎই কি দারুণ নীল হয়ে গেল। এরকম নীল আকাশ কখনও দ্যাখেননি কুহেলি? কোথাও একটু মালিন্য নেই। ট্রেনটা একটা স্টেশনে থামল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য। কোন যাত্রী উঠল না এই কামরায়। একটা আস্ত প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে দেখতে পেলেন কুহেলি। পেছনে ফেলে গেল সেটা।

অলস ভাবে মুখ ফেবাতে দেখতে পেলেন ওরা পাশে নেই। বাইরের দৃশ্যে এত মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে ওদেব কথা খেয়াল হয়নি। কামরার কোথাও ওরা নেই। হঠাৎ ভয় চলকে উঠল। ওরা কি তাকে কিছু না বলে নেমে গেল? কেন যাবে? তাঁর কাছে টিকিট দূরের কথা একটা টাকাও নেই। কিন্তু এ-ভাবে যাবেই বা কেন? চলন্ত ট্রেনে প্রায় কেঁদে ফেললেন কুহেলি। তারপর উঠে দরজার কাছে যেতে চোখে পড়ল পাশের একটা দরজা নড়ছে। ধীরে ধীরে সেই দরজাটা ঠেলতেই দৃশ্যটি দেখতে পেলেন। সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন সদানন্দ। সুভদ্রাও ওঁর পিঠ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুম্বনের শব্দ কানে এল। ওটা যে টয়লেট তা এতক্ষণে বোধগম্য হল। নিঃসাড়ে ফিরে এলেন কুহেলি। সিটে বসে চোখ বন্ধ করলেন, কিন্তু তার একটুও রাগ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল দুটো অচেনা নারীপুরুষ চুম্বন করছে। তিনি জানলার বাইরে তাকালেন। হঠাৎ খেয়াল হল, গাল বেয়ে জল নামছে। দ্রুত আঁচলে মুছে নিলেন সেটা। সুভদ্রাকে তাহলে এই উদ্দেশ্যেই এনেছেন স্বামীদেবতা। ওঁদের এই সম্পর্কও নতুন নয়। মনে হল, রোজ রাত্রের নিত্যকর্ম যদি সুভদ্রার সঙ্গে শেষ করে বাড়ি ফিরতেন সদানন্দ তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন।

'দ্যাখো যা বলেছি তা মিলে যাচ্ছে। তুমি বাজিতে হেরে গেলে।' সদানন্দর কথা কানে এল। কুহেলি তাকাল না।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুহেলি, আপনি কি তখন থেকে একইভাবে বসে আছেন?'

'কেন?'

'না, মানে টয়লেটের দিকে যাননি?'

'প্রয়োজন হয়নি।'

উত্তরটা শুনে হা হা করে হাসলেন সদানন্দ, 'আরে আমার বউকে আমি চিনি না? একেবারে শালগ্রাম শিলা। শালগ্রাম শিলাকে শোয়ালে যেমন দেখায় বসালেও তেমনি। এই নিয়ে বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছি। তাপ উত্তাপ দূরের কথা মনে সন্দেহ পর্যন্ত নেই। এই যে, আমরা দুজন এতক্ষণ টয়লেটে ছিলাম—।' গলা

তুললেন সদানন্দ।

'ও।' মাথা নেড়েছিলেন কুহেলি।

'আরে, কি হচ্ছে?' ধমকালেন সুভদ্রা, 'ওঁকে ওর মতো থাকতে দাও।'

ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে নেমে দুটো রিকশা নেওয়া হল। একটায় সুভদ্রা আর সদানন্দ, অন্যটায় কুহেলি। রিকশা ছাড়ার আগে কুহেলি দেখলেন সুভদ্রা তাঁর ওড়না মাথায় জড়িয়ে নিয়েছেন, চট করে ঘোমটা বলে মনে হয়। জায়গা কম হওয়ায় তাঁর কাঁধ জড়িয়ে বসেছেন সদানন্দ।

মোটামুটি ভাল হোটেল। একটা ঘর নেওয়া হল।

সদানন্দ একটা বাচ্চা যোগাড় করে নিয়ে এলেন, 'তুমি তো এখানকার কিছুই দ্যাখোনি। যাও, ওর সঙ্গে ঘুরে এসো। নদী দেখতে পাবে, ভাঙা লাইট হাউসে যেও। দেড়টা নাগাদ ফিরে এসো। লাঞ্চ করব।'

কুহেলি অবাক হয়ে তাকালেন, 'আমি একা যাব?'

'একা কেন? ও তোমাকে গাইড করবে। আরে আমরা এখানে এতবার এসেছি যে—।' হাসলেন সদানন্দ, 'তুমি প্রথমবার এলে, ভাল করে দেখে নাও। এই খোকা, যা।'

ছেলেটি মাথা নেড়ে হাঁটা শুরু করতে কুহেলি বাধ্য হলেন ওকে অনুসরণ করতে। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে ওদের কাউকে দেখতে পেলেন না।

গঙ্গা দেখে মুগ্ধ হলেন কুহেলি। কি বিশাল নদী, কি গম্ভীর। এতক্ষণ মনে যে ভার জমেছিল তা নদী দেখামাত্রই যেন কমে গেল। না আসুক ওরা, তিনি তো ঘুরতে পারছেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই, নদীর ওপারে কি আছে?'

'ওদিকে মাটি, সোজা গেলে সাগর।'

'তুই সব জানিস, না?'

'জানব না?'

'তুই ওই বাবুকে চিনিস যে তোকে আমার সঙ্গে আসতে বলল?'

'নাম জানি না। গেল মাসে বউ নিয়ে এসে সারাদিন থেকেছিল।'

'বউ নিয়ে?'

'ওই যে বউটা কাপড় মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল। কথাই বলে না। তুমি কে হও? শালী না বোন?'

হেসেছিলেন কুহেলি, 'কেউ হই না।'

মনে মনে বলেছিলেন, আমি কেউ হই না। এরকম মানুষের কেউ হতে চাই না।

ভাঙা লাইট হাউসে পৌঁছাতেই রোদের তেজ বাড়ল। ছেলেটি বলল, 'এই রোদে পুড়ে ফিরতে পারবে? তার চে রিকশা ডাকি।'

হ্যাঁ বলতে গিয়েও মাথা নেড়ে না বললেন কুহেলি। সঙ্গে টাকা নেই, রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দেবেন কি করে! বললেন, 'চল হেঁটেই যাই, হাওয়া তো দিচ্ছে।'

ঘেমে ক্লান্ত হয়ে যখন হোটেলে ফিরলেন তখন একটা বেজে গেছে।

একটা বেয়ারা টাইপের লোক বলল, 'দাদা বৌদি সেই যে ঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছেন একবারই খুলেছেন ভদকা আর বিয়ারের জন্যে। যান না, চার নম্বর ঘর।'

যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু লোকটি এমন ভাবে তাকিয়েছিল যে যেতে হল। দরজা বন্ধ। ছেলেটিও পেছন পেছন এসেছে। বলল, 'দাঁড়ান, দেখছি।'

সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করতে সদানন্দের গলা ভেসে এল, 'কে?'

'বাবু আমি। দিদিকে ঘুরিয়ে এনেছি। একটা বেজে গেছে।'

মিনিট দুয়েক দাঁড়াতে হল। দরজা খুললেন সদানন্দ, ঊর্ধ্বাঙ্গে গেঞ্জি, হাতে গ্লাস, 'এর মধ্যে ঘোরা হয়ে গেল। সব দেখিয়েছিস?'

'হ্যাঁ বাবু, সব।

'নৌকোয় চড়িয়েছিস?'

'না। দিদি সাঁতার জানেন না বলে ভয় পেয়েছেন।'

'আঃ। নৌকোয় বসলে সাঁতরাতে হবে নাকি?'

ওপাশ থেকে সুভদ্রার গলা পাওয়া গেল, 'লাঞ্চ বলে দাও।'

'এত তাড়াতাড়ি। শোন, আধঘণ্টা পরে এই ঘরে লাঞ্চ পাঠাতে বলবি। এই নে, পাঁচ টাকা দিলাম। বুঝলি।'

'নমস্কার বাবু।' ছেলেটি টাকা হাতে পেয়ে খুশিতে দৌড়ে গেল।

স্ত্রীর দিকে তাকালেন সদানন্দ, 'দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসো।'

আদেশ মান্য করলেন কুহেলি। এই ঘরের বাতাসে বিশ্রী মদো গন্ধ পাক খাচ্ছে। সুভদ্রা বিছানায় আধশোয়া হয়েছিলেন, তার কনুই-এর নিচে বালিস চেপটে গিয়েছে। বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে সুভদ্রা বললেন, 'কি আশ্চর্য, বেচারা এই রোদ্দুরে এতটা ঘুরে এল আর তুমি ওকে কিছু অফার করছ না?'

'কি করব? এখনই তো খাবে।'

'খাওয়ার আগে পান করলে খাওয়াটা জমে। কি খাবে বল কুহেলি, ভদকা উইথ লেমন না বিয়ার?' সুভদ্রা সরাসরি জিজ্ঞাসা করল। তুমি বলল।

সদানন্দ মাথা নাড়ল, 'কি হচ্ছে সু? ওসব ও খেতে পারবে না।'

'কি করে জানলে? তুমি কখনও ওকে অফার করেছ?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'কেন? তুমি খাচ্ছ আমি খাচ্ছি, ওর বেলায় কেন প্রশ্ন ওঠে না?'

'আমাদের ফ্যামিলির মেয়েরা ড্রিঙ্ক করে না।'

'আগে যারা করত না তাদের কথা বলছি না, ও কেন করবে না?'

'কেন কথা বাড়াচ্ছ? আমাদের ফ্যামিলিতে এর রেওয়াজ নেই।'

উঠে বসলেন সুভদ্রা, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, তোমাদের ফ্যামিলির মেয়েরা সতী লক্ষ্মী, মদ খেলে তাদের সম্মান যাবে?'

'তাদের সম্মান নয়, পরিবারের সম্মান।'

'আচ্ছা। এই যে আমাকে নিয়ে বাইরে এলেই তুমি মদ খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে, তাতে আমার বাড়ির সম্মান যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে তো মাথা ঘামাতে না? আমার বাড়িতে আমার স্বামীর সঙ্গে বসে মদ খাওয়ার সময় তোমাকে খুশি করতে আমাকে একটা হুইস্কি নিতে হয়, তখন তো এসব ভাবনা তোমার মাথায় আসত না? কেন আসত না?' ফুঁসে উঠল সুভদ্রা।

'ওঃ, সু, প্লীজ, দুটোকে এক কোরো না। তুমি আধুনিকা মেয়ে, তুমি জানো কখন কি করতে হয়! ও পৃথিবীর কিছুই জানে না।' সদানন্দ চেয়ারে বসে পড়লেন।

সুভদ্রা নেমে এলেন বিছানা থেকে। কুহেলির সামনে গিয়ে গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন, 'এটা খাও, মদ এঁটো হয় না।'

'আমি কখনও খাইনি।' অসহায় গলায় বললেন কুহেলি।

'আমরা অনেক কিছু করি যা আগে করিনি। খাও বলছি।' বেশ ধমক দিয়ে গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিলেন সুভদ্রা।

হাত কাঁপছিল। হঠাৎ মনে অদ্ভুত জোর এল। কেন খাবেন না? নিশ্চয়ই খাবেন। বোঁ বোঁ করে অনেকটা মুখে নিয়ে গিললেন কুহেলি। কি বিশ্রী তেতো। এই জিনিস খাওয়া আর চিরতা ভেজানো জল খাওয়া একই।

'গুড!' সুভদ্রা হাসলেন, 'আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম। নাও, বাকিটা শেষ করো।'

'নো মোর।' চিৎকার করলেন সদানন্দ।

'হোয়াই নট? অন্যের বউ ড্রিঙ্ক করলে আনন্দ পাও, নিজের বউকে সিন্দুকে তুলে রাখতে চাও? কুহেলি খেয়ে নাও।'

'আর ভাল লাগছে না।'

শোনামাত্র গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে বিয়ার শেষ করে সুভদ্রা বললেন, 'আর এখানে ভাল লাগছে না। আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছ মানে?' সদানন্দ হতভম্ব।

'কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। তুমি তোমার বউকে নিয়ে ফুর্তি কর।'

'প্লীজ সু, তুমি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছ!'

'সু। কুহেলি, তোমাকে কি তোমার বর কু বলে ডাকে?'

'ঠিক আছে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ক্ষমা চাইছি। কুহেলি, তোমাকে এই বিয়ারের বোতলটা শেষ করতে হবে। উঠে এসো।' সদানন্দ হুকুম করলেন। মেঝে থেকে একটা বিয়ারের বোতল তুলে নিলেন।

'না। কুহেলি আর এক ফোঁটাও খাবে না।' ঘুরে দাঁড়ালেন সুভদ্রা।

'তুমি তো চাইছিলে ও খাক।'

'ও বলেছে ওর খেতে ভাল লাগছে না। এর পরে—!' সুভদ্রার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় শব্দ করে বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। ভাত ডাল তরকারি মাংস।

সুভদ্রা বললেন, 'আমি ভাত খাব না। ভাত খাওয়ার মুড নেই।'

বেয়ারা বলল, 'সাহেব তো ভাত দিতে বলেছেন।'

'রুটি মাংস পাওয়া যাবে?' সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলেন।

'রুটি বানাতে দেরি হবে।' বেয়ারা বলল।

'তাহলে ছেড়ে দাও।'

'বাইরের রেস্টুরেন্টে রুটি পাওয়া যাবে না?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'যাবে স্যার। কিন্তু বাইরে থেকে খাবার আনা নিষেধ আছে।' বেয়ারা সব সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সদানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তোমারও কি খাওয়ার মুড চলে গেছে?'

'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।' কুহেলি নিচু গলায় বললেন।

সুভদ্রা হাসলেন, 'এত্ত সবের পরেও তোমার ক্ষিদে পায়?'

কুহেলি চট করে সুভদ্রাকে দেখলেন একবার, তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন। সুভদ্রা কী বুঝলেন তিনিই জানেন, বললেন, 'বেশ, চল, খেয়ে নেওয়া যাক।'

সেই রাত্রে সদানন্দ যখন শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন তখন তিনি অনেকটাই স্বাভাবিক, সম্ভবত সন্ধে থেকে হুইস্কি পান করেননি। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর বালিকা বড় মেয়ে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'ও এখানে কেন? ওর ঘরে কি হয়েছে?'

কুহেলি উঠে বসলেন, 'ও অনেকদিন থেকেই আবদার করত আমার সঙ্গে রাত্রে ঘুমাবে বলে। আবদার রাখতে পারতাম না। ভাবলাম আপনার প্রয়োজন তো আজ দুপুরেই মিটে গেছে তাই ওকে শুতে বলেছি!'

সদানন্দ অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। এরকম কথা কুহেলি যে বলতে পারে তা তিনি কখনও ভাবেননি। চোখ ছোট করে বললেন, 'একদিন বাইরে গিয়ে যদি ভেবে থাকো অনেক কিছু বুঝে গিয়েছ তাহলে খুব ভুল করবে।'

স্বামী বেরিয়ে গেলে বড় মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলেন কুহেলি। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন সুভদ্রাকে। আজকের রাতটা ওঁর জন্যে তিনি ঘুমোতে পারবেন।

দুই

বিকেল সাড়ে চারটেয় চলে এল বড় মেয়ে সুজাতা। ততক্ষণে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন কুহেলি। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়ে মায়ের দিকে যেভাবে তাকাল তাতে একটু আহত হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। কুহেলি সেটাকে উপেক্ষা করে ডাকলেন, 'আয়। অমিয়কে নিয়ে এসেছিস?'

'তার তো এখন ছুটিই হয়নি। আসবে কি করে?'

'ওই তো চাকরি। তার জন্যে অ্যাতো! না আসবে না আসবে, তুই এসেছিস তাতেই আমি খুশি।' কুহেলি মুখ বেঁকালেন।

'তুমি ওকে আর কতদিনে মেনে নিতে পারবে মা?'

'এভাবে চললে কখনও না। কোন উচ্চাশা নেই, বারো তেরো বছরের বড় একটা পাতি কেরানিকে তুই আমার মেয়ে হয়েও কি করে বিয়ে করলি তা অনেক ভেবেও কূল পাই না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারি না জামাই কি করে!'

'বলার দরকার কি? তোমার মেয়ে দুবেলা ডালভাত মাছ তরকারি খাচ্ছে, সেটাই তো যথেষ্ট। তাই না?'

মাথা নাড়লেন কুহেলি, 'না। ওটা তো গরুছাগলের মতো বেঁচে থাকা, পেট পুরে দুবেলা খেতে পেলেই যারা খুশি থাকে। আমাদের চারপাশে দিনকে দিন কত কি নতুন জিনিস হচ্ছে, বিনোদনের রাস্তা কতদিক দিয়ে খুলে যাচ্ছে। তুই কিছু জানিসই না। আছিস এক সরু গলির ভেতর দুটো ঘরের ফ্ল্যাটে। আলো হাওয়া ভাল করে ঢোকে না। এগুলো আমাকে কষ্ট দেয় না?'

সুজাতা মায়ের দিকে তাকাল। এ ধরনের সংলাপ সে বিয়ের পর থেকে অজস্রবার শুনেছে। তাকে একা পেলেই মায়ের গলা থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। সে কথা ঘোরাতে চাইল, 'আজ এই ময়ূরকণ্ঠী শাড়িটা পরেছ যে!'

'কেন? আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?'

'তা নয়। তুমি যা পর তাতেই তোমাকে ভাল দেখায়। কিন্তু আজকের দিনটায় তুমি অফ-হোয়াইট কিছু পরলে পারতে।'

'আজকের দিনে অফ-হোয়াইট পরতেই হবে?'

'বাঃ। আজ বাবার মৃত্যুদিবস। গতবারও তো সাদাই পরেছিলে।'

'গতবারও পুরোপুরি মনস্থির করতে পারিনি। এখন আর বলতে বাধা নেই। আজ তোদের বাবার মৃত্যুদিবস হতে পারে কিন্তু আজকের দিনটাকে আমি আমার মুক্তিদিন বলে মনে করি। আর মুক্তির দিন মানে আনন্দের দিন।' কুহেলি হাসলেন।

শিউরে উঠল মেয়ে, 'এসব কথা আঃ কাউকে বোলো না মা। বলা ঠিক নয়।'

প্রসঙ্গ বদলাতে হল কেননা মেজছেলে চলে এল তার এক বন্ধুকে নিয়ে। মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, 'ও গুপ্তা। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের পাইলট।'

'ওমা! তাই। কি মজা!' উচ্ছ্বসিত হলেন কুহেলি, 'পাখির মতো আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াও।'

গুপ্তা ভাঙা বাংলায় জানাল, কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে বেশি সময় লাগে না।

একটু পরে ছোট মেয়ে এল। মাত্র সতেরো বছর বয়স কিন্তু সেজেছে সিনেমার নায়িকার মতো। মেজছেলে ছোটবোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানতাম না আজ তোর জন্মদিনের পার্টি!'

'তার মানে?' ছোট মেয়ে চিৎকার করে উঠল।

'বাবার মৃত্যুদিবসে এই রকম করে মুখে রঙ মাখে না কেউ!'

'বেশ কবেছি। তোব কি!'

মেজ ছেলে হাসল, 'তোর চামচা কোথায?'

ছোট মেয়ে চিৎকার করল, 'মা দ্যাখো, ওরা টিজ করছে।'

কুহেলি সেটা উপেক্ষা করলেন কারণ তিনি তখন ফোনে কথা বলছেন। এইসময় কাজের মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল, 'একজন বাবু এসেছেন।'

ফোনের কথা থামিয়ে কুহেলি বড় মেয়েকে বললেন, 'বোধহয় মিস্টার পাকড়াশি। তোর বাবার পরিচিত। তুই নিচে গিয়ে ওঁকে এখানে নিয়ে আয়।'

বড় মেয়ে মেজভাইকে বলল, 'তুই যা না।'

মেজভাই কাঁধ ঝাঁকাল, 'মা তোকে বলেছে, তোর যাওয়া উচিত।'

বড় মেয়ে বেজার মুখে ঘরের বাইরে গেলে রিসিভার নামালেন কুহেলি। ঘড়ি দেখে বললেন, 'বাঃ। ভদ্রলোকের কথার দাম আছে।'

মেজছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোক কে?'

কুহেলি হাসলেন, 'তোমরা কি জানো মিস্টার সদানন্দ সেন গোবিন্দপুর নামের একটি জায়গায় দশ কাঠা জমি কিনেছিলেন?'

ওরা মাথা নেড়ে না বলল। ছোটমেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'গোবিন্দপুর কোথায়?'

'বালিগঞ্জ লেকের ওপাশে। খবরটা আমারও জানা ছিল না। আজ মিস্টার পাকড়াশি সেই খবরটা টেলিফোনে দেওয়ায় ওঁকে এখানে আসতে বলি। তোমার বাবার পরিচিত মানুষ। ওঁরও পাশাপাশি জমি আছে।' কুহেলি বললেন।

'এই ঘরে!' বড় মেয়ের গলা শোনা মাত্র তার পেছনে মিস্টার পাকড়াশিকে দেখা গেল। মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও শরীর বেশ শক্ত।

ঘরে ঢুকে সাহেবি কায়দায় বললেন, 'গুড ইভনিং এভরিবডি।'

কুহেলি এগিয়ে গেলেন, 'গুড ইভনিং। আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি। প্লীজ বসুন। আপনার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ছেলে মেয়ে এবং মেজছেলের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মিস্টার পাকড়াশি এগিয়ে গেলেন ঘরের অন্যপ্রান্তে যেখানে সদানন্দের ছবি ফুলের মালা এবং আলোয় চমৎকার সেজে রয়েছে। কুহেলি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'এইভাবে চলে যেতে হয় সবাইকে।'

কুহেলি বললেন, 'কেউ কেউ দাগ রেখে যান, কেউ পারেন না।'

চমকে তাকালেন মিস্টার পাকড়াশি, 'ঠিক। একদম ঠিক।'

সোফায় বসার পর কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন বলুন, চা না কফি?'

'না। কিছু না। ওই জমির ব্যাপারটা নিয়ে—!'

'ওঃ নো। আজকের রাত্রে ওই ব্যাপারে কোন কথা নয়। ' মাথা নাড়লেন কুহেলি।

ছোট মেয়ে বলল, 'মা, আমরা একটু ওপরে যেতে পারি?'

'সিওর!'

ছেলে মেয়েরা ওপরে উঠে যাচ্ছে দেখে তিনি বড়মেয়েকে ডাকলেন, 'সুজাতা, তুমি একটু এদিকে এসো। মিস্টার পাকড়াশি, সুজাতাকে নিয়ে আমি চিন্তায় পড়েছি।'

সুজাতা মৃদু প্রতিবাদ করল, 'মা!'

'বসো। ওর মধ্যে সব গুণ আছে। ভাল নাচতে পারে, গানও ভাল গায় কিন্তু এই অল্প বয়সে টুপ করে বিয়ে করে ফেলায় সব নষ্ট হচ্ছে।'

মিস্টার পাকড়াশি বললেন, 'এটা ঠিক নয়।'

'আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি কোন্‌টা ঠিক তা বোঝে! তোমার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই সুজাতা। মিস্টার পাকড়াশি তোমার বাবার অ্যাসোসিয়েট ছিলেন।'

হাসলেন পাকড়াশি, 'আমি অবশ্য অনেক ছোট ছিলাম। কিন্তু তুমি নিজেকে এভাবে নষ্ট করছ কেন? ঈশ্বরের অনুগ্রহ না থাকলে মানুষ ওসব করতে পারে না।'

'কি করব বলুন! আমরা যেখানে থাকি সেখানে নাচ গানের চল নেই।' সুজাতা বলল।

'কোথায় থাকো?'

নিচে বেল বাজল। কুহেলি উঠলেন। শিবানী কি শোভন দাশগুপ্তকে নিয়ে

এর মধ্যেই চলে এল? ওদের তো দেরিতে আসতে বলেছিলেন তিনি। ব্যালকনিতে চলে এলেন কুহেলি। এখান থেকে নিচের দরজা একটু ঝুঁকলেই দেখতে পাওয়া যায়।

না। শিবানীরা নয। ক্যাটারারের লোক। সরে আসছিলেন কিন্তু জামাইকে দেখতে পেয়ে দাঁড়ালেন। ও আর সময় পেল না এ বাড়িতে আসার। কাজের লোক দরজা খুলে দিচ্ছে দেখে কুহেলি সিঁড়ির মুখে চলে এলেন। তখনই তিনতলা থেকে রেকর্ডে আশা ভোঁসলের চটুল গান ভেসে এল। সঙ্গে হাততালি। জামাই ওপরে উঠে ক্যাবলার মতো হাসল। তারপরেই ওপর থেকে গান ভেসে আসায় বেশ অবাক হল।

'কেমন আছ তুমি?'

'এই আর কি। সুজাতা এসেছে?' অমিয় জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ভাবছি ওকে আজ এখানে থাকতে বলব। তোমার প্রমোশনের কি হল?'

'সরকারি চাকরিতে যেমন হয়ে থাকে।'

'শুনেছি তুমি ইংরেজিতে খুব ভাল। এরকম ফালতু চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা কোচিং স্কুল খুললে তো পার। যাও, ওপরে যাও।'

'ওপরে?' অমিয় ইতস্তত করছিল।

'যাতে ওদের বাবার আত্মা আনন্দিত হয়। যাও।'

জামাইকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে ক্যাটারারকে ডেকে বললেন, ছেলেমেয়েদের খাবার দিতে। নিচের ভাড়াটেরা এসে গেল। তাদেরও বসিয়ে দিতে বললেন। তারপর দোতলার বসার ঘরে ঢুকে দেখলেন মিস্টার পাকড়াশির কথা শুনে সুজাতা হাসছে।

কুহেলি বললেন, 'নিশ্চয়ই মজার কথা, আমি শুনব।'

সুজাতা বলল,'পাঞ্জাবিদের নিয়ে। আপনি বলুন।'

'তুমি বল না।' পাকড়াশি হাসলেন।

'না। আপনার মতো করে বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল সুজাতা।

মিস্টার পাকড়াশি কুহেলির দিকে তাকালেন, 'একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন সর্দার হাঁটছিল। হঠাৎ ঘোষণা শুনে সে লাফিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাকে নেমে পড়ল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো একজন চিৎকার করল : মরনা হ্যায় কেয়া? ট্রেনের লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে সর্দার খিঁচিয়ে উঠল, 'আরে মরে গা তো তু! শুনা নাহি ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পর আ রহি হ্যায়।'

পাকড়াশির কথা শেষ হতেই এমনভাবে হেসে ফেললেন কুহেলি যে তার বুকের আঁচল লুটিয়ে পড়ল নিচে। হাসতে হাসতেই লক্ষ করলেন বড় মেয়ে তাকে

চোখের ইশারায় আঁচল তুলতে বলছে। দ্রুত কাজটি সেরে কুহেলি বললেন 'ওঃ, সর্দারদের নিয়ে সবাই মজা করে।'

পাকড়াশি বললেন, 'আচ্ছা, এবার উঠি মিসেস সেন।'

'ওম্মা! এর মধ্যে উঠবেন কি? না না, এখানে ডিনার করে যেতে হবে।'

'না মিসেস সেন। এখন তো দেখা হবেই, ডিনার আর এক রাত্রে করব। আসলে একজনকে সি-অফ করতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। সময় হয়ে গিয়েছে।'

'ও, তাহলে আটকাবো না।' কুহেলি বললেন।

সুজাতা বলল, 'মা, ও এলে আমরা ওঁর সঙ্গে চলে যেতাম। সুবিধে হত।'

কুহেলি মাথা নাড়লেন, 'তাই তো। পথেই পড়ত। অমিয় অবশ্য এসেছে। তিন তলায় গিয়েছে। তাহলে এক কাজ করি। তোদের খাবার প্যাক করে দিতে বলি।'

সুজাতা তাকাল, 'আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

পাকড়াশি কাঁধ নাচাল, 'কি বলছ? খুশি হব। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্যাটারার খাবারের প্যাকেট গাড়িতে তুলে দিল। তিনতলা থেকে নেমে এসে অমিয় যখন শুনল তাকে এখনই বউ-এর সঙ্গে যেতে হবে তখন একটুও আপত্তি করল না। পাকড়াশিকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। দোতলার ব্যালকনি থেকে কুহেলি দেখলেন অমিয় ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। ওরা পেছনের সিটে। ওঁর মন সু গাইল। মনে হচ্ছিল এবার মেয়েটার জীবনে সুদিন আসতে পারে।

ছেলেরা খাওয়াদাওয়া করে চলে গেল সওয়া নটা নাগাদ। ক্যাটারার প্রচুর খাবার রেখে বিদায় নিল। বাড়ি এখন চুপচাপ। এইসময় গাড়িটা এল। কুহেলি দোতলার ব্যালকনিতে এলেন। শিবানী নামছে, সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক। ওপর থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না। ভেতরের দরজায় এসে কাজের লোককে বললেন নিচে যেতে।

একটু বাদেই ওরা উঠে এল। প্রথমে শিবানী। শিবানী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী কিন্তু একটু খাটো। স্লিভলেস পরায় হাতদুটো দৃষ্টি কাড়ছে। উঠতে উঠতে বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল, না? শোভনদা উঠতেই চাইছিল না।'

কুহেলি সরে এলে ওরা ঘরে ঢুকল। কুহেলি হাতজোড় করল, 'নমস্কার। আমার সৌভাগ্য যে আপনার পায়ের ধুলো এই বাড়িতে পড়ল।'

শোভন হাসলেন। নমস্কার করলেন। কুহেলির মনে হল এমন ভুবনজয়ী হাসি তিনি কখনও দ্যাখেননি। এমন কি উত্তমকুমারেরও না। একজন লেখক যে এত সুপুরুষ হতে পারে তিনি জানতেন না। যে কোন অভিনেতা এঁকে ঈর্ষা করবে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল শোভনদা?'

শোভন বললেন, 'দূর থেকে দেখেছিলাম, তাই ভাল ছিল।'

শিবানী বলল, 'তার মানে? কাছে এসে আশাভঙ্গ হয়েছে?'

'না। শীতের রাতে আগুন দূরে রেখে বসাই সঠিক। আগুনে হাত ডুবিয়ে উত্তাপ নিতে চাইলে শরীর জ্বলে যায়।' শোভন হাসলেন, 'মাফ করবেন, ঈশ্বর আপনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে খুব আফসোস করেছেন।

কুহেলি হাসলেন, 'প্লীজ, কানাছেলের নাম পদ্মলোচন রাখবেন না। আমি খুব সামান্য মেয়ে, এত প্রশংসার যোগ্য নই।' কথাগুলো বললেন বটে কিন্তু ওই মুহূর্তে সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ছিল যা এর আগে কখনও হয়নি। শোভনের হাসি যেন তাঁর রক্তে জোয়ার তুলছিল।

ওরা বসলেন। শিবানী বললেন, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাচ্চারা কোথায়?'

'বড়রা খেয়েদেয়ে চলে গেছে, ছোট দুটো ওপরে। ' কুহেলি শিবানীর পাশে বসলেন।

'আচ্ছা, আমরা কি একটু পান করতে পারি না?' শোভন কুহেলির দিকে তাকালেন।

'আমার বাড়িতে তো ওসব নেই।' কুহেলি সংকোচে বললেন।

হাসল শিবানী, 'আমি জানি। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। শোভনদা তো না খেয়ে ছাড়বে না। কিন্তু এই ঘরে খেলে অসুবিধে হবে না? যে কেউ তো চলে আসতে পারে। তার চেয়ে তোমার বেডরুমে চল।'

স্বস্তি পেলেন কুহেলি এই প্রস্তাবে। আর কেউ না আসুক, কাজের লোকটি কাল সকালে তার বন্ধুদের সাতকাহন করে শোনাবে।

'আমার কোন লেখায় চোখ বুলিয়েছেন?' শোভন জিজ্ঞাসা করলেন।

'না বুলিয়ে উপায় আছে? কোন্ শিক্ষিত বাঙালি আপনার লেখা পড়েননি। সেদিন কোন একটা কাগজে একটা চিঠি পড়ছিলাম, আপনি কেন চিত্রনাট্য লিখবেন?'

'একটাই উত্তর, টাকার জন্যে। আমার যদি সময় থাকে। চিত্রনাট্য লিখে যদি বেশি টাকা পাই তাহলে কেন লিখব না? কি, ঠিক কিনা?'

'সেটা আপনি ভাল বুঝবেন। আমারা ওই চিত্রনাট্যের ছবি দেখে বলব কতটা আলাদা। সিনেমার ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।' কুহেলি বললেন।

শিবানী হেসে ফেলল, 'ওই যে, বলেছিলে, নামলে আর ওঠা যায় না।'

'এমন কপাল দ্যাখো, আমার ছোট মেয়ের একমাত্র ধ্যান, সে সিনেমায় নামবেই। দিনরাত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে।' কুহেলির মুখে বিরক্তি।

চুপচাপ শুনছিলেন শোভন, জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত?'

'জাস্ট পনের।'

'ডাকুন তো!'

'মানে?' কুহেলি অবাক।

'সামনের সপ্তাহে আমার গল্প-চিত্রনাট্যে যে ছবি তৈরি হচ্ছে তার স্যুটিং শুরু হচ্ছে। নায়িকার দুটো বয়স ছবিতে আছে, একটা পনেরো-ষোল আর একটা তিরিশ। যতদূর জানি অল্পবয়সের নায়িকার জন্যে এখনও ওরা অভিনেত্রী খুঁজে পায়নি।' শোভন বললেন।

শিবানী মাথা নাড়লেন, 'ভালই তো, শোভনদার গল্পে যদি ব্রেক পেয়ে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। ডাকো ওকে।'

অতএব পাখিকে ডাকা হল। সে তখন নাইটি পরে বিছানায় শুয়ে সিনে অ্যাডভান্স দেখছে। এইসময় মায়ের ডাকে খুব বিরক্ত হল। দ্বিতীয়বারে সিঁড়ির মুখে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আমি শুয়ে পড়েছি, কি দরকার।'

ইশারায় কাছে আসতে বললেন কুহেলি। যতটা না তার চেয়ে বেশি বললেন শোভন সম্পর্কে। শুনে মেয়ের মুখের চেহারা বদলে গেল ঝটপট। আসছি বলে সে লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে। ঘরে ঢুকে কুহেলি জানালেন, 'ভীষণ ঘুমকাতুরে। আসছে।'

শোভন বললেন, 'এবার কুহেলির স্বাস্থ্যপান করা দরকার।'

শিবানী বলল, 'আর একটু পরে। মেয়েটা চলে যাক।'

কুহেলি বললেন, 'আমি ততক্ষণে ভেতরের ঘরে ব্যবস্থা করে রাখি।'

কুহেলি বেডরুমে চলে গেলেন। দুটো ঘরের মাঝখানে ভারি পর্দা ঝুলছে।

শিবানী বলল, 'হয়ে গেছে।'

শোভন তাকালেন, 'কি?'

'কুহেলিদি তোমার প্রেমে পড়ে গেছেন।'

'আমিও।'

'তুমি তো মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে যাও।' শিবানী ঠোঁট বেঁকালেন।

'তাই? তোমার প্রেমে পড়েছি বলে মনে পড়ে না।'

'আমি দেখতে খারাপ, বেঁটে।'

'তাই? ওই হাতের দিকে তাকালেই—! যাক গে। প্রথম আলাপেই তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকেছ। কোন মেয়ে দাদা বললে তার সঙ্গে প্রেম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ইস্। যদি আগে জানতাম তাহলে দাদা বলে ডাকতাম না।'

এইসময় পাখি এল ঘরে। দ্রুত পোশাক পালটেছে সে। কালো হলুদে

মেশানো শরীর চেপে ধরা হাঁটু পর্যন্ত স্কার্ট, চুলেও উলটো ভাঁজ, নিতম্ব এবং বুকের উদ্ধত ভঙ্গিটি চোখে পড়ার মতো। দেখলে সতেরো বলে মনে হয় না।

শিবানী ডাকল, 'এসো পাখি। এঁকে চেনো।'

পাখি মাথা নাড়ল না বলতে, শোভন হাসলেন। এত আকর্ষণ ওই হাসিতে যে পাখি মুখ নামিয়েও আড়চোখে তাকাল।

শোভন বললেন, 'দেখি মুখটা!'

পাখি মুখ তুলল। শোভন বললেন, 'বাঃ চমৎকার। ছবিতে কাজ করতে চাও?'

'হুঁ।'

'পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'এসো, আমার পাশে এসো।' বাঁ হাত বাড়িয়ে পাখিকে প্রায় টেনে নিলেন শোভন, 'কাল দুপুরের পর, তিনটে নাগাদ বাড়িতে থেকো। ছবির পরিচালক এসে তোমায় দেখে যাবেন। তখন পায়ের পাতা ঢাকা স্কার্ট পরে থাকবে।'

'আমার ওরকম স্কার্ট নেই।'

একটা নরম নরম অনুভূতি শরীরে লেপটে আছে। হঠাৎ সতর্ক হয়ে সরে বসার চেষ্টা করতেই কুহেলি ঘরে ঢুকলেন, 'ওটার ব্যবস্থা আমি করব।'

'বাঃ। তাহলে তুমি এখন যেতে পার।'

পাখি চলে যাচ্ছিল, কুহেলি ডাকলেন, 'প্রণাম করলি না?'

শিবানী প্রতিবাদ করল, 'আজকাল টিপটিপ করে প্রণাম কেউ করে না। তুই যা তো মা। ঘুমিয়ে পড়, আমরা একটু আড্ডা দেব।'

পাখি হাসল। তারপর শোভনকে এক পলক দেখে নিয়ে চলে গেল।

কুহেলি বলল, 'আসুন।'

ভেতরের ঘরে ঠাণ্ডা জল, কিসমিস মেশানো বাদাম, গ্লাস সাজানো।

শোভন জিজ্ঞাসা করল, 'দুটো গ্লাস কেন?'

'আমি খেতে পারি না।'

'খেয়েছেন আগে?'

'হ্যাঁ। সহ্য হয়নি।'

'তাহলে জোর করব না। শিবানী ঢালো।'

কুহেলি লক্ষ করলেন শিবানীর এ ব্যাপারে পটুত্ব আছে।

একটা বড় চুমুক দিয়ে শিবানী বলল, 'কুহেলিদি, একটা গান গাও।'

'দূর। আমি কি গাইতে পারি?' কুহেলি হাসলেন, 'বরং তুমি গাও।'

অর্ধেক গ্লাস শেষ করে শিবানী চোখ বন্ধ করে গান ধরল, 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ—।'

শিবানীর গলায় একটা আমেজ আছে। তাছাড়া মদ্যপানের কারণে তার সঙ্গে আবেগ মেশায় শুনতে ভাল লাগছিল। ওরা এখানে আসার আগে কোথাও খেয়ে এসেছিল। এখন পেটে পড়াতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। বিশাল ভারী স্তন যে প্রকট তা ওর হুঁশে আসছে না। কুহেলি লক্ষ করল শোভন ওদিকে তাকাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে গান শুনে যাচ্ছে। এবার কুহেলি ইশারা করল শিবানীকে আঁচল তুলে নিতে। গান গাইতে সে এতই মত্ত যে ইশারা উপেক্ষা করছে।

গান শেষ হলে শোভন কুহেলির দিকে তাকালেন, 'আপনি বিব্রত হবেন না। যেহেতু শিবানী আমাকে দাদা বলে ডাকে তাই ও যদি সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে আমার পাশে বসে তাহলেও আমার শরীরে কোন উত্তেজনা জন্মাবে না।'

শিবানী ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল, 'আশ্চর্য! আঁচল ছিল না তো কি হয়েছে, জামা তো আছে। জামার নিচে ব্রেসিয়ারও আছে। এগুলো আড়াল নয়?'

আধঘণ্টার মধ্যে দু-পেগ খেয়ে বিনা কারণে তর্ক শুরু করল শিবানী। ওর যে নেশা হয়ে গেছে, নেশার ঘোরে কথা বলছে এটা এখন স্পষ্ট। এখন ওর যাবতীয় আক্রমণ শোভনকে লক্ষ করে। তাকে ভাল লাগে না বলেই শোভন ছুঁয়ে দ্যাখে না। অন্য যে কোন মেয়ের চেয়ে তার কি কম আছে তা শোভনকে বলতেই হবে। এই একটি প্রশ্ন সে আঁকড়ে থাকল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত।

শেষপর্যন্ত কুহেলি বললেন, 'অনেক হয়েছে, এবার খেতে হবে, খাবার দিতে বলি।'

শিবানী মাথা নাড়ল, জড়ানো গলায় বলল, 'আমি খাবো না।'

'বেশ, কিন্তু এই অবস্থায় তুমি বাড়িতে যাবে কি করে?

'কেন? কি অবস্থা? আই অ্যাম ফাইন। গাড়িতে উঠব, চলে যাব।'

'বাড়িতে কি বলবে?'

'কিস্যু না। কেউ নেই। চাবি আমার ব্যাগে।' সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। তারপর শোভনের দিকে তাকাল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না এখানে থাকবে?'

'আপনার বাড়ি কোথায়?' কুহেলি জিজ্ঞসা করল।

'আনোয়ার শা রোড।'

'সে-তো অনেক দূরে। কিভাবে যাবেন?'

'ট্যাক্সি পেয়ে যাব। কলকাতায় সারারাত ট্যাক্সি চলে।'

'আপনিও খাবেন না?'

'এত রাত্রে আর না খাওয়াই ভাল। অনেক ধন্যবাদ।'

'তুমি এখামে থাকবে? থাকতে চাও?' শিবানী চেঁচাল।

'যদি বলি তাই।' শোভন গম্ভীর গলায় বললেন। অনেক খেলেও তাঁর নেশা নিয়ন্ত্রণে।

'জানি। জানি। সেইজন্যেই তো এসেছ।' ঘুরে দরজার দিকে যেতে টলে গেল শিবানী। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন শোভন। বললেন, 'চল।'

'আমি টয়লেটে যাব।' শিবানী টলছিল।

'যেতে পারবে?' জিজ্ঞাসা করলেন শোভন।

'সিওর।' কথাটা শুনে কুহেলি ওকে ধরে টয়লেটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে বললেন, 'দেওয়াল ধরে যাও। আস্তে আস্তে।' তারপর দরজাটা বন্ধ করে ফিরে আসতেই শোভন ওঁকে জড়িয়ে ধরে কিছু বোঝার আগেই ওঁর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন। তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়েও শোভনের জিভের স্পর্শ পাওয়ামাত্র কুহেলির শরীর অবশ হয়ে গেল। দুহাতে জড়িয়ে ধরে জীবনের প্রথম চুমুর স্বাদ গ্রহণ করতে চাইলেন। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে দেখা হবে? এরপর দেখা না হলে পাগল হয়ে যাব।'

'যেদিন বলবে!'

'কাল।'

'বেশ, কাল।'

জলের আওয়াজ হল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল শিবানী, 'কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। আমি একাই যাব।' জড়ানো কথাগুলো বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল।

'তা হয় না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

শিবানীকে জড়িয়ে ধরে নিচে নামল শোভন। কুহেলি দরজা খুলে দিলেন। এত রাতে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় কোন মানুষ জেগে নেই। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে ওরা ভেতরে ঢুকে গেলেন। গাড়ি চলে গেল।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। নিজেও রাত্রে কিছু খাননি। যে ঘটনা ঘটল তার প্রতিক্রিয়া হয়তো ঘুম না আসা। এই প্রথম স্বামীর বাইরে কোন পুরুষ তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছে। হ্যাঁ, প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে তিনি উপভোগ করেছেন। তাঁর সঙ্গে যৌনকর্মের সময় এমন অনেক রাত গিয়েছে, সদানন্দ চুমু খাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সেই ফুলশয্যার রাত্রে কোন মানুষ নয়, একটি রাক্ষস তাঁর ঠোঁটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাঁর ঠোঁট। চুম্বন তার কাছে খুবই আতঙ্ক। কিন্তু আজ, আজ সব অন্যরকম হয়ে গেল। কুহেলির মনে হল শোভন কেন তাঁকে চুমু খেলেন। কেন জানিয়ে গেলেন আর একটা প্রাণ আছে। এমন তো হতে পারে এ নেহাতই নেশার ঝোঁকে এগিয়ে আসা!

একঘণ্টা পরে আর পারলেন না কুহেলি। শিবানী আজ কিছুতেই ছাড়বে না

শোভনকে। এতক্ষণ ওঁরা নিশ্চয়ই বিছানায়। যতই বলুক দাদা বলায় শোভন শিবানীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না কিন্তু মদ অনেক শক্তিশালী। সেই শক্তির কাছে শোভন যদি পরাজিত হয় তাহলে লোকটাকে ঘেন্না করতে সুবিধে হবে।

অনেকক্ষণ বাজার পর রিসিভার তুলল। শিবানীর গলা, 'হ্যালো।'

'ঠিকঠাক পৌঁছেছ?'

'ও, তুমি। হ্যাঁ। এসে স্নান করলাম। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উলটো-পালটা কিছু যদি করে থাকি তাহলে দুঃখিত।' শিবানীর গলা ভারী।'

'না না ঠিক আছে। কিছু খাওনি তাই এরকম হয়েছে!' কুহেলি বললেন, 'কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।'

'কি করে শোব। শুলেই তো ঘুমিয়ে পড়ব। শোভনদাকে বলেছি ফ্ল্যাটে পৌঁছে ফোন করতে। ততক্ষণ তো অপেক্ষা করতে হবে।' বলল শিবানী।

কি অপূর্ব তৃপ্তি সারা শরীর মনে ছড়িয়ে পড়ল। কুহেলি রিসিভার নামিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনের স্বাদ নতুন করে অনুভব করলেন? এই মানুষটি তাহলে সৎ। বালিকার মতো বালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

মিনিট দশেক বাদে যখন তন্দ্রায় ডুবে যাচ্ছেন তখন ফোনের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন কুহেলি। রিসিভার তুলে বললেন, 'হ্যালো।'

'পৌঁছে গিয়েছি। শিবানীকেও বলেছি। ওর কাছ থেকে তোমার নাম্বার নিলাম।

'থ্যাঙ্কু!'

'কুহেলি, তুমি বিরক্ত হওনি তো? আজই প্রথম আলাপ, কিন্তু আমি নিজেকে শেষপর্যন্ত আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। মনে হয়েছিল, এই আমার ভবিতব্য।'

কুহেলি কথা বলতে পারছিলেন না।

'কুহেলি!' শোভন ডাকলেন।

'উঁ।'

'তুমি কি রাগ করেছ?'

'কেন?'

'আমার ঠোঁট তোমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল বলে?'

'কি মনে হয়?'

'আমি ঠিক, একবার মনে হয়েছিল, তুমি খুশি—!'

'আমার খুব ভয় করে।'

'কেন? ভয় করে কেন?'

'যদি প্রতারিত হই!'

'কথা দিচ্ছি—!'

'বিশ্বাস কর, আমার জীবনে প্রথম প্রেম তুমি।'

'সে কি!'

'কেউ বিশ্বাস করবে না। এতগুলো বাচ্চার মা হয়েও বলছি, কেউ আমার জীবনে প্রেম নিয়ে আসেনি। আমার স্বামী শুধু ভোগ করেছেন। প্রেম দেননি।'

'তুমি নিশ্চিত থাকো কুহেলি। আমি চিরকাল তোমার বন্ধু হয়ে থাকব।'

'কতকাল?'

'চিরকাল।'

'চিরকাল তো আমি থাকব না। যতদিন বাঁচবো ততদিন থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'যখন বুড়ি হয়ে যাব, চামড়া কুঁচকে যাবে, কুৎসিত দেখাবে—।'

'বার্ধক্যে সবাই কুৎসিত হয়ে যায় না। সেই বয়সেরও সৌন্দর্য আছে। কখনও কখনও যৌবনের সৌন্দর্য তার কাছে হার মানে।' শোভন বলল।

'কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'কেন? না খেলে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তুমি? তুমি খেয়েছ?'

হেসে ফেললেন কুহেলি। বললেন, 'যদি বলি খেয়েছি।'

'যদি বল? মানে বুঝলাম না।'

'তুমিই তো খাইয়ে দিয়েছ। অন্য খাবার খেয়ে মুখের স্বাদ নষ্ট করতে চাই না। আমি তাতেই বিভোর হয়ে আছি।'

'কুহেলি!'

'উঁ!'

'চোখ বন্ধ করবে? আমি তোমার চোখের পাতায় চুমু খাবো।'

'না। ঠোঁটে। আমার জিভে। প্লীজ।'

টেলিফোনের রিসিভার চুম্বনের শব্দ গ্রহণ করে কুহেলির কানে জলতরঙ্গ বাজাল। আর পারছিলেন না কুহেলি। কোনমতে বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। গুডনাইট।'

'গুডনাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে লাফ দিয়ে নিচে নেমে আলো জ্বালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন কুহেলি। কি আশ্চর্য, চোখের তলায় হাঁসের পায়ের ছাপগুলো উধাও। কি করে গেল!

শোভন দাশগুপ্ত এইমুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সেরা

লেখক। বছর তিনেক আগে ওঁর বিয়ে ভেঙেছে। ওঁর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, যা কিনা স্বার্থপরতার নামান্তর তা প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কার করে এবং শেষপর্যন্ত তা মেনে নিতে না পেরে স্ত্রী আলাদা হতে চেয়েছিলেন। শোভন বাধা না দেওয়ায় সেটা দ্রুত আইনমাফিক শেষ হয়েছে।

পরদিন সকালে শিবানীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল টেলিফোনে। কুহেলিই ফোন করেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শোভনের বিয়ে এল। শিবানী বলল, 'কেউ যখন নিমপাতা ভাজা খায় তখন তেতো জেনেই খেতে বসে। নিমপাতা মিষ্টি হবে ভাবা তো পাগলামি।'

'বুঝলাম না।'

'ওঃ। তুমি বড় কম বোঝো! একজন লেখক বা একজন শিল্পীর প্রথম ভালবাসা তার সৃষ্টি। শোভনদাকে যখন ভদ্রমহিলা ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই এটা জানতেন। জানতেন লোকটি অনেকক্ষণ তাঁর লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। লেখার জন্যে চিন্তা করবে। বিয়ের পর যদি উনি শোভনদাকে তাঁর গৃহপালিত জীব হিসেবে পেতে চান তাহলে সেটা তাঁরই ভুল।' শিবানী বুঝিয়ে বলেছিল।

'তারপর আর উনি বিয়ে করেননি?'

'না। বোধহয় খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। কি কুহেলিদি, মনে হচ্ছে তুমি ওঁর সম্পর্কে বেশ ইন্টারেস্টেড? সাবধান।' শিবানী হাসল।

'সাবধান কেন?'

'এইসব লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চললে খুব আনন্দে থাকবে। বন্ধুত্ব ভাল, তার বেশি এগোলে ধাক্কা খেতে বাধ্য। তাই সাবধান বললাম।' শিবানী উপদেশ দিল।

কিন্তু এই উপদেশ তারাই মান্য করতে বলে, যারা জীবনে অনেক পেয়েছে। অনেক সাহচর্য, অনেক ভালবাসায় যারা অভ্যস্ত তারা কতটা বাদ দেবে কতটা রাখবে তা ঠিক করতে পারে। জীবন যাকে কিছুই দেয়নি, যেখানে মাটি শুকিয়ে ফেটে চৌচির সেখানে একফোঁটা জল পড়লে সেটা পরিশুদ্ধ না কদর্যকর তা বিচার করার অবকাশ থাকে না। কুহেলিও পারলেন না। তাছাড়া শোভন ভালবাসতে পারে। ভালবাসতে জানে। যা বোধহয় অনেক পুরুষ পারে না। যেন সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক ছিল, ঈশ্বর চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিলেন, সেই চিত্রনাট্য অনুসরণ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। ছয় সন্তানের জননী কুহেলি এই প্রথম নিজের শরীরে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। মিলনের চরম মুহূর্তে সেই আগ্নেয়গিরি আচমকা জানান দিয়ে আদিমকালের জমে

থাকা লাভার স্রোত উৎক্ষেপ করে যাচ্ছে, এ যেন নিজের মধ্যে আর একজনকে আবিষ্কার করা।

এখন সকালে স্নান করে শোভন চলে আসেন এই বাড়িতে। তাঁর লেখার জন্যে একটি ঘর গুছিয়ে দিয়েছেন কুহেলি। এ বাড়িতে এসে তিনি কুহেলির সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খান। তখন গল্প হয়। তারপর লিখতে বসে যান। তখন কেউ তো বটেই কুহেলিও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যান না। দেখতে ইচ্ছে করলে মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকেন। লেখায় নিমগ্ন শোভনকে দেখে তপস্বী বলে মনে হয়। বেলা একটায় দুজনে মিলে লাঞ্চ, কখনও কখনও ছেলেমেয়ে আসে একসঙ্গে খেতে। তারপর আবার লিখতে বসেন শোভন। সেটা চলে পাঁচটা পর্যন্ত। এরপরে চা খেয়ে শোভন স্নান করতে যান। তৈরি হয়ে নেন কুহেলিও। মাঝেমাঝেই শোভন তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বেড়াতে, কখনও ফিল্মের পার্টিতে। মাঝরাতে তাঁকে বাড়িতে নামিয়ে চলে যান নিজের ফ্ল্যাটে। কখনই এখানে রাত্রিবাস করে না। যেদিন বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না সেদিন স্বপ্নের মতো কাটে। এই ফাঁকে কুহেলি ঘুরে এসেছেন গাইনির কাছ থেকে। সপ্তম সন্তান শরীরে না আসার ব্যবস্থা করেছেন চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে। নবীন ডাক্তার বিশ্বাস করতে চাননি তাঁর ছয়টি সন্তান হয়েছে।

আজ দুপুরে খেতে বসে শোভন বললেন, 'কুহেলি, পাখির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি।'

'তুমি বলেছিলে সেই ছবির স্যুটিং পিছিয়ে গেছে।' কুহেলি ভাত তুলে দিচ্ছিলেন?

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা হবে দিন পনেরোর মধ্যে।'

'তাহলে কি ভাবছ?'

'পাখির মাথা থেকে সিনেমার ভূতটা তাড়ানো যায় না?'

'হঠাৎই কুহেলি অবাক হলেন।'

'বাঘ ভাল্লুক কুমির তো আছেই, হায়েনা, শিয়াল শকুনের সংখ্যাও তো কম নয়। বড় বড় মেয়েগুলোই নিজেকে বাঁচাতে পারে না, পাখির পক্ষে তো অসম্ভব।'

'প্রথম আলাপের দিন তুমি যে ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছ!'

'হ্যাঁ। তখন তো তোমাদের কাউকে চিনতাম না। ও সিনেমায় অভিনয় করতে চাইছে, ওর বয়সী একটি চরিত্রের জন্যে পরিচালক অভিনেত্রী খুঁজছে, আমি যোগাযোগ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ওর খারাপ কিছু হলে আমার মনে হবে আমিই দায়ী।' শোভন বললেন।

'তুমি কি সিওর হয়ে কথা বলছ? যে মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে যায় তারই এক অবস্থা হয়? এত যে বিখ্যাত অভিনেত্রীরা আছেন তাদের মতই ভিক্টিম?'

'এরা যখন এসেছিলেন তখন ফিল্মের পরিবেশ একটু অন্যরকম ছিল। তখন কোন অভিনেত্রীর সাঙ্গে পরিচালক নায়কের সম্পর্ক তৈরি হলে সেটা ভালবাসার সম্পর্ক হত। এখন ওই শব্দটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। যদি কোন মেয়ে তালে তাল না মেলাতে চায় তাহলে সে পরের ছবিতে আর সুযোগ পাবে না।' শোভন বললেন।

'বেশ তো। সেরকম হলে ও সিনেমা করা ছেড়ে দেবে।'

হাসলেন শোভন, 'রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ কি মানুষ শিকার বন্ধ করতে পারে?'

কুহেলি স্থির করলেন পাখির সঙ্গে কথা বলবেন। অবশ্য শোভন যদি বলতেন তাহলে বেশি কাজ হত। সেই অনুরোধটাই করলেন তিনি।

লাঞ্চের পর পাখিকে ডেকে পাঠানো হল। হাঁটুর উপর স্কার্টের প্রান্ত, পাখি এসে বসল। কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নাকি কদিন ধরে ভাত খাচ্ছ না?'

'না।' মায়ের দিকে তাকাল পাখি।

'সেকি? রুটি খাচ্ছ দুপুরে?' শোভন জিজ্ঞাসা করলেন?

'না। একটা যে কোন ফল আর এক গ্লাস ঘোল খাই। আজ যেমন শসার সঙ্গে ঘোল খেয়েছি।' মাথা নাড়ল পাখি।

'কিন্তু কেন?' কুহেলি বিরক্ত হলেন।

'আমি মোটা হতে চাই না। তাই।'

'আমি তো রোজ ভাত খাই। আমি কি মোটা?' কুহেলি প্রশ্ন করলেন।

'এমনিতে তোমাকে মোটা বলে মনে হয় না কিন্তু সিনেমায় দেখাবে।'

'সিনেমায়?' কুহেলি হকচকিয়ে গেলেন।

'আমি ফিল্ম ম্যাগাজিনগুলোতে তাই পড়েছি। অ্যাকট্রেস হতে গেলে আমাকে ফ্যাটলেস ফিগার রাখতেই হবে।' পাখি বলল।

বিষয়টা পাখিই এনে দিল বলে খুশি হলেন শোভন, 'পাখি। তুমি সিনেমায় অভিনয় করতে চাইছ। কিন্তু এই ফিল্ম লাইনে যেমন ভাল মানুষ আছেন তেমনি খারাপ মানুষের সংখ্যাও অনেক। তুমি এখনও ছোট, সব কথা তোমার কাছে বলাও যায় না। শুধু বলছি, তুমি অন্য কিছু করার কথা ভাবলে ভাল হয়।'

পাখি বলল, 'আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই। মায়ের আমার বয়সে দাদাভাই-এর জন্ম হয়ে গিয়েছিল। আপনি বলতে পারেন।'

স্পষ্ট চোখে তাকালেন শোভন। তারপর বললেন, 'তোমার বয়স কম।

সিনেমার জগৎ গ্লামারের জগৎ। যে কোন মানুষ চায় আরও ওপরে উঠতে। তোমার সামনে সেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখানো হবে। কিন্তু উঠতে গেলে তার মূল্য না নিয়ে ওরা ছাড়বে না। প্রযোজক থেকে একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার পর্যন্ত তোমাকে ব্যবহার করতে চাইবে। কত রকমের অছিলা বের করে তোমাকে নিয়ে যাবে বড় হোটেলে অথবা নির্জন আউটডোরে। সেখানে এসকর্ট হিসেবে তোমার ভাই কেন, মা গেলেও পরিস্থিতি এমন তৈরি করবে যে ওঁরা কিছুই করতে পারবে না। আর তুমি যদি বিদ্রোহ কর, প্রতিবাদ কর, তাহলে তোমার ফিল্ম ক্যারিয়ার চিরদিনের মতো শেষ করে দিতে পারে ওরা। তাই বলছি—।'

শোভনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পাখি বলল, 'তখন থেকে আপনি বলছেন মূল্য না নিয়ে ছাড়বে না, ব্যবহার করতে চাইবে। আপনি কি আমার শরীরের কথা বলছেন? তেমন কেউ যিনি আমাকে সিঁড়িতে উঠতে সাহায্য করবেন তিনি তো বদলে কিছু চাইতেই পারেন। তিনি খামোখা আমাকে সাহায্য করতে যাবেন কেন?'

কুহেলি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাখি।'

'চেঁচিয়ো না মা। এখন সবাই দয়ার সাগর হয়ে উপকার করবে তা নিশ্চয়ই আশা করবে না। কেউ আমার শরীরে হাত ছোঁয়ালে নিশ্চয়ই ফোস্‌কা পড়বে না। যাক গে, আপনার পরিচালকের সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দেবেন?' পাখি উঠে দাঁড়াল।

'সে তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবে।' শোভন বললেন। এইটুকুনি মেয়ের মুখে এরকম বেপরোয়া কথা শুনে তিনি ঠিক সহজ হতে পারছিলেন না।

পাখি চলে গেল। কুহেলি মুখ নিচু করে বসেছিলেন।

সহজ হওয়ার চেষ্টা করলেন শোভন, 'নাঃ, আমরা বোধহয় পুরোন হয়ে গেছি।'

'তার মানে?' কুহেলি তাকালেন।

'সময় খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমরা যা নিয়ে ভয় পাচ্ছি এরা তাকে আদৌ পাত্তা দিচ্ছে না। তুমি নিশ্চিত থাকো, পাখি নিজেকে সামলাতে পারবে।'

'ছাই পারবে। মুখে বড় বড় কথা। ওই সিনেমার পত্রিকাগুলো ওর মাথা খেয়েছে। এই এক দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল আমার।'

শোভন ফোন করলেন পরিচালককে। ঠিক হল ভদ্রলোক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসবেন পাখিকে দেখতে।

কথাটা জানিয়ে দিয়ে লিখতে চলে গেলেন শোভন। কুহেলির খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। মেয়ের ব্যাপারটা খুব নাড়া দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু লেখার সময়ে শোভনের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। হঠাৎ ওঁর মনে হল, শোভন পাখির ব্যাপারটাকে আর গুরুত্ব দিচ্ছে না। তিনি নিজে পাখির কথাগুলোকে হজম

করতে পারছেন না অথচ শোভনের মনে হল ওই পুঁচকে মেয়েটা নিজেকে সামলাতে পারবে। পাখি যদি শোভনের নিজের মেয়ে হত তাহলে কি একইভাবে ভাবতে পারত!

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বিজন দত্ত বাড়িতে এলেন। ষাটের আশপাশে বয়স, অনেকগুলো হিট ছবির পরিচালক। শোভনের সঙ্গে তুমি-তুমি সম্পর্ক। কুহেলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শোভন। কুহেলি বললেন, 'সব ঠিক আছে, মেয়ের ভীষণ ইচ্ছে, কিন্তু আমার খুব ভয় করছে। মেয়ে কতটা নিরাপদে থাকবে জানি না।'

বিজন দত্ত বললেন, 'ম্যাডাম, আমার কাছে কাজ করার সময় আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। তবে ভাল কাজ করলে অন্য সবাই যখন ডাকবে তখনই সমস্যা। অবশ্য আপনি যদি ওর সঙ্গে থাকেন তাহলে—। যাক গে, মেয়েকে ডাকুন। কথা বলি।'

পাখি এল। সুন্দর সেজেছে। কুহেলি ইশারা করলেন প্রণাম করতে। পাখি নিচু হতেই বিজন দত্ত বাধা দিলেন, 'না না, থাক। তুমি দেখছি বেশ লম্বা। কত?'

'পাঁচ তিন।'

'বয়স?'

'সিক্সটিন।'

'কোন্ ক্লাসে পড়?'

'এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেব।'

'বাঃ। হঠাৎ সিনেমায় অভিনয় করতে চাইছ কেন? পড়াশুনায় ক্ষতি হবে তো!'

'না হবে না। আমাকে নিশ্চয়ই প্রথম বছরে সবাই প্রতিদিন স্যুটিঙে ডাকবে না।'

'বুঝলাম। তুমি কি স্কুলে নাটক করেছ?'

'আগে করতাম, এখন করি না।'

'কেন?'

'অ্যামেচারিশ ব্যাপার, আমার ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা। তুমি কি করে বুঝলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারবে? থিয়েটারের ভাল অভিনেতারাও অনেক সময় পারে না।'

'আমি পারব।'

'কিন্তু কিসে মনে হল?'

'আমি কয়েক বছর ধরে রিহার্সাল দিচ্ছি।'

'কিসের রিহার্সাল?'

'যে সিনেমা দেখি তার নায়িকার কথাগুলো রিহার্সালে বলি।'

'একা একা?' অবাক হয়ে গেলেন বিজন দত্ত।

'না। ভাই থাকে। সে শ্রোতা, দর্শক।'

'তোমার ভাল ছবি বাড়িতে আছে?'

'না। ভাল নেই।'

বিজন দত্ত কুহেলির দিকে তাকালেন, 'আপনি কাল বিকেল তিনটে নাগাদ ওকে নিয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আসুন। ওখানে আমার ক্যামেরাম্যান ওর ছবি তুলে নেবে। তখন ডায়ালগ পড়িয়ে দেখব।'

'স্টুডিওটা কোথায়?' কুহেলি তাকালেন।

'আমি বলে দেব।' শোভন বললেন।

'টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছে।'

'তুই কি করে জানলি?' কুহেলি অবাক।

'ম্যাগাজিনে পড়েছি।' পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'হিরো কে?'

'উত্তমকুমার।' বিজন দত্ত জবাব দিলেন।

'ও। হিরোইন?'

'সুচিত্রা সেন করবেন বলে ঠিক আছে, যদি ডেট না পাই তাহলে সুপ্রিয়া দেবী। তোমার চেহারায় সঙ্গে সুপ্রিয়া দেবীর মিল আছে। ওরই ছোটবেলার চরিত্রে তোমাকে নিতে বলেছেন শোভনবাবু।'

কুহেলি বললেন, 'আর কিছু ওকে জিজ্ঞাসা করবেন?'

বিজন দত্ত মাথা নাড়লেন, 'না। তুমি যেতে পারো।'

শোভন বলল, 'এখন কি করবে? এখানে বসবে, না বেরুবে?'

'চল, বের হই। প্রোডিউসারের বাড়িতে চিত্রনাট্য নিয়ে বসতে হবে। তুমিও চল।'

মাথা নাড়ালেন শোভন। তারপর কুহেলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি।'

কুহেলি কিছু বললেন না। বিজন দত্ত নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে তিনি হাতজোড় করলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইলেন কুহেলি। হঠাৎ সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। দুহাতে মুখে ঢেকে ছিটকে ওঠা কান্নাটাকে চাপতে চেষ্টা করলেন তিনি। এই কান্না কী কারণে তিনি জানেন না। ছোটমেয়ের বেপরোয়া কথাবার্তা, শোভনের নির্লিপ্ত আচরণ, না তাঁকে এভাবে একা রেখে শোভনের বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, নাকি সব মিলেমিশে নিজের জন্যে কাঁদলেন কুহেলি? বুকের ভেতর দমবন্ধ চাপ, অস্থির লাগছে শরীর। হঠাৎ মনে হল, সদানন্দ তাঁকে প্রতি রাত্রে যে যন্ত্রণা দিত তখনও তাঁর এরকম অনুভূতি হয়নি।

তিন

লেখার চাপ খুব, শোভন গেলেন না, কিন্তু কিভাবে যেতে হবে কুহেলিকে বুঝিয়ে দিলেন। এই বাড়ির গাড়ি সদানন্দের মৃত্যুর ছয়মাস পরে বিক্রি করে দিয়েছেন কুহেলি। তাই আজ ট্যাক্সিতে যেতে হল। পাখি খুব উত্তেজিত। যেতে যেতে অনেক কিছু কল্পনা করে বকবক করছিল। উত্তমকুমারকে দেখতে পেলে সে কি করবে! উত্তমকুমার যদি তার সঙ্গে কথা বলেন তাহলে কী বলবে সে! শেষ পর্যন্ত কুহেলি বলতে বাধ্য হলেন, 'বিজন দত্ত কিন্তু তোকে এখনও ফাইনাল করেননি। ছবি তোলা হবে, সংলাপ পড়ানো হবে, তারপর—!'

'তাতে কোন অসুবিধে হবে না। আমি ফেল করব না।' হাসল পাখি।

এবং ব্যাপারটা তাই হল। ফটো তুলল, সংলাপ বলিয়ে খুশি হলেন বিজন দত্ত। স্টুডিওর ভেতরে ওঁর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে চা খাইয়েছেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার ছবিতে ওঁর কাজ দিন চারেকের। একেবারে নতুন হলেও শোভনবাবুর ক্যান্ডিডেট বলে দুহাজার টাকা দেওয়া হবে। ট্যাক্সি ভাড়া এর মধ্যে। প্রোডাকশন ম্যানেজার জানিয়ে দেবে কবে স্যুটিং হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পাখি চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'দেখলে?'

বিজন দত্ত বললেন, 'কি ব্যাপার!'

পাখি বলল, 'মা বলেছিল আপনি আমাকে ফাইনাল করেননি। আমি বলেছিলাম ফেল করব না। তাই তো হল!'

সেই সন্ধেবেলায় শিবানী এল এই বাড়িতে। বিকেলে খবর পেয়েছে সে কুহেলির কাছে। পাখির জন্যে কেক আর নিজেদের জন্যে হুইস্কির বোতল! শোভনের আজ একটু বেরুনোর দরকার ছিল। শিবানী আটকে দিল। এত ভাল খবরটা হৈ হৈ করে সেলিব্রেট না করলে চলে! কুহেলিকে বলল যে, 'কেমন দেখলে স্টুডিও? উত্তমকুমারকে দেখেছ?'

'না! অনিল চ্যাটার্জিকে দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু—।' কুহেলি থামলেন।

'কিন্তু কি?'

'স্টুডিওর চত্বরে দাঁড়ানো লোকগুলো এমন করে তাকাচ্ছিল যেন আমাকে গিলে খাবে। ওই চাহনি দেখেই বোঝা যায় লোকগুলোর চরিত্র ভাল নয়।' কুহেলি বললেন।

শিবানী হাসল, 'কাকে গিলছিল, মেয়েকে না মাকে?'

'এম্মা। কী অসভ্য।' মুখ চোখে আপত্তি ফুটল কুহেলির।

শোভন বললেন, 'এইখানে আমি একটু সংযোজন করছি। কুহেলি যখন মেয়েকে নিয়ে স্টুডিও যাচ্ছিল তখন ওঁকে দেখতে মধুবালার মতো মনে হচ্ছিল। আর বয়সটাও পঁচিশের বেশি বলে কেউ ভাবতে পারবে না।'

'এবার কিন্তু আমি এখান থেকে উঠে যাব।' কপট ভঙ্গি করলেন কুহেলি।

'শোভনদা, এবার নতুন লেখার জায়গা খুঁজুন। কুহেলিদেবী খুব শিগ্‌গির এত স্তাবক পাবেন যে আপনাকে সময় দিতে পারবেন না!' শিবানী হাঁসল।

এইসময় নিচে বেল বাজল। কুহেলি কথা ঘোরালেন, 'আবার কে এল?'

শোভনের কথায় যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল সেটা এড়াতেই তিনি ব্যালকনিতে চলে এসে নিচে তাকালেন। ততক্ষণে কাজের লোক দরজা খুলেছে। মিস্টার পাকড়াশি আর বড় মেয়ে বাড়িতে ঢুকছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে হল কি করে? ফোন না করে এ বাড়িতে আসছেন কেন ভদ্রলোক? এসব প্রশ্ন মাথায় আসামাত্র তাঁর মনে এল হুইস্কির বোতলটার কথা, যেটা শিবানী সগর্বে টেবিলের ওপর রেখেছে! দ্রুত ঘরে এসে বোতলটাকে সোফার কোণে সরিয়ে দিতে দিতে কুহেলি বললেন, 'বড় মেয়ে এসেছে ওর বাবার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। ওরা চলে যাওয়ার পর বোতলটা খুলতে হবে।'

প্রথমে বড় মেয়ে ঘরে ঢুকল, পেছনে মিস্টার পাকড়াশি।

একটু হকচকিয়ে গেল বড় মেয়ে। কুহেলি বললেন, 'আয়।'

'হঠাৎ চলে এলাম। উনি বললেন, মানে ফোন করার সুযোগ ছিল না।' মেয়ে বলল।

'আসুন মিস্টার পাকড়াশি। প্লীজ বসুন।' কুহেলি নমস্কার করলেন।

'এভাবে আসাটা ঠিক নয়। বিব্রত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি।' পাকড়াশি বললেন, 'আসলে একটা সিদ্ধান্ত আজকের মধ্যে নিতে হচ্ছিল—।'

'বসুন। আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। মিস্টার পাকড়াশি। আমার স্বামীর পরিচিত। ইনি বিখ্যাত লেখক শোভন দাশগুপ্ত, আমার বান্ধবী শিবানী। শিবানী, তুমি তো আমার বড় মেয়েকে আগেও দেখেছ।'

শিবানী হাসলেন, 'কেমন আছ?'

সুজাতা মাথা নাড়ল, 'ভাল।'

শোভন তাকালেন, 'তোমার নাম?'

'সুজাতা।' তারপর হাসল সে, 'আমি আপনার অনেক বই পড়েছি?'

'তাই?'

'খুব ভাল লাগে আপনার লেখা।'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার পাকড়াশি, ওঁর বই পড়েছেন।'

'না। সত্যি কথা বলতে কি, গল্প উপন্যাস পড়ার সময় সুযোগ আমার হয়

না। ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেসটা তৈরি হয়নি। ইঁট কাঠ সিমেন্ট নিয়ে পড়ে আছি।' মিস্টার পাকড়াশি বললেন।

শিবানী বলল, 'লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেলে সরস্বতীর প্রয়োজন কমে যায়।'

কুহেলি হাসলেন, 'কি খাবেন বলুন।'

মিস্টার পাকড়াশি বললেন, 'ধন্যবাদ। আমরা ফ্লুরিজ রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলতে বলতে উঠে এসেছি। ওখানেই খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'ব্যাপারটা কি? এঁদের সামনে বলতে অসুবিধে আছে?'

'বিন্দুমাত্র নয়। সুজাতাদের ফ্ল্যাটটা চেঞ্জ করা দরকার, আপনি জানেন। এদিকে হঠাৎই খবর পেলাম থিয়েটার রোডে একটা বাইশশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট লিজে পাওয়া যাবে। যোগাযোগ করে জানলাম আজই বাড়িওয়ালা ফাইনাল করতে চান। আমি চাইছি সুজাতার নামে ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিতে। কিন্তু সুজাতা আপত্তি করছে। এত সস্তায় কলকাতার ঠিক মাঝখানে আর কোন ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে না।'

সুজাতা বলল, 'অনেক টাকা মা!'

'কত?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'দু-লাখ টাকা।' সুজাতা জানাল, 'তারপর মাসে একশ টাকা দিতে হবে লিফটের জন্যে। আমরা এখন এত টাকা কোথায় পাব?' সুজাতা গম্ভীর হল।

'আমার খারাপ লাগছে বলতে, মিসেস সেনকে আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাতে তিনি যদি রাজি থাকেন তাহলে এই টাকাটার কোন সমস্যা হবে না।'

কুহেলি বললেন, 'ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—!'

শোভন বললেন, 'শিবানী, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় আমাদের থাকা ঠিক কি।'

কুহেলি হাত তুললেন, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়, বোসো।'

বলেই বুঝলেন মেয়ের চোখে একটা কিছু খেলে গেল।

মিস্টার পাকড়াশি বললেন, 'গোবিন্দপুরের দশকাঠা জমি যা মিস্টার সেন কিনেছিলেন তা বিক্রি করলে এখন লাখ চারেকের বেশি পাবেন না। আমি তার বদলে আপনাকে চারটে ফ্ল্যাট দিচ্ছি যার দাম আট লাখ। আর দুলাখ দিচ্ছি থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটটা লিজ নিতে। মনে রাখবেন আমি পকেট থেকে দিচ্ছি না। ওই প্রজেক্ট থেকে আমার অনেক বেশি প্রফিট থাকবে।'

'বাঃ। এ তো ভাল কথা। তোর আপত্তি কেন?'

'ওরকম সাহেবপাড়ায় উনি দুলাখ দিয়ে ফ্ল্যাট পাইয়ে দিচ্ছেন, তোমার জামাই বলছে ওখানে থাকতে অসুবিধে হবে।' সুজাতা বলল।

'অমিয়কে বলবি সব ঠিক হয়ে যাবে। পরে ওর সঙ্গে কথা বলব আমি। উনি যা বলছেন তাই কর। থিয়েটার রোডের মতো জায়গায় অতবড় ফ্ল্যাট থাকা

মানে তো ভবিষ্যতে বিরাট ভরসার ব্যাপার।' কুহেলি বললেন।

সুজাতা চুপ করে রইল।

শিবানী বলল, 'কেউ ভালবেসে কিছু দিলে নিতে হয় সুজাতা।'

শোভন বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এই দুলাখ টাকা ওকে ভালবেসে দিচ্ছেন?'

'তাছাড়া আর কি কারণ থাকবে আমি জানি না।' মিস্টার পাকড়াশি বললেন।

'তাহলে রাজি হয়ে যাও সুজাতা। তোমার বরকে বুঝিয়ে বল।'

সুজাতা আড়চোখে একবার শোভনকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল।

শোভন বললেন, 'মিস্টার পাকড়াশি কি এখনই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন?'

'কেন বলুন তো?'

'আমরা একটু পান করতাম, যদি আপনি আপনার সঙ্গ দেন—!'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'না। আমি ওই রসে বঞ্চিত। তাহলে উঠি।'

সুজাতাও উঠল, 'এলাম।'

কুহেলি বললেন, 'আয়।'

ওরা চলে গেলে শিবানী বলল, 'মেয়েটা সত্যি বোকা।'

'ভাল মেয়েদের চিরকালই বোকা বলে মনে হয়।' শোভন বললেন।

'তার মানেটা কি?' শিবানী রেগে গেলেন।

'বেচারা সুজাতা বিপদে পড়েছে। কুহেলির কাছে শুনেছি অমিয়কে ও ভালবেসে বিয়ে করেছে। অমিয় খুব সাধারণ চাকুরে জেনেই করেছে। তখন কুহেলির আপত্তিতে ও কান দেয়নি। স্বামীর সামান্য আয়ে সস্তার বাড়িতে, বাজে পাড়ায় থাকছে, শাকভাত খাচ্ছে, ওদের মতো ভালই আছে। এরকম পরিবারের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। এখন একজন বয়স্ক মানুষ তাকে ভালবেসে সাহেবপাড়ায় অভিজাত ফ্ল্যাট দিতে চাইছে যেখানে থাকলে তার স্বামী অস্বস্তিতে পড়বে। সুজাতা নিশ্চয়ই জানে সেই নতুন ফ্ল্যাট পেলে এই পাকড়াশি কর্তৃত্বে থাকতে হবে, স্বামীকেও সেটা মানতে হবে। যে কোন উচ্চাভিলাষী নারীর মতো সুজাতা এই প্রস্তাবে তাই এককথায় রাজি হতে পারেনি। ওর মধ্যে এখনও মূল্যবোধ আছে বলেই পারেনি। ওর এই না পারাটাকে আমাদের বোকামি বলে মনে হচ্ছে। তবে এখন ও দ্বিধা কাটাতে পারবে।'

'শিবানী, গলা শুকিয়ে গিয়েছে। আরম্ভ করা যাক।' শোভন কথা শেষ করলেন।

শিবানী দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিল। কুহেলি বললেন, 'আজ আমি একটু খাব।'

শিবানী উল্লসিত, 'একি! এ যে শুনছি জলে ভাসে শিলা।'

তৃতীয় গ্লাসে হুইস্কির সঙ্গে জল মেশানো হল।

শোভন নিজের গ্লাস ওপরে তুলে বললেন, 'ছোট মেয়ের প্রথম সিনেমায়

সুযোগ পাওয়া আর বড় মেয়ের অভিজাত ফ্ল্যাট পাওয়ার দিনে অনন্ত উল্লাস।'

কুহেলি বললেন, 'উল্লাস?'

'চিয়ার্সের বাংলা উল্লাস।'

শিবানী চেঁচিয়ে উঠল, 'উল্লাস!'

বিশ্রী কটু গন্ধ, স্বাদটিও অপ্রীতিকর, গলা দিয়ে নামবার সময় মনে হল আগুনের গোলা নামছে। তারপরেই সব স্থির, কান গরম হয়ে থাকল শুধু। এবং তখনই তাঁর মনে পড়ল সেই ডায়মন্ডহারবারের হোটেলের কথা। সুভদ্রা নামের সেই মহিলা চেয়েছিলেন তিনি বিয়ার খান, সদানন্দ আপত্তি জানিয়েছিল। বাইরের মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে পারেন, তাকে মদ খেতে দেখলে তার ভাল লাগে কিন্তু ঘরের বউ যাকে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার দিতে তিনি নারাজ সে মদ খেলে বংশের মর্যাদা চলে যাবে। ঠিক বলেছিল সেদিন সুভদ্রা। প্রায় প্রতিশোধ নেওয়ার ভঙ্গিতে বড় চুমুক দিলেন কুহেলি।

শোভন বললেন, 'ও কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন?

শিবানী বলল, 'মনে হচ্ছে মেয়ের ব্যাপারে বেশ আপসেট।'

'না। আমি অবাক। এই সেদিন এই বাড়িতে ওর সঙ্গে মিস্টার পাকড়াশির আলাপ করিয়ে দিলাম। ওদের ভদ্রলোকের গাড়িতে বাড়ি পাঠালাম। এর মধ্যে সম্পর্কটা এত কাছাকাছি হয়ে গেল যে ভদ্রলোক দুলাখ খরচ করতে রাজি হলেন?'

'তোমার জমিটা থেকে প্রফিট করবেন বলে করছেন।' শিবানী বলল।

'দূর। সদানন্দ সেন যে লেকের পাশে জমি কিনেছে তাই তো আমি জানতাম না। উনি বলার পর কাগজপত্র খুঁজে বের করলাম। সেই জমিতে ওঁকে বাড়ি তুলতে আমি নাও দিতে পারি। তাহলে? শুনলে তো ফ্লুরিজ রেস্টুরেন্ট থেকে আসছে। তার মানে ওরা প্রায়ই বাইরে দেখা করে। অমিয় এসব জানে কিনা কে জানে! এই সেদিন আলাপ, এর মধ্যে ভদ্রলোক মেয়েটাকে— !' আবার চুমুক দিলেন কুহেলি।

শিবানী হাসল, 'তা যদি বল, সেদিনই তো তোমার সঙ্গে শোভনদার পরিচয় হয়েছিল।'

কুহেলি তাকালেন শিবানীর দিকে, হেসে ফেললেন।

শোভন বললেন, 'আসলে সময় কোন ফ্যাক্টর নয়।' মেয়েটা যদি ভাল থাকে সেটাই কাম্য। ফ্লুরিজে এক কাপ চায়ের দাম দশ টাকা। সাধারণ রেস্টুরেন্টে এক টাকা। কিন্তু ফ্লুরিজের চায়ের স্বাদ একবার পেলে অন্য চা খেতে ইচ্ছে হবে না। অমিয়র পক্ষে সেটা যোগানো সম্ভব নয়। অতএব ওর ভাল হোক এটাই সবাই চাই।'

শিবানী আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'পাকড়াশির সঙ্গে সুজাতা ইনভল্‌ব হচ্ছে

বলে তোমার মন খারাপ হওয়া উচিত নয়। তুমিই তো ওকে ওর গাড়িতে লিফট নিতে বলেছিলে। নিশ্চয়ই সেরকম ইচ্ছে তোমার ছিল।'

কুহেলি তাকাল। তারপর গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'বেশ। তাই। আমি ওর বিয়ে সমর্থন করিনি। সারাজীবন অর্থাভাবে কষ্ট পাবে এটা মানতে পারিনি। পাকড়াশি লোকটা ভাল। কিন্তু বেশ গম্ভীর। কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। তা চাক, মাথার ওপর এরকম লোক থাকলে অন্য বেনোজল ঢুকতে পারবে না। কাউকে বলিনি, তোমাদের বলছি। বড় মেয়ের প্রেমে পড়েছিল একটা কলেজে পড়া ছেলে। চালচুলো নেই, শুধু বুকে ভালবাসা আছে। বড় মেয়ে তার প্রতি একটু দুর্বল হচ্ছিল। অমিয় যদি জোর করে সই না করাতো তাহলে হয়তো একটা সময় বড় মেয়ে সেই ছেলের জন্যে পাগল হত। আমি এই বিয়েতে আপত্তি করেছি বটে কিন্তু বাধা দিইনি, কারণ ও একেবারে ডুবে না গিয়ে খড়কুটো ধরে ভেসে থাক, এটাই চেয়েছি। কিন্তু খড়কুটো ধরে কতদিন ভাসা যায়।'

'সেই ছেলেটির কি হয়েছে? দেবদাস হয়ে গেছে?' শিবানী জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না। পায়ের তলায় মাটি নেই অথচ প্রেম করতে চায় যারা তাদের প্রতি আমার কোন সমর্থন নেই। আমাকে আর একটা দাও!' গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন কুহেলি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কুহেলি বেহুঁস হয়ে গেলেন। তাঁর আঁচল বুকে থাকছিল না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। শিবানী বলল, 'আর নয় চলি। প্রথম খেয়ে তুমি সহ্য করতে পারনি।'

'না না।' জড়ানো গলায় কুহেলি বললেন, 'ঠিক আছি।'

কিন্তু তিনি ঝাপসা দেখছিলেন। মাথায় কিছু ঢুকছে না। উঠতে গিয়ে টলে গেলেন।

'তুমি শুয়ে পড়, আমি চলি।' শোভন বললেন।

'না। তুমি ওর সঙ্গে যাবে না।' খপ করে শোভনের জামা ধরলেন কুহেলি, 'নো। যাবে না।'

'আরে! আমি আমার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

'বিশ্বাস করি না। তোমরা পুরুষমানুষরা সব করতে পারো। বাড়ির বউকে বাইরে বসিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে শুতে পার।' থেমে থেমে কথাগুলো বললেও সব স্পষ্ট হচ্ছিল না।

শিবানী বলল, 'নাঃ, এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে। শোভনদা, তুমি থাকো। ও আউট হয়ে গেলে যেয়ো। আমি চললাম।'

শিবানী চলে গেলে শোভন বললেন, 'হাত সরাও।'

'না। তুমি চলে যাবে!'

'যাচ্ছি না। আর মদ খাবে?'

'খাবো।'

'এখন আর বাজে গন্ধ, তেতো লাগছে না?'

'না।'

শেষ গ্লাস অর্ধেক খাওয়ার পরেই সম্পূর্ণ জ্ঞান হারালেন কুহেলি। তাঁকে তুলে হেঁচড়ে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলতে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়লেন তিনি। একমাত্র বুকের নড়াচড়া ছাড়া মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই।

এইসময় বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। একা গ্লাস নিয়ে বসলেন শোভন। এতক্ষণে তাঁরও নেশা হয়েছে। নেশা হয়েছে কিন্তু বেহুঁশ হননি কখনও।

গ্লাস নিয়ে লেখার ঘরে গেলেন তিনি। জানলায় দাঁড়ালেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি না থামলে বেরুতে পারবেন না। হঠাৎ মনে হল কুহেলি বেশ বাড়াবাড়ি করছেন। অযথা শিবানীকে সন্দেহ করছেন। তাঁকেও বাদ দিচ্ছেন না। বড় মেয়েকে একটি ধনী ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন প্ল্যান করে, আবার তারা যুক্ত হচ্ছে দেখে অখুশী হয়েছেন। মহিলা ঠিক কি চান বুঝতে পারেন না শোভন। হ্যাঁ, ছয় বাচ্চার মা বলে মোটেই মনে হয় না ওকে, দেখেও মনে হয় না, অন্য সময়েও। কিন্তু দীর্ঘকাল অত্যাচারিতা থেকে যে অভ্যেস তৈরি হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে জোর করে ভালবাসার চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করলেন শোভন। কোথাও বাজ পড়ল। শব্দ হল খুব। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গলায় গান এল, 'পরাণসখা বন্ধু হে আমার।'

এককালে ভালই গাইতেন। এখনও পুরোনো বন্ধুরা সেকথা বলেন। আজ বাইরে বৃষ্টি, শরীরে মদের প্রতিক্রিয়া তাঁকে পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ইজিচেয়ারটায় বসে চোখ বন্ধ করে একের পর এক বর্ষার গান গেয়ে চলেছিলেন তিনি। হঠাৎ কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শ পেতে গান থামিয়ে মুখ ফেরালেন।

'কি সুন্দর গান গাও তুমি।'

'তুমি? ঘুমোওনি?' বিস্ময়ে উঠে বসলেন শোভন।

'ঘুমোলে এখানে আসতাম কি করে। আগের মত আধশোওয়া হয়ে গান গাও।' ওঁর কাঁধে চাপ দিল পাখি।

'নাঃ। গান হবে না। বৃষ্টি থামলে বাড়ি যাব।'

'বৃষ্টি আগে থামুক। তোমার গ্লাস শেষ। আর খাবে না?'

'না। নেশা হয়ে গিয়েছে।'

'নেশা হলে তুমি গান গাও?'

হাসলেন শোভন। সঙ্গে সঙ্গে পাখি বলল, 'তোমার হাসিটা দারুণ। খুব মিষ্টি।'

'বুঝলাম। যাও, নিজের ঘরে যাও।'

'কেন? আমি এখানে থাকলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আমার নেশা হয়েছে। এসময় তোমার থাকা উচিত নয়।'

'কেন? আমাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে?'

মাথার ভেতর কি একটা হয়ে গেল। পাখি দাঁড়িয়ে আছে ওঁর শরীর ঘেঁষে। নিজের সঙ্গে লড়াই করতে চাইলেন না শোভন। হাত বাড়িয়ে পাখির মুখটা টেনে নিয়ে ওর দুই ঠোঁটে চুমু খেলেন অনেকক্ষণ ধরে।

তিনি মুখ সরিয়ে নিতে পাখি হাসল, 'ব্যাস?'

'তার মানে?'

'এটুকু?'

'তুমি, তুমি আমাকে উত্তেজিত করছ পাখি।'

'উঁহু।'

'মানে?'

'আমি মূল্য দিতে এসেছি।'

'তার মানে?' হাঁ হয়ে গেলেন শোভন।

'তুমি আমাকে ব্যবহার করতে পারো।'

'এ কি বলছ তুমি?'

'বাঃ, তুমিই তো বলেছ ওপরে ওঠার সিঁড়ি যে দেবে যে সে আমাকে ব্যবহার করবে। বলনি? তুমিই তো আমাকে প্রথম সুযোগ পাইয়ে দিয়েছ, তাই—।'

শোভন উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথা না বলে বাইরের ঘরে এলেন। কুহেলির বেডরুমের পর্দা অর্ধেক সরানো। খাটের ওপর তাঁর বেহুঁশ শরীর পড়ে আছে। তিনি দ্রুত নেমে এলেন নিচে। দরজা খুলে রাস্তায় পা রাখলেন।

ভারী বৃষ্টিতে জল জমছে রাস্তায়। একমুহূর্তেই ভিজে কাক হয়ে গেলেন শোভন। কয়েক পা হাঁটতেই বুঝলেন নেশা উধাও হয়ে গিয়েছে। জনশূন্য রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। হাঁটতে হাঁটতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে এসে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ঘুমন্ত লোকটাকে তুলে পয়সা দিয়ে ফোন করলেন। শিবানীর গলা, 'ও, শোভনদা, খুব জোর বেঁচে গেছি। আজ বেশি খাইনি তো। ফিরে এসে বরের ফোন পেলাম। ও এসে গেছে। এয়ারপোর্টে বৃষ্টির জন্যে আটকে গেছে। এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না গো'।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন শোভন। সবাই যে যার নিজের জায়গায় ঠিকঠাক রয়েছে। নির্জন রাত্রে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একটা ট্যাক্সির প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকলেন শোভন।

গতকাল ঠিক কি হয়েছিল কুহেলি কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। কিন্তু সকাল দূরে থাক দুপুর গড়িয়ে গেল, শোভন এ বাড়িতে এলেন না। এই সময়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তাঁর অনেকটা লেখা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে দু-দুবার তিনি ফোন করেছিলেন, শোভনের ফোন বেজে গেছে। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে শিবানীকে ফোন করেছিলেন কুহেলি। শিবানী জানিয়েছে, শোভনকে রেখে সে চলে গিয়েছিল। রাত্রে তার স্বামী বাড়িতে ফিরে এসেছেন। এখন কিছুদিন সে কারও সঙ্গে দেখা করবে না। শিবানী নিচু গলায় জানিয়েছে কাল রাত্রে কুহেলি আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

কুহেলি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না আউট হওয়ার পর তিনি কি করেছেন? ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙল তখনও তাঁর শরীরে সন্ধেবেলার পোশাক। অর্থাৎ বেহুঁস অবস্থায় যখন ছিলেন তখন শোভন কোন সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেননি।

তৃতীয় দিনেও শোভনের ফোন না পেয়ে সোজা ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে গিয়ে দেখলেন দরজায় তালা দেওয়া। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা যা বললেন তাতে বোঝা গেল শোভন স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সুট্যকেস যখন সঙ্গে ছিল তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। মদ খেয়ে বেহুঁস হওয়ার কারণে তাঁকে না জানিয়ে যদি শোভন বাইরে যান তাহলে বুঝতে হবে তিনি অপাত্রে ভালবাসা দিয়েছেন। সদানন্দ চাননি তিনি মদ খান। তাতে ওঁর বংশের অসম্মান হবে। শোভনও চাননি কারণ তাতে ওঁর সম্মানে লাগবে। খুব রাগ হয়ে গেল কুহেলির।

কিন্তু দুদিন বাদে রাগ কমে এলে শোভনের অভাব তীব্র হল। একটা মানুষ সারাদিন চোখের ওপর থাকত, লিখত। কিন্তু ব্রেকফাস্টের পর লিখতে যাওয়ার আগে তাঁকে চুমু খেয়ে যেত, সন্ধের পর বাড়িতে থাকলে শরীরে শরীর যোগ করত। নাই বা বিয়ে হল, এই পাওয়া তো কম নয়। সেই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষেপে গেলেন কুহেলি। যে বড় প্রকাশক শোভনের দামি এবং জনপ্রিয় বইগুলো ছেপেছে তাকে ফোন করলেন।

'আপনি কে বলছেন?' প্রকাশকের প্রশ্ন।

'আমি ওর বন্ধু বলছি।' কুহেলি বললেন।

'বলুন, কি জানতে চান!'

'শোভন কোথায় গিয়েছে?'

'লিখতে। কলকাতায় ওঁর লেখা হচ্ছিল না। পুজোয় আনন্দবাজার, দেশ, আনন্দমেলা ছাড়াও ছদ্মনামে আর একটি সিনেমা পত্রিকায় লিখে থাকেন। সেসব লেখা লিখতে বাইরে গেছেন।' প্রকাশক বললেন।

'বুঝলাম। কিন্তু জায়গাটার নাম কি?'

'আপনি বললেন ওঁর বন্ধু। আপনি জানেন না?'

'আমি কলকাতায় ছিলাম না।'

'ও।'

'উনি দার্জিলিং-এ গেছেন।'

'কোথায় উঠেছেন।'

'হোটেল স্যানিটোরিয়ামে।' প্রকাশক বললেন, 'কিন্তু ওকে ফোন করবেন না।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

দার্জিলিং-এ গিয়ে লেখার কোন পরিকল্পনা শোভনের ছিল না। অথচ আচমকা চলে গেল সে। কুহেলির ইচ্ছে করছিল তখনই দার্জিলিং-এ যেতে। কিন্তু আজ বাদে কাল ছোট মেয়ের স্যুটিং। ওকে একা রেখে যাব কি করে!

পাখিকে নিয়ে স্টুডিওতে পৌঁছেছিলেন ঠিক সাড়ে আটটায়। প্রোডাকশন ম্যানেজার ফোন করে ওই সময়টাই দিয়েছিল। বিজন দত্ত খাতির করে ফ্লোরে তাঁকে বিশেষ চেয়ার দিয়েছিল। প্রথম শট যখন একবারে ও.কে. হয়ে গেল তখন হাততালি পড়ল। বিজন দত্ত মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ভেরি গুড।'

সারাদিনে গোটা পাঁচেক সংলাপ বলেছে পাখি। তাতেই সবাই উচ্ছ্বসিত। একই শট বাবংবার নিতে হচ্ছিল একজন বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতার জন্যে। বিরক্ত হয়ে ফ্লোরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কুহেলি। ভেতরে প্রচণ্ড গরম। শটের সময় ফ্যান বন্ধ করায় সেটা সহ্যের সীমা ছাড়ায়।

'নমস্কার। আপনি পাখির মা?'

কুহেলি দেখলেন একটি মধ্যবয়সী মোটাসোটা মানুষ তাঁর সামনে।

মাথা নাড়লেন তিনি।

'দারুণ। দারুণ অ্যাকটিং করছে আপনার মেয়ে। আমি বাবুলাল গুপ্ত। এই ছবির প্রোডিউসার। ইনফ্যাক্ট আমার বাবা হলেন অরিজিন্যাল প্রোডিউসার। আমি ওঁর হয়ে দেখাশোনা করি।'

'নমস্কার। খুব ভাল লাগছে আলাপ করে।' কুহেলি বললেন।

'আপনাকে একটা কথা বলি মিসেস সেন। আপনার মেয়ের খুব ডিম্যান্ড হবে কিন্তু আপনি সব ছবিতে সাইন করবেন না।'

'কেন?'

'বারোটা বেজে যাবে ক্যারিয়ারের। এই ছবি রিলিজ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করুন। চা কফি না ঠাণ্ডা?'

গরমে পচছিলেন, তাই বলে ফেললেন, 'ঠাণ্ডা।'

'আসুন আমার ঘরে।'

স্টুডিওর ভেতরে সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বললেন বাবুলাল। দুটো ঠাণ্ডা আনার হুকুম দিয়ে বললেন, 'বেঙ্গলে আছি আশি বছর। তা আমাকে বেঙ্গলি বলতে পারেন। একটা কথা বলব মিসেস সেন?'

'বলুন।'

'আপনি নিজে কেন অ্যাকটিং করছেন না?'

'কি যে বলেন!'

'ঠিক বলছি। কী ফিগার আপনার। কী ফেস!'

'আমার কত বয়স জানেন?'

'বয়স? দেখুন মিসেস সেন, উর্বশীর কত বয়স?'

'উর্বশী?'

'স্বর্গের অপ্সরা। ড্যান্সার!'

'ও বাব্বা।'

'উর্বশীর বয়স কাউন্ট করা যায় না। আজ যদি তিনি বোম্বে ফিল্মে অ্যাকটিং করতে যান রাজকাপুর দেবানন্দের হিরোয়িন বানিয়ে দেবেন। "ফ্রম প্যারাডাইস টু নন্দনকানন" নামে ফিল্ম হয়ে যেত।'

'ঠিক আছে। কথাটা শুনলাম।'

'মিসেস সেন। নেক্সট উইকে আমরা লোকেশন দেখতে দার্জিলিং যাচ্ছি। আমি বিজনবাবু আর ক্যামেরাম্যান। আমার ইচ্ছে আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে। খুব মস্তি হবে।' বাবুলাল হাসলেন।

পরপর তিনদিন স্যুটিং হল পাখির। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিওতে যান। স্যুটিং-এর সময় তিনি ফ্লোরের একপাশে বসে থাকেন, না থাকলে মেকআপ রুমে। এই তিনদিনেই অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হলেও উত্তমকুমারের দেখা পাননি। ইউনিটের লোকজনের কাছে বেশ খাতির পাচ্ছেন ওঁরা। একটি নতুন মেয়ে কিশোরী চরিত্রে অভিনয় করতে এলে খাতির পাওয়ার কথা নয়। শেষপর্যন্ত প্রোডাকশনের ম্যানেজার যখন জিজ্ঞাসা করল তখন কারণ বুঝতে পারলেন। লোকটা নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, দাদা কোথায় গিয়েছেন?'

'দাদা মানে?'

'শোভনদা। ওঁর গল্প-চিত্রনাট্যেই তো ছবি হচ্ছে।'

'আমি ঠিক জানি না।'

'ও।'

বুঝলেন এবং বুঝে খাঁরাপ লাগল। কিন্তু এখন তিনি কিছুই করতে পারেন না। তৃতীয় দিনে ম্যানেজার ওই ভদ্রলোককে নিয়ে ড্রেসিংরুমে এল, 'ম্যাডাম, অমলদা, অমল সেন এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

নমস্কার বিনিময়ের পর সে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি অমল চৌধুরী, ছবি করি। আপনার মেয়ের কথা শুনে ফ্লোরে এসেছিলাম। চমৎকার কাজ করছে ও। আমার পরের ছবিতে নায়কের বোনের চরিত্রে ওঁকে নিতে চাই।'

কুহেলি বললেন, 'আমি একটু বিজনবাবুর সঙ্গে কথা বলি।'

'নিশ্চয়ই। এই নিন আমার কার্ড। কথা বলে কালকের মধ্যে ফোন করবেন প্লীজ।'

ওঁরা চলে গেলে আয়নার সামনে বসে থাকা পাখি চিৎকার করে উঠল, 'ওযাও। দেখলে মা, দেখলে!'

বিজন দত্ত আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, 'শোভনকে জানিয়ে দেবেন।'

'উনি এখন কোথায় আমি জানি না।' কুহেলি গম্ভীর গলায় বললেন।

'অদ্ভুত ব্যাপার। শোভন হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্তত খবরটা রাখবেন!'

'না। আমাকে উনি জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি।'

সেই রাত্রে আচমকা স্থির করলেন কুহেলি, তিনি দার্জিলিং-এ যাবেন। গেলে কতটা ক্ষতি হতে পারে। বিজনবাবু ভদ্রলোক, বাবুরাম নিশ্চয়ই তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। তাঁকে দার্জিলিং-এ যেতে হবে স্যানোটোরিয়াম হোটেলে লুকিয়ে থাকা শোভনের মুখোমুখি হতে।

পাখি শুনে বলল, 'আমিও যাব।'

'তুই গিয়ে কি করবি?'

'আমি কখনও দার্জিলিং-এ যাইনি। আমি ভাই-এর সঙ্গে ঘুরব। ওখানে শ্যুটিং হবে তাতে তো আমি থাকব না।'

কুহেলি ভেবে দেখলেন ওদের সঙ্গে নেওয়াই ভাল। ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে একা যাওয়ার চেয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেলে অনেক নিরাপদ থাকা যাবে, গল্পও তৈরি হবে না। কিন্তু ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিলে বাবুরাম রাজি হবে কিনা তাতে সন্দেহ ছিল তাঁর। কিন্তু লোকটা এক কথায় হ্যাঁ বলল। জানিয়ে দিল সে আরও দুটো ট্রেনের টিকিট কাটছে।

ছোট ছেলের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। পাখি খুব উত্তেজিত। নিজের উত্তেজনা চেপে রেখেছেন কুহেলি। শোভনের সঙ্গে দেখা হলে কী কী বলবেন ঠিক করে নিচ্ছিলেন। যাওয়ার দিন সকালে সুজাতার ফোন এল। 'মা আজ তোমাদের আসতে হবে।'

কুহেলি অবাক হলেন, 'কোথায়?'

'আজ থেকে আমরা থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে থাকতে যাচ্ছি।' সুজাতা বলল।

'সে কি রে! কবে এতসব কাণ্ড হল, আমাকে বলার প্রয়োজন মনে করিসনি?' কুহেলির গলায় অভিমান।

'তোমাকে তো দিনের বেলায় পাওয়াই যায় না। তাছাড়া বলিনি কে বলল? শুদ্ধকে বলেছি টেলিফোনে, যেদিন ফ্ল্যাটের কাগজপত্রে সই হয়েছিল। ও তোমাকে বলেনি?' মেয়ে প্রশ্ন করল।

'না। ও এখন ছোটদির গ্ল্যামারে অন্ধ।'

'তাহলে কখন আসছ? বলি কি, বিকেলে চলে এসো সবাই, রাত্রে খেয়ে যাবে।'

'নারে। হবে না।'

'হবে না মানে?' মেয়ে ফুঁসে উঠল।

'আমরা থাকছি না। আজ সন্ধেবেলায় তিনজনে দার্জিলিং মেল ধরছি।'

'সে কি? হঠাৎ? কেন?'

'শোন। হঠাৎই হয়ে গেল। পাখি যে সিনেমায় চান্স পেয়েছে, তার স্যুটিং।'

শেষ করতে দিল না মেয়ে। 'পাখি সিনেমা করছে। আর এই কথাটা কেউ জানাওনি?'

'জানাবো জানাবো ভাবছিলাম, এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সব হয়ে গেল!'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সুজাতা বলল, 'এটা তুমি ঠিক করলে না মা!'

'সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। তোকে জানানো উচিত ছিল।' স্বীকার করলেন কুহেলি।

'না। আমাকে জানানোর কথা বলছি না। তোমাদের বাড়ির সব কথা আমাকে জানাতেই হবে এমন কোন দায় তোমার নেই। আমি বলছি পাখির কথা। মা হয়ে মেয়ের সর্বনাশ করে ফেললে বোধহয়। ওর যত ইচ্ছে থাক, তোমার রাজি হওয়া উচিত হয়নি। রাখছি।'

সুজাতা ফোন রেখে দিতে মন তেতো হয়ে গেল কুহেলির। তিনি কি করতে পারতেন? কিভাবে পাখিকে আটকাতেন? না। তিনি কিছুতেই পাখির সর্বনাশ হতে দেবেন না। সারাক্ষণ ছায়ার মতো ওর সঙ্গে থাকবেন। পাখি যখন অনেক নামী স্টার হবে তখন বড় মেয়েকে জবাবটা দেবেন।

চার

দার্জিলিং মেলের প্রথম শ্রেণিতে উঠেই কুহেলির মনে পড়ল সেই ডায়মন্ডহারবারে যাওয়ার কথা। সেদিন কামরাটা ছিল অন্যরকম। এখানে চারজনের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। গাড়িতে ভিড় কম বলে চতুর্থ আসনটি খালি রয়েছে। বাবুলাল, বিজন দত্তরা পাশের ক্যুপেতে। প্রোডাকশন ম্যানেজার বারংবার খবর নিয়ে যাচ্ছে। পাখি সিনে অ্যাডভান্স পড়ছে, শুদ্ধ মুগ্ধ হয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছে। কুহেলির মনে হল ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত। হাজার হোক এই যাত্রা তো বাবুলালের সৌজন্যেই হচ্ছে। এখন পর্যন্ত লোকটার আচরণে কোন খারাপ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েকে বললেন, 'ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দে, আমি বিজনবাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গে পাখি বলল, 'আমিও যাব।'

'কেন?'

'বাঃ। এই প্রথম ট্রেনে চড়েছি, ঘুরে দেখব না?'

শুদ্ধ মুখ ফেরালো, 'আমিও যাব।'

'না। ওখানে ওঁরা কি করছেন জানি না। তোমরা গেলে হয়তো বিরক্ত হবেন।' আর চলন্ত ট্রেনে ঘুরে দেখার কিছু নেই। বন্ধ করে দাও।' দরজাটা টেনে দিয়ে পাশের ক্যুপের সামনে এসে নক্ করলেন কুহেলি। দরজা খুলল প্রোডাকশন ম্যানেজার, 'ও ম্যাডাম! কোন প্রব্লেম?'

'না না। বিজনবাবুরা কোথায়?' কুহেলি হাসার চেষ্টা করলেন।

'আসুন আসুন ম্যাডাম। কি সৌভাগ্য। এই, ওঁকে বসতে দাও।' বাবুলালের গলা পেয়েই ভেতরে ঢুকেই মদের গন্ধ পেলেন, তারপরে গ্লাস আর বোতল চোখে পড়ল।

বিজন দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে কি করছে? ভাই-এর সঙ্গে গল্প?'

'ওই আর কি? আমরা কাল কখন দার্জিলিং-এ পৌঁছাচ্ছি?' কুহেলি বললেন।

'বেলা বারোটার মধ্যে। প্রথমবার যাচ্ছেন?' বিজন দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'ফ্যান্টাস্টিক জায়গা। খুব ভাল লাগবে। আমরা লোকেশন খুঁজে বেড়াবো, আপনারা শহর দেখবেন। বাবুলালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মিসেস সেনরা যাচ্ছেন কেন? কি বলল জানেন?'

মাথা নাড়লেন কুহেলি।

'বলল, প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যে মেয়ে অত ফাটাফাটি অভিনয় করে তাকে এই পুরস্কারটা দিলাম।' খুব বড় মন, কি বলেন?' বিজন দত্ত তাকালেন।

'নিশ্চয়ই।' তৎক্ষণাৎ কুহেলির মনে পড়ল বাবুলাল শুধু তাঁকেই যেতে বলেছিলেন সঙ্গে, মেয়ের কথা একবারও বলেননি।

বাবুলাল হাতজোড় করলেন, 'ম্যাডাম গল্প করতে করতে আমরা একটু পান করছি। আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে তাহলে এক গ্লাস দিতে বলি?'

'না না। আমি ওসব খাই না।' কুহেলি প্রতিবাদ করলেন।

'সেকি?' বিজন দত্ত গ্লাস তুললেন, 'শোভন জোর করে না?'

'উনি জানেন, আমি যদি ইচ্ছে না করি তাহলে জোর করে কোন লাভ হবে না। আচ্ছা, আপনারা এনজয় করুন। গুডনাইট।' কুহেলি বেরিয়ে এলেন।

ক্যাপেতে ঢোকামাত্র পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁরা কি করছেন মা?'

'ড্রিঙ্ক করছেন।'

'এই লাইনে সবাই ড্রিঙ্ক করে, না?' শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না।' কুহেলি গম্ভীর।

'শোভন আঙ্কল নিশ্চয়ই রোজ করেন।' পাখি বলল।

'তুই কি ওঁকে রোজ দেখেছিস?'

'এই কয়দিন তো রোজ দেখেছি।' পাখি বলল।

শুদ্ধ বলল, 'শিবানী আন্টিও ড্রিঙ্ক করে।'

'তুমি আগে করতে না, এখন কর।' পাখি বলল।

'তার মানে?' চমকে উঠলেন কুহেলি।

'শোভন আঙ্কল যে রাত্রে শেষবার ছিলেন সেই রাত্রে তুমি খাওনি? একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে বিছানায়!' হাসল পাখি।

'তুই কি করে দেখলি?'

'আমি তো নিচে এসেছিলাম।'

আর কথা বাড়াননি কুহেলি। পাখি যে নিচে এসেছিল তা তিনি জানেন না। এসে কি দেখেছিল? শোভন তখন কি করছিল? শোভন কি তাঁর পাশে শুয়ে—। সেটা পাখি দেখে ফেলেছে বলে চলে গিয়ে আর যোগাযোগ রাখছে না লজ্জায়? সেদিন যে কেন মদ খেতে গেলেন তিনি? পাখিকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছিল না তার। শক্ত মুখে বললেন, 'এবার ডিনার করে শুয়ে পড় সবাই। ভোর ভোর উঠতে হবে।'

একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে বসে ওঁরা যখন দার্জিলিং-এ

পৌঁছালেন তখন বেলা সাড়ে বারোটা। পাহাড়ে গাড়ি ওঠার পর থেকেই ছেলেমেয়ে উল্লসিত হয়েছে। মা দ্যাখো কি সুন্দর, অ্যাই দিদি, এদিকে দ্যাখ, মা দ্যাখো ঝরনা। সামনের সিটে বাসে বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কেমন লাগছে ম্যাডাম?'

'আসা সার্থক হল।' কুহেলি বললেন।

বাবুলাল বললেন, 'ও বিজনবাবু, সেই গানটা কি যেন, সার্থক, সার্থক—।'

'সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ম্যাডামও একই কথা বললেন, সার্থক, গুড!'

হোটেলটি খুবই ভাল। বাবুলাল চেয়েছিলেন ওঁরা দুটো ঘর নিক। তিনজনে একটু ঠাসাঠাসি হবে। কিন্তু কুহেলি একসঙ্গে থাকতে চাইলেন। একটা বাড়তি খাট ঘরে দিয়ে গেল হোটেল থেকে। খাওয়াদাওয়ার পর প্রোডাকসন ম্যানেজার জানিয়ে গেল, 'আমরা লোকেশন দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছি ম্যাডাম। আপনারা ইচ্ছেমতো ঘুরে সন্ধের মধ্যে হোটেলে চলে আসবেন। নতুন জায়গায় রাত্রে বাইরে থাকা ঠিক নয়।'

পাখি একটু শীতকাতুরে। গরমজলে স্নান করে ভাত খাওয়ার পর ঢুকে গেল লেপেব তলায়, 'কি আরাম। আমি এখন কোথাও বেরুচ্ছি না। বিকেলে বেরুবো।'

শুদ্ধ বলল, 'আমারও ঘুম পাচ্ছে। যখন যাবি তখন ডাকবি দিদি।'

পাখি বলল, 'মা, তুমিও শুয়ে পড়। কাল রাত্রে তো ট্রেনে ঘুমাওনি।'

'না। এখন ঘুমালে শরীর খারাপ হবে। আমি একটু নিচের দোকানগুলো ঘুরে দেখি।'

'কি কিনবে?' পাখি জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু না। ভাল কিছু চোখে পড়লে পবে দেখা যাবে।'

'আচ্ছা মা, এই ছবিটা রিলিজ করার পর রাস্তায় বেরুলে আমাকে ঘিরে ভিড় হবে?'

'কি জানি।'

'তিনটে ছবি রিলিজ করার পর কি অবস্থা হয় দেখো!'

'তখন তোকে গাড়ি কিনতে হবে দিদি।' শুদ্ধ বলল।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' বেরিয়ে গেলেন কুহেলি।

কয়েক পা হাঁটতেই কুহেলি বুঝলেন লোকজন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুটা নামার পর একটি চায়ের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'স্যানাটোরিয়াম হোটেলটা কোন্‌দিকে।'

লোকটা যে পথে যেতে বলল সেটা পৌঁছালো স্টেশনের কাছে। আর সেখান থেকেই দেখা গেল, অনেক নিচে একটা লনওয়ালা বাড়ির ছাদে

স্যানাটোরিয়াম শব্দটা লেখা রয়েছে। শোভন যদি ওখানে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই একবারের বেশি ওপরে ওঠেন না।

নিচে নেমে রিসেপশনে খোঁজ করে শোভনের ঘরের নাম্বার পেয়ে গেলেন কুহেলি। জানলেন শোভন ঘরেই রয়েছে। দোতলায় উঠে দরজায় শব্দ করতেই শোভনকে দেখা গেল।

প্রবল বিস্ময়ে শোভন বললেন, 'তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি। ভেতরে ঢুকতে পাবব?'

'নিশ্চয়ই।' সরে দাঁড়ালেন শোভন।

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকালেন কুহেলি। শোভন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে এসেছ?'

'আজ দুপুরে।'

'আমি এখানে এসেছি কি করে জানলে?'

'ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে সব জানা যায়।'

'ও। বসো।'

'এখানে বসে লিখছ?'

'হুঁ।'

'আমায় বলে এলে না কেন?'

'আচমকা চলে এলাম।'

'কেন? আমি প্রচুর পান করে আউট হয়ে গিয়েছিলাম বলে? তুমি তো আমার স্বামী নও যে তোমার ইগোতে লাগবে। আমি অভ্যস্ত নই বলে আউট হয়ে গিয়েছিলাম, তোমরা আয়ত্ত করেছ বলে হও না। এই তো পার্থক্য।' কুহেলি বললেন।

'সেটা কোন ব্যাপার নয়।' শোভন বললেন।

'তাহলে ব্যাপারটা কি?'

'ছেড়ে দাও এসব কথা। কদিন থাকছ এখানে? উঠেছ কোথায়?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না। শোভন, তুমি অ্যাতো লেখো আর এটুকু বোঝ না? ওইভাবে চলে আসা মানে আমাকে অপমান করা, আমাদের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করা।'

'আমি দুঃখিত কুহেলি।'

বিছানায় গিয়ে বসলেন শোভন।

'তোমাকে খবরটা দিই। পাখি তোমার গল্পের ছবিতে কাজ করছে। সবাই ওর প্রশংসা করছে। আরও ছবির অফার আসছে।'

'বাঃ। এ তো খুব ভাল কথা। তবে ওকে একা ছেড়ে দিয়ো না।'

'জানি।'

'তুমি খুশি তো?'

'সন্তানের সাফল্যে মা তো খুশি হবেই।'

'আমরা এখানে একা আসিনি।'

'আমরা মানে?'

'আমি, পাখি এবং শুদ্ধ।'

'ও। দলের সঙ্গে এসেছ?'

'হ্যাঁ। বিজন দত্ত, প্রোডিউসার বাবুলাল আর প্রোডাকশন ম্যানেজার।'

'সেকি!' অবাক হলেন শোভন।

'ওঁরা লোকেশন দেখতে আসছিলেন। বাবুলাল শুধু আমাকে আসার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। আমি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।'

'ওঁরা জানেন আমি এখানে আছি?'

'না। বলিনি।'

'ধন্যবাদ। না বলাই ভাল।'

'কেন?'

'তাহলে আমি লিখতে পারব।'

হঠাৎ কুহেলির মনে হল মানুষটা খুব একা। তিনি এগিয়ে গিয়ে দুহাতে শোভনের মুখ জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। কিন্তু শোভন তাঁকে জড়িয়ে ধরছে না, চুমুতে সাড়া দিচ্ছে না। কয়েক সেকেন্ড পরে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'এখন থাক।'

'ও।'

সরে গেলেন কুহেলি। একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'যাচ্ছি।'

'কোথায় উঠেছ বললে না।'

'কি দরকার। তুমি তো যাবে না। গেলে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।' কুহেলি কথাগুলো বলে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দুচোখ জলের আড়ালে, কোনরকমে ওপরে উঠে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। না একটুও বাকি নেই। শোভনের আচরণ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে! অথচ লোকটা কিছুতেই বলল না তার দোষ কোথায়।

হোটেলে যেতে ইচ্ছে করল না। হাঁটতে হাঁটতে ম্যালে চলে এলেন তিনি। এবং তখনই ওদের দেখতে পেলেন। দুই ভাইবোন দুটো ঘোড়ায় চড়েছে। শুদ্ধ চিৎকার করে ডাকল, দ্রুত চলে গেলেন কাছে, 'তোরা একা একা চলে এসেছিস এখানে?'

পাখি বলল, 'কি করব বল? বাবুলালদা বলল, চল ঘুরে আসবে। এই তো উনিই ঠিক করে দিলেন। তুমি থাকো আমরা একটা পাক দিয়ে আসি।'

সহিস লাগাম ধরে রাখলেও ঘোড়ায় চড়ার উত্তেজনা ওদের ভঙ্গিতে স্পষ্ট। কুহেলি চারপাশে তাকালেন। দারুণ সেজে নারী পুরুষেরা এই পাহাড়ি শহরের একমাত্র সমভূমিতে ঘুরছে। এটা একটা ফুটবল মাঠের অর্ধেক হবে। একপাশে রেস্টুরেন্ট, দোকান, অন্যপাশে পাহাড়। দুপাশে বেঞ্চি পাতা রয়েছে কিন্তু সেগুলো ট্যুরিস্টে ভর্তি। হঠাৎ দূর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রবলভাবে হাত নাড়তে দেখে বুঝতে পারলেন উনি বাবুলাল। বাবুলাল বেঞ্চিতে বসে আছেন একা। তাঁর দুপাশে কিছু পাঞ্জাবি নারীপুরুষ।

উঠে এলেন বাবুলাল, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আমরা চিন্তায় পড়েছিলাম।'

'এই আশেপাশে ঘুরছিলাম।'

'পাখিরা শুয়েছিল। জোর করে নিয়ে এলাম। আরে বাইরে এসেছ শুয়ে থাকতে? দেখুন এখন মজা করে ঘোড়ায় চড়ছে। ম্যাডাম কি ঘোড়ায় চড়বেন?' বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি? পাগল নাকি।'

'দেখুন, আপনার চেয়ে বড় মেয়েমানুষ ঘোড়ায় চড়েছে। সাদা ঘোড়াটার জান আজ বোধহয় চলে যাবে।' বাবুলাল যাকে দেখে কথাগুলো বললেন তাঁর ওজন কমসে কম দুশো কেজি হবে।

'বিজনবাবুরা কোথায়?'

'লোকেশন দেখতে গিয়েছে। ওদের কাজ ওরা করুক।'

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব!' কুহেলি মন থেকে বললেন।

'কি জন্যে?'

'এখানে আসার সুযোগ দিলেন বলে!'

'আরে, এই কিছু না। ম্যাডাম, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

'বলুন।'

'কিছু মনে করবেন না?'

'তেমন কিছু যদি না বলেন—!'

'দেখুন, এই ফিল্ম লাইনটা চার্চ নয়; এখানে শালা শকুন শেয়াল কাকের ভিড়। আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ খুব ভাল। দেখতেও সুন্দরী। আপনি ওর সঙ্গে স্যুটিং-এ আসেন। কিন্তু এভাবে বাঁচাতে পারবেন না ওকে। ওই শালারা ঠিক ঠোকরাবে।

'আমার তো ওই একটাই ভয়!' কুহেলি সত্যি কথা বললেন।

'কিছু ভেবেছেন?'

'না। ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

'আমি একটা সাজেশন দেব। ওর একটা সাইনবোর্ড দরকার। এ লাইনে সাইনবোর্ডের কথা হাওয়ার আগে ছড়িয়ে যায়। আর সেটা গেলে কেউ ওর ছায়া মাড়াতে সাহস পাবে না।' হাসলেন বাবুলাল।

'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি একটু টিউবলাইট আছেন। সরি, কিছু মনে করলেন না তো। আমার মন মুখে কোন ফারাক নেই। হ্যাঁ, ওর দরকার একজন গডফাদার।

'গড ফাদার?' অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি।

'আরে নভেলের গডফাদার না, ফিল্মি গডফাদার। যার আড্ডায় ও থাকবে। সেটা হলে ও শেয়াল শকুনদের কাছ থেকে বিলকুল সেফ।'

'গডফাদারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি হবে?'

'স্নেহের সম্পর্ক। আপদে বিপদে রক্ষা করবেন।'

'এরকম কাউকে তো আমি চিনিনা।'

'চিনতে চেষ্টা করুন। এই লাইনে সবাই আমাকে সমঝে চলে। কোন হ্যাঙ্কি পাঙ্কিতে আমি নেই। চাঁদির জুতা মেরে কাজ করি। আপনি রাজি হলে আমি ওর গডফাদার হতে পারি। আমি নিজে থেকে উপকার করতে চাইছি।' হাসলো বাবুরাম।

'ওকে কি করতে হবে?' আতঙ্কিত হলেন কুহেলি।

'কিস্যু না। শুধু ফিল্মি পার্টিগুলোতে ও আমার সঙ্গে যাবে। আমার কাছ থেকে নড়বে না। ব্যাস।'

'কিন্তু ও তো খুব ছোট।'

'এখনই তো ওর প্রটেকশন দরকার, যখন বয়স বাড়বে তখন থোড়াই আমাদের কথা ও শুনবে, দেখুন ম্যাডাম, আমাদের ঘরে ওর বয়সী মেয়ে আছে, আমি স্পষ্ট কথা বলি, আপনার সঙ্গে একটু ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই বলে ওর গডফাদার হতে পারি!'

কুহেলি তাকালেন বাবুলালের দিকে। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'বাবুলাল বাবু। আপনি জানেন না আমার ছয়টি সন্তান আছে। বড়টার বয়স আটাশ।'

হা হা করে হাসলেন বাবুলাল, 'কোনারকের মন্দিরে গিয়েছেন? যাননি। মন্দিরের গায়ে যেমন মূর্তি আছে তাদের বয়স হাজার হাজার বছর। আমার ঠাকুর্দা গিয়েছিল দেখতে, বাবা গিয়েছিল, আমিও। ওই দুজন ছবি হয়ে গিয়েছে কিন্তু মূর্তিগুলোর চেহারার বদল হয়নি। আপনার ফিগার, মুখ চোখ দেখলে মনে হয় বড়জোর এক বাচ্চার মা। আর হ্যাঁ, ফ্রেন্ডশিপ মানে আপনি ভাববেন না আমি ইল্‌লিগ্যাল কিছু করতে চাইছি। আমার বাবা বলেছিলেন, বাবুলাল, হুকুম করে

বন্ধুত্ব পাওয়া যায় না।' বাবুলাল হাসল, 'বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ওই যে ওরা এসে গেছে।'

কুহেলি তাকালেন। শুদ্ধ আপাদমস্তক গরম পোশাক পরে আছে। কিন্তু পাখির পরনে স্কার্টের ওপর পুলওভার, গলায় মাফলার। ঘোড়ার ওপর বসে থাকায় তার স্কার্ট ওপরে উঠে গেছে। হাঁটু আর কুঁচকির মাঝখান পর্যন্ত উন্মুক্ত। মেয়েটার কবে যে কাণ্ডজ্ঞান হবে। ওই স্কার্ট পরার কি দরকার ছিল?

টাকা বোধহয় আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়া থেকে নামতেই সহিসরা ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। শুদ্ধ খুব উত্তেজিত। বলল, 'মা, রাজভবন দেখলাম।'

পাখি বলল, 'সত্যজিৎ রায় যে পার্কে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্যুটিং করেছেন সেটা সহিস দেখাল। ইস্, আমি যে কবে এখানে স্যুটিং করতে পারব!'

বাবুলাল বললেন, 'পারবে। খুব শিগ্‌গির পারবে। শুদ্ধ বেটা, যাও তো, ওই আইসক্রিমওয়ালাকে ডেকে আনো তো!'

শুদ্ধ দৌড়াল। বাবুলাল বললেন, 'পাখি। তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার বয়স কম, বুদ্ধি এখনও কাঁচা। কিন্তু শরীরটা যে বড় হয়ে গেছে। পাবলিকের সামনে নিজের শরীর এক্সপোজ করবে না কখনও। এই ম্যালে যারা আছে তাদের সবাই তোমার থাই দেখছিল। যদি স্টার হতে চাও তাহলে পাবলিককে তোমার মুখও দেখাবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ইয়েস আঙ্কল।'

সেই সন্ধেবেলায় হোটেলে এসে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন কুহেলি। মেয়ে এবং ছেলে রেডিওতে বিবিধ ভারতী শুনছে। বাবুলাল লোকটাকে তাঁর খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু পাখিকে যেভাবে শাসন করেছেন তারপর আর সেটা ভাবা যাচ্ছে না। তারপরেই মনে পড়ল শোভনের কথা। বাবুলালের প্রস্তাবটা শোভনকে জানানো দরকার। যতই মান অভিমান হোক পাখির ব্যাপারে শোভন ঠিক কথা বলবে।

হঠাৎ পাখি বলল, 'মা, বাবুলালদা বেশ ভাল লোক, না?'

'বাবুলাল তোর দাদা হল কি করে?'

'উনি বলেছেন দাদা বলে ডাকতে।'

কুহেলি কিছু বলল না। কথা বলতে ভাল লাগছিল না তাঁর।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর বিজন দত্ত ঘরে এলেন, 'গুডমর্নিং ম্যাডাম। যাবেন নাকি?'

'কোথায়?'

'সান্দাক্‌ফুর রাস্তায়, মানেভঞ্জন নামে একটা জায়গায়। লোকেশন দেখতে যাচ্ছি।'

'সবাই মিলে যাচ্ছেন?'

'না না। বাচ্চারা থাক। ওরা আজ সকালে চিড়িয়াখানা দেখে আসুক। দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা খুব ইন্টারেস্টিং। এই একটা দিনই তো, আমরা কাল নেমে যাচ্ছি।'

কথাটা শুনে শুদ্ধ লাফাল, 'মা আমি যাব চিড়িয়াখানায়।'

পাখি বলল, 'যাও, ওখানে ছোটরাই যায়।'

বিজন দত্ত হাসল, 'তুমি বড় হয়ে গেছ নাকি! বাবুলালজী গাড়ি ভাড়া করেছেন, চিড়িয়াখানার কাছাকাছি যেতে পারবেন। ওখানে তেনজিং-এর পাহাড়ে চড়া শেখাবার স্কুল আছে। যাও দেখে এসো।'

কুহেলির খেয়াল হল। বলল, 'বসুন।'

'না বসব না। বাড়িতে একটা টেলিফোন করে আসব। ও হ্যাঁ, দারুণ খবর আছে।'

কুহেলি কৌতূহলী হয়ে তাকালেন।

'শোভন বোধহয় এখন দার্জিলিং-এ।'

'বোধহয় মানে?'

'নৃপেন, মানে আমাদের ম্যানেজার, কাল সন্ধেবেলায় ওকে জলাপাহাড়ের রাস্তায় হাঁটতে দেখেছে। বেশ কিছুটা দূরে ছিল ও। দৌড়েও ধরতে পারেনি। কোন একটা বাড়িতে ঢুকে গিয়েছিল শোভন। যেহেতু কথা হয়নি আর মুখ দ্যাখেনি তাই বোধহয় বললাম। কিন্তু হাঁটাচলা, শরীর দেখে ও তো সেন্ট পার্সেন্ট সিওর।'

'জলাপাহাড় কতদূরে?'

'মাইল খানেক দূরে। ওখানে ওর পরিচিত কেউ থাকেন?'

'আমি জানি না।'

'শোভন তো জানে না আমরা এখন এখানে এসেছি। জানলে নিশ্চয়ই আসত। আপনারা আছেন জানলে তো নিশ্চয়ই আসত।'

'হয়তো পুজো সংখ্যার লেখা লিখতে এসেছেন।'

'বোধহয়। তবে ওকে আমি দীর্ঘকাল জানি। বিকেলের পর লেখা ওর অভ্যেস নেই। আচ্ছা, চলি। আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তৈরি হয়ে নিন।' বিজন দত্ত চলে গেলেন।

পাখি বলল, 'শোভন আঙ্কল নিশ্চয়ই হোটেলে উঠেছেন।'

'জানি না।'

মাথা ধরার অজুহাতে দু-দলের কোনটাতেই গেলেন না কুহেলি। ওরা ফিরে

এলে লাঞ্চ হবে। ততক্ষণ বিশ্রাম নিলে সুস্থ হয়ে যাবেন তিনি।

ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আধঘণ্টা বাদে দরজায় তালা দিয়ে নিচে নামলেন কুহেলি। তারপর দ্রুত হেঁটে পৌঁছে গেলেন স্যানাটোরিয়ামে। দোতলায় উঠতে যাচ্ছিলেন, একটি বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনি কাল এসেছিলেন না?'

'হ্যাঁ। শোভনবাবু ঘরে নেই?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। উনি আজ সকালে হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন!' বেয়ারা বলল।

হাঁ হয়ে গেলেন কুহেলি। সামলাতে সময় লাগল। 'কোথায় গিয়েছেন?'

'কিছু বলে যাননি। আপনি হোটেলের কুলিকে জিজ্ঞাসা করুন। ও ওঁর স্যুটকেস নিয়ে গেছে।'

নিচে নেমে খোঁজখবর করার পর সেই বিশেষ কুলিটির সন্ধান পেলেন কুহেলি। লোকটা জানাল শোভন তাকে ওপরে যাওয়ার পর ছেড়ে দিয়েছেন। ওখানে একটা ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেই গাড়িতে চেপে বাজারের দিকে চলে গিয়েছেন। লোকটা জোর দিয়ে বলল, 'সাহেব শিলিগুড়ির দিকে যাননি।'

মাথা নিচু করে ওপরে উঠলেন কুহেলি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শোভন তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই থাকার জায়গা বদল করেছে। একটুও কান্না পাচ্ছিল না কুহেলির। তাঁকে বিনাদোষে শাস্তি পেতে হচ্ছে। সদানন্দের সময়েও একই ব্যাপার হত। পৃথিবীর সব পুরুষ বোধহয় এই একই রকম। তাঁর উচিত পাখিকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা। ওর জীবন এখনও শুরু হয়নি। পুরুষ আসবেই, তখন নিজেকে ভুলে সেই পুরুষের ওপর নির্ভর করতে চাইলে যে আছাড় খেতে হবেই তা ওর জেনে রাখা উচিত। ভালবাসা শব্দটা শুধু মেয়েদের জন্যে। ক্ষত হলে যেমন মলমের দরকার হয় এবং ক্ষত সেরে গেলে যেমন মলমের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তেমনি ভালবাসা পুরুষদের সাময়িক প্রয়োজন।

হঠাৎ খেয়াল হল কুহেলির। যে রাত্রের পর শোভন আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি সেই রাত্রে তিনি বেহুঁশ ছিলেন। পাখি তাঁকে ওই অবস্থায় দেখেছে। পাখি দোতলায় এসেছিল। তখন শোভন কি করছিল? নাকি পাখির দোতলায় নামার আগেই শোভন চলে গিয়েছিল। যদি না গিয়ে থাকে তাহলে পাখির সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? আজ, এখন কুহেলির মনে হল, পাখিকে জিজ্ঞাসা করলেই শোভনের এই আচরণের কারণটা জানা যাবে। অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি।

পাখিরাই আগে ফিরে এল। ওর পরনে এখন একটি দারুণ জ্যাকেট, শুদ্ধর হাতে চমৎকার পুলওভার। পাখি বলল, 'বাবুলালদা গিফ্‌ট দিয়েছে।'

কুহেলি বললেন, 'এটা ঠিক নয়। আপনি এত খরচ করছেন, তার ওপর—।'

'আরে। দেখে ভাল লাগল, ওদের ভাল মানাল। এর মধ্যে আপনি আসছেন

কেন? আমি তো পাখির গডফাদার, দেওয়ার রাইট তো আমার আছে, তাই না? শুদ্ধ, চল ভোজালি কিনে নিয়ে আসি।'বাবুলাল বললেন।

'ভোজালি দিয়ে কি হবে?' কুহেলি তাকালেন।

'স্যুভেনির। দার্জিলিং-এর।'

ওরা বেরিয়ে গেল। পাখি বলল, 'বাবুলালদা অত মোট্‌মুটু কিন্তু খুব মজার মানুষ। আচ্ছা মা, গডফাদার মানে কি?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'ফাদার মানে বাবা, গড মানে ভগবান। বাবা ভগবান আবার কি কথা!' পাখি বিড়বিড় করছিল, 'বাবুলালদা বলল, আমি তোমার গডফাদার, তোমার কোন ভয় নেই।'

'পাখি!'

'কি?'

'যে রাত্রে শেষবার শোভন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি দোতলায় এসেছিলে, সেই রাতের কথা মনে আছে?' কুহেলি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। কেন মনে থাকবে না।'

'শোভন তখন কি চলে গিয়েছিল?'

'না। যে ঘরে শোভন আঙ্কল লেখেন সেখানে বসে ড্রিঙ্ক করছিল।'

শুনে খুব স্বস্তি পেলেন কুহেলি। মেয়ে তাকে একা শুয়ে থাকতে দেখেছে।

'তোমাকে দেখে কি বলেছিল?'

'প্রথমে কিছু বলেনি। চোখ বন্ধ করে বসেছিল।'

'তারপর?'

'আমি ভাবলাম শরীর খারাপ। তাই ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'থামলে কেন?'

'একটু ভুল হয়েছে। উনি একা বসে গান গাইছিলেন। খুব সুন্দর গলা। আমায় দেখে বললেন, ঘুমোওনি কেন? আমি বললাম ঘুম আসছে না। উনি বললেন, আর খাবেন না, নেশা হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থামলে বাড়ি যাবেন।'

'তারপর?'

'উনি বললেন ওর নেশা হয়ে গেছে। আমি ছোট, এইসময় ওখানে আমার থাকা উচিত নয়। তারপর হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।'

চট করে মেয়ের দিকে তাকালেন কুহেলি।

'আমার মনে হল উনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে ব্যবহার করতে চান। উনি নিজেই বলেছেন এই লাইনে কেউ ওপরে ওঠার জন্যে সাহায্য করলে

বিনিময়ে কিছু চায়। তাই আমি ওঁকে বললাম উনি যদি আমাকে ব্যবহার করতে চান তো সেটা করতে পারেন। আমার কথা শুনে উনি কিরকম বোকা হয়ে গেলেন। তারপর দৌড়ে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।' একনাগাড়ে বলে গেল পাখি।

পাথর হয়ে গেলেন কুহেলি। সম্বিৎ ফিরতে মনে হল উঠে গিয়ে মেরে মেয়ের মুখ ভেঙে দেন। এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে শোভন কেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছে না। নেশার ঝোঁকে হয়তো সে পাখিকে চুমু খেয়েছিল কিন্তু পাখি তাঁকে যে ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিল সেই ভূমিকায় কখনও ভাবতে পারেনি।

'ওর কাছে আমার কোন ঋণ নেই আর, তাই না মা?' সরল চোখে তাকাল পাখি।

উত্তর দিতে হল না। দরজায় টোকা পড়ল। শুদ্ধ ঢুকল, পেছনে বাবুলাল। শুদ্ধর হাতে খাপে ভরা ভোজালি, ছোট কিন্তু সুন্দর দেখতে।

শুদ্ধ বলল, 'মা, মা, দ্যাখো, কি সুন্দর। নেপালিরা এটাকে কোমরে ঝুলিয়ে রাখে আত্মরক্ষার জন্যে। বাবুলালদা বলছেন আমি নাকি কলকাতায় গিয়ে কোমরে ঝোলাতে পারব না।'

'উনি ঠিকই বলেছেন।'

বাবুলাল বললেন, 'শিখরা কৃপাণ রাখতে পারেন, নেপালিরা ভোজালি, বাঙালি মাড়োয়াড়িদের কিছু রাখার রাইট নেই। আলমারিতে রেখে দিয়ো। তারপর ম্যাডাম, প্রোগ্রাম কি?'

'কাল তো নেমে যেতে হবে।' কুহেলি বললেন, কথা বলার জন্যে বললেন।

'চলুন, লাঞ্চের পর এখানকার ট্যুরিস্ট স্পটগুলো ঘুরে দেখে আসি।'

'আপনারা ঘুরে আসুন।' কুহেলি ক্লান্ত গলায় বললেন।

'আপনার মাথার ব্যথা কি এখনও রয়ে গেছে?'

'না। টায়ার্ড লাগছে।'

'ঠিক আছে। সন্ধেবেলায় একটা কিছু করা যাবে। চল, আমরা ডাইনিং রুমে গিয়ে খেয়ে নিই। আপনার খাবার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলছি।' বাবুলাল ছেলেমেয়েকে হাতের ইশারায় ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওরা সময় নষ্ট করল না। কোন কোন মানুষকে সারাজীবন কথা গিলতে হয়। সদানন্দ যখন বেঁচে ছিল তখন তো দিনরাত কথা গিলেছেন, বলতে পারেননি একটাও। আজ ছোটমেয়েকেও বলতে পারলেন না। আচমকা কান্না এল। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন কুহেলি।

পাঁচ

ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই পাখিকে নিয়ে তিনজন পরিচালক কাজ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে স্টুডিওর মেকআপম্যানদের কাছে, সহ অভিনেত্রীদের কাছে পাখি শিখেছে কোথায় কোন বিউটি পার্লারে গেলে আরও আকর্ষণীয়া মনে হবে নিজেকে, নিউমার্কেটের কোন দোকানে দারুণ পোশাক বানিয়ে দেয়। একজন মেকআপম্যান বলেছিল, 'দিদি, পহেলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী। স্টাইল। স্টাইল না থাকলে গ্ল্যামার আসবে না।'

যেদিন স্যুটিং থাকে সেদিন সকাল থেকে সন্ধের পর পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে থাকতে হয়। তিনি আছেন তবু পাখির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিল এক তরুণ নায়ক। কিছুক্ষণ পরে সে যখন ঘুরে এল তখন তার ব্যবহার একেবারে বিপরীত। কুহেলির কাছে এসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি এমনি মজা করছিলাম। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আসলে আমি তো জানতাম না—। বাবুলালবাবুকে যেন এসব বলবেন না।'

কুহেলি চুপচাপ ছিলেন। তাঁর একদিন মনে হল, পাখি যে কাজগুলো পাচ্ছে তা বাবুলালের জন্যে। পরিচালকরা প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু কিছু করার নেই।

বাবুলাল প্রত্যেক শনিবার তাঁর বাড়িতে আসে। সবার সঙ্গে হেসে গল্প করে, খায়। তারপর রাত বাড়লে পাখিকে বলেন, 'যাও, খেয়ে শুয়ে পড়। নাহলে চোখের তলায় কালি পড়বে, মুখে ব্রণ উঠবে। পাবলিক তা পছন্দ করবে না। আমি দু-গ্লাস হুইস্কি খেয়ে চলে যাব।'

পাখি চলে গেলে ব্যাগ থেকে ছোট বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে খেতে খেতে গল্প করে। দ্বিতীয় রাতে, দুপেগ খাওয়ার পর বাবুলাল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা ইচ্ছার কথা বলব?'

'বলুন!'

'আপনাকে চুমু খেতে খুব ইচ্ছে করছে—!'

'কিন্তু—!'

'কোন কিন্তু না।' দুহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল বাবুলাল। বাধা দিতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন তিনি। কার জন্যে বাধা দেবেন? আর বাধা দিলে কি পরিণতি হবে সেটা এতদিনে বুঝে গিয়েছেন। এটুকু মেনে নিলে যদি পাখির মাথার ওপর ছাদ থাকে তাহলে থাক।

গত শনিবারে বাবুলাল আসতেই পাখি চলে এল তাঁর ঘরে। বাবুলাল

বললেন, 'একটা খবর আছে ম্যাডাম। স্বপন গুপ্তর নাম শুনেছেন?'

'শুনব না? সত্যজিৎ, ঋত্বিকের পরেই তো ওঁর নাম।'

'ওর নতুন ছবিতে একটা অল্পবয়সী মেয়ে খুঁজছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পাখি চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি করব বাবুলালদা, প্লীজ—।'

'আরে ভাই করতে চাইলেই পারবে কেন?'

'তুমি বললে তো হয়ে যাবে।'

'না। কয়েকজন পরিচালক কারও কথা শোনেন না। সবাই ওঁদের এত সম্মান করে যে প্রোডিউসাররা পর্যন্ত কাস্টিং-এর ব্যাপারে কথা বলে না।'

'তাহলে কি হবে?' নাকে কাঁদল পাখি।

'ওঁর প্রোডাকশন ম্যানেজার হল মিহির মিত্র। ওঁর কথা খুব শোনেন স্বপনবাবুও। ম্যাডাম, আপনি যদি মিহিরকে ধরেন তাহলে কাজ হলেও হতে পারে।' বাবুলাল বললেন।

'আমি যদি স্বপন গুপ্তকে সরাসরি ফোন করি?'

'উনি পাত্তাই দেবেন না। হয়তো বলবেন, ছবি পাঠান। ব্যাস।'

পাখি বলল, 'মা, প্লীজ। মিহির মিত্রকে তুমি রিকোয়েস্ট কর।'

'আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিন।' কুহেলি বললেন।

'না ম্যাডাম। আপনি আমার সোর্সে গেলে মিহির ভাল ব্যবহার করবে কিন্তু স্বপনবাবুকে বলবে না কাজ দিতে।'

'কেন?'

'আমার লোক হয়ে যাবেন আপনি। ও ক্রেডিট নিতে পারবে না। আপনাকে ওর ফোন নাম্বার দিচ্ছি। ফোন করুন।' পকেট থেকে কাগজ বের করে নাম্বারটা পড়লেন বাবুলাল।

'কি বলব?'

'মেয়ের কথা বলবেন।'

অতএব ডায়াল করলেন কুহেলি। রিঙ হচ্ছে। তারপরেই পুরুষ কণ্ঠ হ্যালো বলল।

'নমস্কার। মিহির মিত্র আছেন?'

'বলছি।'

'আমি কুহেলি সেন। আমাকে আপনি চিনবেন না।'

'বলুন, কি করতে পারি।'

'আমি শুনতে পেলাম আপনারা পরের ছবির জন্যে অল্পবয়সী মেয়ে খুঁজছেন? আমার মেয়ের জন্যেই ফোন করছি।'

'আপনি কোথায় শুনলেন এই খবর?

'স্টুডিওতে।'

'ওখানে আসেন নাকি?'

'আমার মেয়ে ছবিতে কাজ করতে শুরু করেছে কবে—।'

'তাই নাকি? কাল বিকেল তিনটের সময় নাইনটি ওয়ানে আমার চেম্বারে মেয়েকে নিয়ে আসবেন। গুডনাইট।'

সংলাপের অর্ধেকটা বাবুলাল শুনেছেন, পাখিও, বাকিটা কুহেলি বললেন।

পাখি বলল, 'এম্মা। কাল তিনটের সময় পার্লারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যে।'

'গোলি মারো পার্লার। খুব ভাল হল, ম্যাডাম, চলে যান।

'মিহির মিত্র যেভাবে কথা বললেন তাতে মনে হল, উনিই পরিচালক।' কুহেলি বললেন, 'বেশ রাশভারী মানুষ। স্বপন গুপ্ত কি রকম হবে কে জানে!'

বাবুলাল হাসলেন, 'লেটস সেলিব্রেট। পাখি, তুমি ওপরে গিয়ে খেয়ে নাও, গো বেড এ্যাজ আর্লি অ্যাস পসিব্‌ল। কালকে মুখটাকে যেন ফ্রেশ দেখায়।'

'তুমি আমাকে শুধু ছোট করে রাখো।'

'আরে একদিন তো বড় হবে। তার জন্যে সঞ্চয় কর। যাও।'

পাখি অনিচ্ছা নিয়ে চলে গেল।

'ম্যাডাম, এরকম ভাল খবর হতে যাচ্ছে, একটা পেগ নেবেন নাকি?'

'খবরটা পাকা হোক আগে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' মদ ঢালতে ঢালতে বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, শোভনবাবুর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়?'

'না। কেন?'

'কি হল আপনাদের। পাখি তো ওর রেকমেন্ডশনে এসেছিল। ছাড়ুন। বিজনবাবু বলছিল উনি নাকি লাস্ট পুজো সংখ্যায় ফাটাফাটি নভেল লিখেছেন। তার ফিল্ম রাইট কিনে নেওয়া দরকার। কিন্তু শুনলাম উনি এবার ডাব্‌ল টাকা চাইছেন। ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে বলব একটু অনুরোধ করুন দাম কমাতে।'

'না। যোগাযোগ নেই।'

দু-পেগ খাওয়ার পর বাবুলাল ডাকলেন, 'আসুন ম্যাডাম।'

ইদানিং উনি সোফায় বসেই ডাকেন, কুহেলিকে পাশে যেতে হয়। উনি চুমু খান তারপর 'গুডনাইট ম্যাডাম' বলে চলে যান।

আজ ওই পর্ব শেষ হলে কথা বললেন কুহেলি, 'আচ্ছা, রোজ এইটে করে আপনি চলে যান, আমার শরীর স্পর্শ করে দ্যাখেন না, অন্য কিছু চান না, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত বলে মনে হয় না আপনার কাছে?'

'না।' মাথা নাড়লেন বাবুলাল, 'আমি আপনার কাছে অনুমতি নিয়ে চুমু

খাচ্ছি। তার বেশি দেওয়ার ইচ্ছে করলে আপনি নিজে থেকে দেবেন। আমি জোর করে নেব না। তাছাড়া—।' থামলেন বাবুলাল।

'বলুন!'

'আমার ওয়াইফ ছাড়া অন্য মেয়ের সঙ্গে চাইলে অনেক সময় শরীর রেসপন্স করে না। ওয়াইফের বেলায় এটা হয় না। আচ্ছা চলি।'

বাবুলাল চলে গেল।

ঠিক তিনটের সময় স্টুডিওতে গিয়ে মিহির মিত্রের খোঁজ করতে ওঁর অফিসে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। মিহির মিত্র ঘরে নেই। এক পাশে বসে অপেক্ষা করতে করতে কুহেলি শুনলেন বোম্বে থেকে নায়িকা আসছে পরের ছবির জন্যে। বড় বাজেটের ছবি। স্বপন গুপ্ত এখন পর্যন্ত যত ছবি তৈরি করেছেন তার নব্বই ভাগই হিট করেছে।

পৌনে চারটের সময় মিহির মিত্র এলেন। কোনদিকে না তাকিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। তারও আধঘণ্টা বাদে ডাক পড়ল।

ঘরে ঢুকে নমস্কার করলেন কুহেলি। মিহির মিত্র মাথা নাড়লেন। তারপর পাখির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।' কুহেলি বললেন।

'কি নাম তোমার?'

'পাখি সেন।'

'কার কার ছবিতে কাজ করছ?'

পাখি বলল। মিহির মিত্র বললেন, 'বিজনবাবুর ছবি ঠিক আছে। বাকিগুলো রিলিজ করবে কিনা সন্দেহ। পড়াশুনা করে?'

'স্কুল শেষ করেছে।' মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হলেন কুহেলি।

'ছবি আছে?'

'আগের ছবির স্টিল ফটোগ্রাফার ওগুলো তুলেছিল।' ব্যাগ থেকে খাম বের করে দিলেন কুহেলি।

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিহির মিত্র, কত বয়স?'

'সতেরো।'

'বয়স কমাচ্ছেন নাকি?'

'না-না।'

'এমনিতে ঠিকই লাগছে।'

'প্লীজ দেখুন না। স্বপন গুপ্তের ছবিতে কাজ করা মানে ভাগ্যের ব্যাপার।'

'ক্যারিয়ার তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু সব কিছু স্বপনদার মর্জির ওপর নির্ভর

করছে। ঠিক আছে। তুমি একটু বাইরে যাও তো খুকি। বাইরে গিয়ে বসো।'

পাখি বেরিয়ে গেল।

মিহির মিত্র বললেন, 'স্বপনদা একটা ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার। যে চরিত্রে যাকে নেবেন তাকে চরিত্রের মতো হতে হবে। এই ছবিতে যাকে আমরা খুঁজছি তাকে গুণ্ডারা রেপ করবে। মেয়েটা ভার্জিন ছিল। আপনার মেয়ে ভার্জিন তো?'

'অবশ্যই।' চমকে গেলেন কুহেলি।

'অবাক হবেন না। ভার্জিন মেয়ে হলে তার রিঅ্যাকশন পর্দায় নর্মাল দেখাবে। আর হ্যাঁ, ছবিটার অনেকখানি হবে আউটডোরে। যেতে আপত্তি নেই?'

'না। আমি সঙ্গে থাকতে পারি নিশ্চয়ই?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি? দাঁড়ান, আগে দেখি স্বপনদা ওকে সিলেক্ট করে কিনা। চলুন।'

মিহির মিত্র ওঁদের নিয়ে স্টুডিওর পেছন দিকের একটি দোতলা বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরের ঘরে গেলেন তিনি।

কুহেলি মেয়েকে বললেন, 'খুব নম্রভাবে কথা বলবে। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ উনি।'

মেয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

মিনিট তিনেক বাদে মিহির মিত্র বেরিয়ে বললেন, 'যাও, স্বপনদা কথা বলবেন।'

পাখি মায়ের দিকে তাকাল। কুহেলি মাথা নাড়লেন, স্বপনবাবু প্রবীণ এবং স্বনামধন্য মানুষ। উনি যদি সুযোগ দেন তাহলে মেয়ের সেটা ভাগ্য বলতে হবে।

মিহির মিত্র এসে বসল পাশে। 'বুঝলেন মিসেস সেন, দিনকে দিন লাইফটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে কি বলব। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের আমার ভাল লেগেছে কেন না আপনি অন্য মায়েদের মতো নন।'

'কি রকম?'

'আরে, বাচ্চা মেয়েগুলোকে মায়েরা নিয়ে আসে, ছবি দেখতে চাইলে এমন ছবি দেয় যে আমারই কান লাল হয়ে ওঠে। এখানকার এক স্টুডিও ওইসব ছবি তুলে দেয়! কেন ওরকম ছবি তুলেছেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আপনারা চান্স দেবেন, মেয়ের চেহারাটা যতটা দেখা যায় ততটা কি দেখবেন না? ভাবুন তো!'

'ছিঃ।' শব্দটা বেরিয়ে এল কুহেলির জিভ থেকে।

'অ্যাই! এটাই হল আসল কথা। আমাদের পাবলিক দুর্নাম করে। কিন্তু এরকম প্রলোভন সামনে থাকলে কজন সাধু হয়ে থাকতে পারে বলুন? এই চরিত্রটাতে একটি মেয়েকে খুব পছন্দ হয়েছিল স্বপনদার। তার মা বলেছে, আপনারা সুযোগ দিন তার বদলে যা নেওয়ার নিন, আপত্তি নেই।' মিহির মিত্র হাসলেন।

‘স্বপনবাবুকে বলেছে?’ অবাক কুহেলি।

‘না না। আমাকে। আমাব রুচি বিকৃতি ঘটেনি যে একটা বাচ্চা মেয়েকে—। তাই স্বপনদাকে বলেছি ওকে কাস্ট কববেন না। তা আমবা না কবলে কি হবে, শুনছি অনেকেই নাকি চান্স দিচ্ছেন।’

‘আপনাব কথা শুনে ভবসা পেলাম।’ হাসলেন কুহেলি।

‘আবে নীতিবোধ তো বিসর্জন দিইনি। ওব মাযেব চেহাবা খুবই খাবাপ। হ্যাঁ, তাকে দেখে যদি আমাব ভাল লাগত তাহলে সমানে সমানে হত। বুঝলেন তো?’

কথা থেকে ঠিক কি বোঝা যায বুঝতে পাবলেন না কুহেলি। কিন্তু ঠিক সেই সমযে বেল বাজল। তডাক কবে ভেতবে চলে গেলেন মিহিব মিত্র। তাবপব এক গাল হাসি নিযে বাইবে বেবিযে এসে ডাকলেন, ‘আসুন মিসেস সেন।’

কুহেলি শিহবিত হলেন। শাডি ঠিক কবে ভেতবে ঢুকতেই একটি প্রশান্ত চেহাবাব প্রৌঢকে দেখলেন নমস্কাব কবতে, ‘আসুন, বসুন। পাখিব মা?’

‘হ্যাঁ।’ বসলেন মেযেব পাশে।

‘খুব বুদ্ধিমতী, আমাব ছবিব চবিত্রেব সঙ্গে ভাল মানাবে। তবে ওযার্কশপ কবতে হবে। তৈবি হওযা দবকাব।’ স্বপন গুপ্ত বললেন।

‘আপনি যা বলবেন।’ কুহেলি স্মিতস্ববে বললেন।

‘একটাই অনুবোধ, বিজন দত্তেব ছবিতে কাজ কবছে, করুক। আমাব ছবি মাস ছযেকেব মধ্যেই বিলিজ কববে। তাব আগে দেখবেন ওকে যেন পর্দায না দেখা যায।’

‘নিশ্চযই।’

‘টাকা পযসা ইত্যাদিব ব্যাপাবটা মিহিবেব কাছে জেনে নেবেন। মিহিব, পবেব দিন ও এলে ওব পোশাকেব মাপ নিযে নিযো। কবে স্যুটিং, কোথায আউটডোব, সব বলে দিযো।’ স্বপন গুপ্ত মাথা নাডলেন। ‘ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।’

ট্যাক্সিতে উঠে কুহেলি ধমক দিলেন, ‘তখন থেকে গম্ভীব হযে আছিস কেন?’

‘এমনি।’

‘কোথায তোব খুশি হওযাব কথা, আনন্দে লাফাবাব কথা আব তুই মুখ কালো কবে আছিস। তোদেব যে কি হয আমি বুঝি না।’

‘কোথায মুখ কালো কবে আছি? হজম কবাব চেষ্টা করছি।’ পাখি বলল।

‘ভাবতে পারিসনি, তাই?’

‘হুঁ।’

‘আমি পেবেছি। এবপবে হযতো সত্যজিৎ বায তোকে ডেকে পাঠাবেন।’

'কেন?'

'স্বপন গুপ্তব ছবি নিশ্চয়ই উনি দেখবেন।'

'ও।'

'তোর কি হয়েছে? আচ্ছা, বল, স্বপনবাবুর ঘরে তুই যখন গেলি তখন কি কথা বললেন উনি? তোর নাম জিজ্ঞাসা করলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাবপর?'

'একটু হাঁটতে বললেন।'

'হাঁটলি?'

'হ্যাঁ। বললেন, হাই হিল পরতে আব হিপ দোলাতে।'

'ও বাব্বা। তারপর?'

'তাবপব কাছে ডাকলেন। আমি যেতে উনি আমার হিপে হাত বোলালেন। বললেন, আর একটু বড় হলে ভাল হত। তারপর নিজেই বললেন, প্যাড ব্যবহার কবলে ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

'হুঁঃ।'

'তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আমার বাস্টলাইন দেখানো যায় কিনা! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। উনি আমাকে জামার প্রথম তিনটে বোতাম খুলতে বললেন। আমি খুললে জামার দুটো প্রান্ত ব্রার স্ট্রাপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, গুড! আমি এইটে চেয়েছিলাম। ওটা বন্ধ কর। করলাম। উনি একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন পড় তো! পড়লাম। খুশি হলেন। তোমাদের ডাকলেন।'

পাখি গড়গড় করে যা হয়েছিল সব বলে গেল।

কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না কুহেলি। স্বপন গুপ্তের মতো নামী মানুষ একটি কিশোরীর বুক নিতম্ব দেখছেন নির্জন ঘরে? এটা লাম্পট্য ছাড়া আর কি হতে পারে। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর।

হঠাৎ পাখি বলল, 'বুঝতে পেরেছি। আমি যে চরিত্রটা করব সে রেপড্ হবে। তার যদি ভাল হিপ এবং বুক না থাকে তাহলে রেপ করবে কেন? উনি সেটা পরীক্ষা করলেন। একবারও খারাপ ভাবে হাত দেননি। দর্জিরা যেমন মাপ নেওয়ার সময় দেয়।'

কুহেলির মনে হল মেয়ে ঠিক বলছে। আর ঠিক বলা মানে ও বড় হয়ে যাচ্ছে। ওর বড় হওয়া মানে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া। বাকি জীবন তীব্র শীতল একাকীত্ব নিয়ে এগিয়ে আসছে, টের পেলেন কুহেলি।

ছয়

ট্যাক্সিটা যখন থিয়েটার রোড পার হচ্ছে তখন বড় মেয়ের কথা মনে এল কুহেলির। খুব রেগে গেছে মেয়ে। গৃহপ্রবেশের দিন দার্জিলিং চলে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে একটার পর একটা ঝামেলায় দিন কেটেছে, ট্যাক্সি ঘোরাতে বললেন।

পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোর দিদির কাছে?'

'কেন?'

'কেন মানে? ও নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে, একবারও যাওয়া হয়নি। তোকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে সময় পাইনি। তোর দিদির কথা মনে পড়ে না?' কুহেলি উষ্ণ হলেন।

'দিদির কোন অ্যাম্বিশন নেই, ঝটপট বিয়ে করে সংসারী হয়ে গিয়েছে, আমার এরকম মানুষকে পছন্দ হয় না।' পাখি মুখ ফেরাল।

নাম্বার খুঁজে খুঁজে বাড়িটির সামনে এসে কুহেলি মুগ্ধ। খুব সুন্দর জায়গা। এইসব অঞ্চলে একসময় ইউরোপীয়ানরা থাকত। চওড়া রাস্তা, সুন্দর ফুটপাত। ঝকঝকে বাড়ি, দোকান। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লিফটে উঠলেন কুহেলি মেয়েকে নিয়ে। লিফটম্যান নাম বলতে ঠিক ফ্লোরে নামিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল। বেল বাজাবার আগে কুহেলি পাখিকে নিচু গলায় বললেন, 'স্বপনবাবু কি করেছেন তা আর কাউকে বলার দরকার নেই।'

'বাঃ। জিজ্ঞাসা না করলে বলব কেন?'

'জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না। উনি ওসব ছবির স্বার্থ ভেবে করেছেন কিন্তু লোকে অন্য মানে করে ওঁর বদনাম ছড়াবে। বুঝেছিস?'

মাথা নেড়েছিল পাখি।

কুহেলি বেলের বোতামে চাপ দিলেন। ভেতরে জলতরঙ্গের আওয়াজ উঠল। পাখি বলল, 'বাঃ কী সুন্দর! এটা দিদির বাড়ি তো?'

দরজা খুলল অমিয়, 'ও, আপনারা, আসুন!'

কুহেলি দেখলেন, অমিয়র পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি, যে পোশাকে তার এতদিন বাড়িতে কেটেছে তা ত্যাগ করেনি। ঘরে ঢুকলেন ওঁরা।

সাজানো বসার ঘর। সুন্দর সোফা, পায়ের তলায় কার্পেট। ওপাশে রেডিও সেট। দেওয়ালে সুন্দর ছবি টাঙানো। টেবিলের অ্যাশট্রেটাও চমৎকার।

'সুজাতা কোথায়? ভেতরে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। একটু বেরিয়েছে!'

'কখন আসবে?'

'তা তো আমাকে বলে যায়নি।' অমিয় শান্ত গলায় বলল।

'তুমি এখন বাড়িতে? অফিসে যাওনি যে!'

'গিয়েছিলাম, একজন সহকর্মী মারা গিয়েছে বলে হাফ ছুটি হয়েছে।'

'দেখি তোমাদের ফ্ল্যাটটা—।' পা বাড়ালেন কুহেলি।

তিনটি বেডরুম। মেয়েরটিতে ঢুকেই বুঝলেন এটি আলাদা। ডাবলবেড বিছানা, বেডল্যাম্প, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, বাথরুমে গীজার, সুন্দর আলমারি। অন্য ঘবগুলোও ভাল তবে প্রথমটির মতো সাজানো নয়। তৃতীয়টিতে একটু অযত্নের ছাপ।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ঘরে কেউ থাকে?'

'হ্যাঁ। আমি।' অমিয় জবাব দিল।

কুহেলি যে বেশ অবাক হয়েছেন তা তাঁর মুখে ফুটে উঠলেও কোন কথা বললেন না। পাখি বলল, 'কি সুন্দর ফ্ল্যাট। দিদি খুব ভাল আছে।'

একটি কাজের মেয়ে ওঁদের দেখছিল। অমিয় তাকে বলল, 'শ্যামা, কফি কবে দাও তো। তাড়াতাড়ি। চলুন, বসবেন।'

পাখি বলল, 'আমি কফি খাবো না।'

অমিয়র মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, 'ফিল্ম আর্টিস্টরা কফি খায় না বুঝি!'

'না না। আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে এক গ্লাস হরলিক্স খাও।'

মনঃপূত না হলেও পাখি আপত্তি করল না।

বাইরের ঘরের সোফায় বসার পর কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে এখানে?'

'ভালই। আমার অফিসও কাছে হয়। তবে এখানকার বাজারে গেলে মাথা গরম হয়ে যায়। সবজি মাছের দাম অন্তত নর্থ ক্যালকাটার দেড়গুণ বেশি।' অমিয়র গলায় বেশ বিরক্তি ছিল। কুহেলি অন্যপ্রসঙ্গে কথা শুরু করতে যেতেই বেল বাজল। অমিয় বলল, 'বোধহয় এসেছে।' সে এগিয়ে গিয়ে কী-হোল্‌ দিয়ে বাইরেটা দেখে দরজা খুলেই ভেতরে চলে গেল একটাও কথা না বলে।

সুজাতা প্রথমে ঢুকল। নীল সিল্কের শাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত চুল ছাঁটা। কুহেলির হঠাৎ মনে হল মেয়ের সব কিছু বদলে গেছে। হাতের শপার্স ব্যাগ নিচে নামিয়ে সুজাতা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! তোমরা?'

মিস্টার পাকড়াশি ঘরে ঢুকলেন, 'শেষ পর্যন্ত সময় পেলেন?'

কুহেলি বললেন, 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এত ব্যস্ততার মধ্যে আমি যে রোজই ভাবি আসব, আসা হচ্ছিল না। তুইও তো ফোন করিস না!'

'কেন করব? আমি তো তোমার কেউ নই। তোমার নয়নের মণি এখন ছোট মেয়ে!'

'তা কেন? আমার তো দুটো চোখ। তোরা দুজন!'

'তাই? আমাকে নিয়ে কখনও কোথাও বেড়াতে গিয়েছ? ছোট মেয়েকে নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে এলে। তার বেলা?' সুজাতা ঝগড়া করার জন্যে তৈরি।

'না সুজাতা, তোমার দার্জিলিং-এর ব্যাপারে আক্ষেপ করা ঠিক নয়।' মিস্টার পাকড়াশি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনারা দার্জিলিং-এ যাচ্ছেন শুনে ও এমন ক্ষেপে গেল যে কদিন বাদে ওকে দার্জিলিং ঘুরিয়ে আনতে হল।'

'তাই নাকি? তোমরা দার্জিলিং-এ গিয়েছিলে?'

'তিনদিনের জন্যে। মাউন্ট এভারেস্টে ছিলাম।' মিস্টার পাকড়াশি বলল।

'ওমা, একদিন ম্যালে শোভনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

মিস্টার পাকড়াশি বললেন, 'টুরিস্টদের কল্যাণে ম্যাল মিনি কলকাতা হয়ে যায়। এত ভিড়, ওখানে আর যাওয়া যাবে না।' মিস্টার পাকড়াশি সুন্দর বেডরুমে চলে গেলেন। পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি দেখেছিস দিদি?'

'অ্যাঁ? শোভনবাবুকে? হ্যাঁ। কথাও হয়েছিল।'

'মা, তাহলে ম্যানেজার যে বলেছিল পেছন থেকে দেখেছে, কথাটা ঠিক।'

কুহেলি চুপ করে ছিলেন। শোভন-প্রসঙ্গ পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর।

সুজাতা বলল, 'আমাকে দেখে চিনবেন না ভেবেছিলাম কিন্তু ঠিক চিনতে পারলেন। একেবারে উত্তমকুমারের মতো হেসে বললেন, ভাল? আমি বললাম, তোমরাও দার্জিলিং-এ এসেছিলে। শুনে হাসলেন। বললেন, লেখার জন্যে এসেছেন বেশ কিছুদিন আগে। আমরা কথা বলছি যখন তখন একজন মেমসাহেবের মতো দেখতে মহিলা, সাদা প্যান্ট, সাদা জ্যাকেট, চোখে গগলস এসে দাঁড়াতেই তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন। আমাদের বাড়িতে পাঞ্জাবি ধুতি পরে এসেছিলেন, ওখানে কমপ্লিট স্যুট পরেছিলেন। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে।' একটানা বলে গেল সুজাতা।

পাখি বলল, 'মেমসাহেব? মেমসাহেবেরা বাংলা পড়ে নাকি?'

'জানি না। টকটকে ফর্সা, লম্বা, ফিগার খুব ভাল। মুখের গড়ন ইতালিয়ানদের মতো। ও বলল, দেখেই বোঝা যায় খুব অভিজাত মহিলা।'

'অমিয়দা বলল?' পাখির প্রশ্ন।

'না। পাকড়াশি। অমিয় ছুটি পায়নি বলে যায়নি।'

কুহেলি মেয়ের দিকে তাকালেন। কি স্বচ্ছন্দে ও অমিয় এবং পাকড়াশির

নাম ধরে কথা বলছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোন এক সুন্দরী মেমসাহেবের সঙ্গে শোভন সময় কাটিয়েছে শোনার পরও তাঁর মনে এখন আর কোন ঈর্ষা জাগছে না!

সুজাতা চাইছিল ওঁরা রাত্রের খাওয়া ওর বাড়িতে খেয়ে তবে ফেরে। কিন্তু রাজি হলেন না কুহেলি। শুদ্ধ বাড়িতে একা আছে। লক্ষ করলেন যতক্ষণ ওঁরা ছিলেন ততক্ষণ পাকড়াশি প্রবল প্রতাপে কথা বলে গেছেন, অমিয় একবারও সামনে আসেনি। ফিরে আসার আগে কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কবে আসছিস?'

'যাব। সামনের রবিবারে যেতে পারি।' সুজাতা বলল।

'সুজাতা।' পাকড়াশি বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি না ভেবে হুট করে কথা বলবে না। আগে যা করেছ সেটা অতীত! তোমার অভ্যেস পালটাও।'

সুজাতার গলার স্বর বদলে গেল, 'আমি, আমি ঠিক—।'

'সামনের রবিবারে আমার রোটারির মিটিং আছে।'

'ও। আমি জানতাম না।'

'জেনে তবে কাউকে প্রমিস করবে।'

কুহেলি অবাক হলেন, 'তুই রোটারি করিস নাকি?'

সুজাতা মাথা নাড়ল, 'না। ও করে।'

ট্যাক্সিতে উঠে পাখি প্রথম যে কথা বলল তার উত্তর কুহেলিরও জানা নেই। পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, দিদির স্বামী কে?'

কুহেলি চুপ করে রইলেন।

পাখি বলল, 'অমিয়দাকে কিরকম চাকরবাকরের মতো থাকতে হচ্ছে। আর পাকড়াশি যা বলছে তাই দিদি মেনে নিচ্ছে।'

'তাই তো দেখলাম।' কুহেলি বললেন। পাকড়াশি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সঙ্গে না থাকলে সুজাতা কোথাও যাবে না। তাঁর রোটারির মিটিং আছে বলে সুজাতাকে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। একা মায়ের কাছেও যাওয়া চলবে না।

তা হোক। মেয়ের ফ্ল্যাট যা দেখে এলেন, চাইলেই যে দার্জিলিং-এ বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে তাকে তো কিছু কিছু অধিকার দিতেই হবে। কিন্তু পাকড়াশি নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটে রাত্রিবাস করেন না। তাঁর পরিবার আছে। কথা হল, রাত্রে একা পেয়ে অমিয় তার স্ত্রীর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করছে?

চারদিন পরে খুব সকালে ফোন বাজল। ঘুমচোখে রিসিভার তুললেন কুহেলি। এত ভোরে ফোন এলে ভাল খবর আসে না। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, 'হ্যালো।'

'মা, আমি।'

'ও। কি ব্যাপার? কি হয়েছে? খারাপ কিছু?' কুহেলি উদ্বিগ্ন।

'মা, তোমাকে বলতে পারিনি, বলার সুযোগ পাইনি। আমি কনসিভ করেছি।' মেয়ের গলায় একটুও খুশি নেই।

কুহেলি বুঝলেন, তবু না বোঝার ভান করলেন, 'এ তো ভাল কথা। আনন্দের কথা, কথাটা অমিয়কে বলেছিস?'

'বলেছি।'

'কি বলছে সে?'

'খুব খুশি হয়েছে।'

কুহেলির মনে হল তার বুকের ওপর থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে গেল।

সাত

কয়েকদিন বাদে মিস্টার পাকড়াশি টেলিফোনে জানালেন তিনি আর দেরি করতে পারছেন না। সদানন্দের জমির ব্যাপারটা এখনই ফয়সালা করা দরকার। একটাই সমস্যা, সদানন্দ জমির ব্যাপারে বা অন্য সম্পত্তির ক্ষেত্রেও যেহেতু কোন উইল করে যাননি তাই তাঁর রেখে যাওয়া সবকিছুই স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা সমানভাবে পাবে। কুহেলি যদি তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে নো অবজেকশন লেটার সংগ্রহ করে নেন তাহলে বাকি আইনের কাজটা মিস্টার পাকড়াশির উকিল করে দেবেন। কি মর্মে ওর নো অবজেকশন লেটার লিখতে হবে তাও তাঁর উকিল লিখে অনেকগুলো কপি পাঠিয়ে দেবেন। কুহেলিকে শুধু সাক্ষী রেখে ছেলে মেয়েদের দিয়ে আলাদা আলাদা চিঠিতে সই করিয়ে নিতে হবে। কুহেলি বললেন তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন।

কিন্তু কুহেলি ভাল করেই জানেন যে তাঁর বড় ছেলে কিছুতেই সই করবে না। কারণ সে বলেই দিয়েছে এই বাড়ির কোন ব্যাপারে সে থাকতে চায় না। সেজ এবং মেজ কোন প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ছাড়া সই করতে চাইবে বলে মনে হয় না।

এদিকে স্বপন গুপ্তর ছবির স্যুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথমেই আউটডোর স্যুটিং। যেতে হবে ঘাটশিলায়। থাকতে হবে দিন পনেরো। পাখিকে শুদ্ধর ভরসায় তিনি প্রথমবার পাঠাতে চান না। তবু তড়িঘড়ি ছেলেদের ফোন করে বললেন জরুরি প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

রবিবার বিকেল তিনটের সময় মেজ এবং সেজ এল। পাখি এবং শুদ্ধ বাড়িতেই ছিল। সুজাতা তো সই করেই দেবে। বড় ছেলে মেজভাইকে জানিয়েছে তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। তবে সমস্যা যদি গুরুতর হয় তাহলে মেজভাই পরে তাকে জানাতে পারে। কুহেলি চারজনের সামনে বসে বললেন, 'তোমার বাবার কোথায় কী সম্পত্তি আছে তা আমি জানি না। বেঁচে থাকতে আমাকে ওসব বলার প্রয়োজন উনি মনে করতেন না। ব্যবসার ব্যাপারে যে চুক্তি করেছে তাতে আমার আর কিছুদিন চলবে। ব্যাঙ্কেও বেশি টাকা নেই। থাকার মধ্যে আছে এই বাড়িটা।'

মেজ ছেলে বলল, 'এই এতবড় বাড়ির দাম তো কম নয়।'

'জানি না কি দাম পাওয়া যাবে। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এই প্রশ্ন উঠছে না। এখন হঠাৎই তোমাদের বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক, মিস্টার

পাকড়াশি, আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আর তোমার বাবা বালিগঞ্জ লেকে পাশে গোবিন্দপুরে কিছু জমি নাকি জলের দরে কিনেছিলেন।' কুহেলি বললেন।

'কত জমি?' সেজ ছেলে প্রশ্ন করল।

'দশ কাঠা।'

'উরে ব্বাবা। তার দাম তো ওখানে এখন অনেক।'

'হ্যাঁ। মিস্টার পাকড়াশি প্রমোটিং ব্যবসা করেন। ওঁকে ওই জমি দিলে তি নিজের জমির সঙ্গে মিলিয়ে হাউসিং কমপ্লেক্স করবেন। তার বদলে আমাদের কি টাকা আর কয়েকটা ফ্ল্যাট দেবেন।' কুহেলি বলল।

মেজছেলে বলল, 'ওখানে ফ্ল্যাট নিয়ে আমি কি করব?'

সেজছেলে বলল, 'বিক্রি করে দিবি। ভাল দাম পাবি।'

কুহেলি বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু তোমাদের বাবা কোন উইল ক যাননি তাই আমরা কোন কাগজপত্রে সই করতে পারছি না। তোমরা য তোমাদের হয়ে আমাকে যোগাযোগ করার দায়িত্ব লিখিতভাবে দাও তাহলেই সে সম্ভব হবে।'

ছোট দুজন কিছু বলল না। তাদের এখনও বলার বয়স হয়নি। বড় দুজ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকল। তারপর মেজজন বলল, 'দাদার ভাগটা বি হবে?'

'মানে?' কুহেলি বুঝতে পারলেন না।

'দাদা তো এবাড়ির কিছুই নেবে না। ওর ভাগটা?'

সেজ জবাব দিল, 'সেক্ষেত্রে ছয় দিয়ে ভাগ না করে পাঁচ দিয়ে করলেই হবে

মেজ বলল, 'ভুল করছিস। আমরা ছয়জন আর মা। সাতভাগ। ঠিক আ ছয় দিয়ে ভাগ করতে হবে। অবশ্য পাখি আর শুদ্ধ তোমার কাছে থাকে ব তুমি তিনভাগ পেয়ে যাবে। যে টাকা ভদ্রলোক দেবেন সেটা নিশ্চয়ই ব্ল্যাক এব হোয়াইট মিলিয়ে?'

'আমি ও-ব্যাপারে কথা বলিনি।' কুহেলি বললেন।

'কথা বল। আশা করি তুমি আমাদের কাছে মিথ্যে বলবে না।'

কুহেলি প্রচণ্ড রেগে চিৎকার করলেন, 'মেজো?'

'চেঁচিয়ো না। তুমি তো আর সেকেলে বিধবা নও, মাছ মাংস খাচ্ছ, রঙি শাড়ি পরছ। অর্থাৎ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছ। এ যুগের নিয়ম হল নিজে ম্যানেজ কর আর অন্যকে বঞ্চিত কর। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্ল্যান করে তুমি টাকার অঙ্ক যেটা ব্ল্যাকে দেবে তার পরিমাণ কমিয়ে বলতেই পার। আমি বলছি পার, কিন্তু করবে না বলে মনে করি। ঠিক কটা ফ্ল্যাট দেবে, টাকাটা কত জেনে নাও। ফোন কর না।' মেজ ছেলে বলল।

সেজছেলে বলল, 'আচ্ছা এই পাকড়াশি লোকটাই তো দিদিকে থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট দিয়েছে, তাই না?'

কুহেলি কিছু বলার আগেই পাখি বলল, 'হ্যাঁ।'

'বাঃ। তাহলে তো লোকটা দূরের মানুষ নয়। ফোন কর।' সেজছেলে বলল।

কুহেলি বুঝলেন এরা সব খবর রাখে।

অগত্যা ফোন করলেন সুজাতার ফ্ল্যাটে। অমিয় ফোন ধরল। গলা শুনে বলল, 'সুজাতা তো এখন কলকাতায় নেই।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'বেনারসে। মিস্টার পাকড়াশি নিয়ে গিয়েছেন।'

'ও। ঠিক আছে, পরে ফোন করব।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কুহেলি। হঠাৎ অমিয়র ওপর তাঁর রাগ হল। লোকটা ওর বউকে দেখাশোনা করছে বলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যাবে আর ও মুখ বুজে থাকবে?

'কি হল? নেই?' মেজছেলে প্রশ্ন করল।

'না নেই। কলকাতার বাইরে গেছে।'

'ঠিক আছে, ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করে রেখো। আমরা না হয় সামনের রবিবারে আসব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন উনি।' মেজছেলে উঠে দাঁড়াল।

'না। সামনের রবিবারে হবে না। আমাদের ঘাটশিলায় যেতে হবে।'

'ঘাটশিলা? ওখানে আমার শ্বশুরের বাড়ি আছে। কোথায় থাকবে?'

পাখি বলল, 'আমি স্বপন গুপ্তের পরের ছবিতে অভিনয় করছি। স্যুটিং হবে ঘাটশিলায়। ওরাই থাকার ব্যবস্থা করবে।'

'ও, হ্যাঁ, তুই তো শেষ পর্যন্ত সিনেমায় নেমেছিস। তার ওপর স্বপন গুপ্তের ছবি। মা, তোমার আর টাকার অভাব থাকবে না। লাখ লাখ টাকা রোজগার করবে পাখি। দাদা তো কথাটা শুনে ক্ষেপে গেছে আরও। চলি।' মেজভাই চলে গেল।

সেজভাই বলল, 'ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বার পেলে আমিই কথা বলতে পারি।'

'তার দরকার হবে না।' কুহেলি গম্ভীর গলায় বললেন।

'মা, ব্যাপারটা যদি একটু তাড়াতাড়ি কর তাহলে উপকার হয়।'

'কেন?'

'খুব টানাটানি যাচ্ছে। তোমরা তো বাবার টাকায় খাচ্ছ, বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে না। ঠিক বুঝবে না।' সেজছেলে চলে গেল।

হাওড়া থেকে ঘাটশিলা এমন কিছু দূরে নয়। গোটা ইউনিটের সঙ্গে ওঁরা পৌঁছে গেলেন সকাল শেষ হওয়ার আগেই। ঘাটশিলার কাছেই মাইনসের গেস্ট বাংলোতে বিখ্যাত শিল্পীদের রাখা হয়েছে। অন্যান্যদের জন্যে বাড়িভাড়া নেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মত বদলে মিহির মিত্র বললেন, 'আপনারা মাইনসের ডিরেক্টার্স বাংলোতে চলে যান। ওখানেই স্বপনদা আছেন।'

ডিরেক্টার্স বাংলো থেকে গেস্ট বাংলো বেশি দূরে নয়। দোতলায় স্বপন গুপ্ত থাকবেন। নিচের একটা ঘরে ওরা তিনজন। পাশের ঘরে মিহির মিত্র। তাঁর অনেক কাজ, হিসেবনিকেশ রাখতে হবে, তাছাড়া স্বপন গুপ্তকে দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর ওপর।

ঘরটি বড়। ডাবল বেড। একটিতে কুহেলি আর পাখি, অন্যটিতে শুদ্ধ। স্যুটিং শুরু হবে কাল ভোর থেকে। দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মিহির মিত্র এলেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। খুব ভাল ঘর। খাবারও ভাল।' পাখি বলল।

'তা আজ তো কাজ নেই। ঘরে বসে তোমরা কি করছ? যাও যাও, গেস্ট বাংলোতে গিয়ে আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপ করে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ খাড়া, 'চল্ না দিদি।'

পাখি মায়ের দিকে তাকাল। কুহেলি সস্নেহে মাথা নাড়লেন।

'ওঁরা কিছু মনে করবে না তো?' পাখি জিজ্ঞাসা করল।

'আরে! কেন করবে? তুমিও তো আর্টিস্ট। দাঁড়াও, তোমাদের সঙ্গে আমি নবনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে-ই ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। নবনী আমার সহকারী। এসো তোমরা।' বেরিয়ে গেলেন মিহির মিত্র।

ঝটপট একটু সেজে নিল পাখি, 'মা, তুমি যাবে না?'

'নাঃ। আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ব।'

শুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবার সময় পাখি লক্ষ করল বেশ টেরি বাগিয়েছে ও। একটা লোক দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। বলল, 'আমি নবনীদা, গেস্ট বাংলোয় যাবে তো?'

পাখি মাথা নাড়ল। নবনী বলল, 'চল।'

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে নবকল্লোলটা টেনে নিয়ে সবে সিনেমার পাতায় চোখ রেখেছেন কুহেলি তখনই দরজায় মিহির মিত্র দেখা দিলেন, 'একি! দরজা না বন্ধ করে শুয়েছেন? ঘুমিয়ে পড়লে যে কেউ ঢুকে পড়ত?'

'হ্যাঁ। ভুল হয়ে গিয়েছে।' ওঠার চেষ্টা করলেন কুহেলি।

'আরে! না না। উঠতে হবে না। আমি এখনই চলে যাব। একটা আউটডোর

ম্যানেজ করা মানে দশটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া। শুয়ে থাকুন।' কথা বলতে বলতে চেয়ার টেনে বিছানার কাছে নিয়ে এসে কুহেলির মাথার পাশে বসলেন মিহির মিত্র, 'আপনি আমার যে অবস্থা করেছেন যে কী বলব!'

'আমি কি করলাম?' লোকটিকে বেশ ঘরোয়া মনে হল কুহেলির।

'ওই যে, যে মেয়েটিকে বাদ দিয়ে পাখিকে নিলাম, তার মা এসে কাল কী কান্নাকাটি না করে গেল। কি বলব আপনাকে, মুখের ওপর বলে দিল, আপনি সুযোগ দিলে যা চাইতেন ও তাই করত।' মিহির মিত্র হঠাৎ গলা নামালেন, 'চলে তো?'

'কি?'

'যা বলবেন। হুইস্কি, রাম, ভোদকা। তবে রাত এগারোটার আগে নয়। সবাইকে খাইয়ে শুতে পাঠাবার পর আমার বিশ্রাম। আপনার মুখে দুর্গন্ধ নেই তো?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেলেন কুহেলি।

'পায়রিয়া থাকলে মুখে এমন দুর্গন্ধ বের হয়, গা গুলিয়ে ওঠে। দেখি, একটু মুখটা এগিয়ে আনুন তো?' মিহির মিত্র বললেন।

'কেন?'

'মুখে দুর্গন্ধ আছে কিনা দেখব!'

'পাগল। আমি রোজ তিনবার ব্রাশ করি।'

'তাহলে ঠিক আছে, এ থেকেই ঘরানা বোঝা যায়।' উঠে দাঁড়ালেন মিহির। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে থামলেন, 'মনে পড়েছে। স্বপনদা বলেছেন আজ সন্ধেবেলায় পাখিকে রিহার্সাল করাবেন। সাতটা নাগাদ ওপরে পাঠিয়ে দেবেন। আটটার মধ্যেই রিহার্সাল হয়ে যাবে। তারপর ডিনার খেয়ে ঘুমোতে বলবেন। তাড়াতাড়ি না ঘুমোলে ভোর চারটের মধ্যে উঠতে পারবে না। পাঁচটায় স্পটে যেতে হবে। রাত্রে দেখা হবে, চলি।' ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলেন মিহির মিত্র।

মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা ছিল। দুই ছেলে সমস্যা তৈরি করেছে এই কথা তিনি কি করে পাকড়াশিকে বলবেন? বললে তিনি সুজাতার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবেন? ওদের শান্ত করার একটা উপায় এখানে এসে ভেবে ঠিক করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু আজ মিহির মিত্র যেসব কথা বলে গেলেন তাতে আর এক ধরনের দুশ্চিন্তা বাড়ল। আচ্ছা, তিনি যদি আজ ওর সঙ্গে আড্ডা না মারেন তাহলে ও কি করতে পারে? স্বপন গুপ্তকে দিয়ে বলাতে পারবে পাখিকে দিয়ে চলবে না। রাতারাতি সেই মেয়েটি যার মা ওকে প্রস্তাব দিয়েছে, তাকে এখানে আনিয়ে নেবেন? স্বপন গুপ্ত যদি কাউকে হবে না বলে বাতিল করেন তাহলে

তার পক্ষে ক্যারিয়ার তৈরি করা কি সম্ভব? অবশ্য তার আগে পাখিকে নিয়ে তিনি যাবেন রিহার্সালে। তখন যদি মিহির মিত্রের প্রস্তাবটা স্বপন গুপ্তকে তিনি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক আর রূঢ় হতে পারবেন না। না। হতে পারে না। স্বপন গুপ্ত প্রতি পদে মিহির মিত্রের ওপর নির্ভর করে থাকেন। ওঁকে চটাতে চাইবেন না। বরং ভালভাবে রিহার্সাল করে পাখি যদি ভদ্রলোককে খুশি করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই উনি ওকে বাতিল করবেন না। অবশ্য তিনি যদি একটা ছোট্ট হুইস্কি নিয়ে মিহির মিত্রের সঙ্গে আধ ঘণ্টা গল্প করে আসেন তাতে যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে সেটা না হয় করা যেতে পারে। কাল ভোর পাঁচটায় যখন স্যুটিং তখন নিশ্চয়ই মিহির মিত্র বেশি রাত জেগে থাকবেন না। এইসব ভাবার পরে মন খানিকটা শান্ত হল কুহেলির।

বিকেল নাগাদ ফিরে এসে পাখি তো বিগলিত। কোন্ অভিনেতা তাকে কী বলেছে, কোন্ অভিনেত্রী তাকে চকোলেট দিয়েছে তার গল্প বলে যেতে লাগল। একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম করে বলল, 'জানো মা, ওঁর ছবি যখন পত্রিকায় ছাপা হয় তখন কি সুন্দরী বলে মনে হয়, এখন উইদাউট মেকআপে তুমি দুমিনিট তাকিয়ে থাকতে পারবে না।'

কুহেলি বললেন, 'অনেক হয়েছে। এখন একটু ফ্রেশ হয়ে নাও। কাল ভোর পাঁচটায় স্যুটিং। যে জন্যে এসেছ সেই কাজটা আগে ভালভাবে করতে হবে। তোমাকে তার জন্যে স্বপনবাবুর কাছে রিহার্সালে যেতে হবে।'

'তাই? জানো মা, সবাই স্বপনবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে। উনি নাকি খুব পণ্ডিত মানুষ। ফিল্মে এরকম মানুষ খুব কম আছেন।'

'যাও, টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে এসো। একটু ঘুরলেই তো ভূত হয়ে যাও।' কুহেলি বললেন।

খুব মিষ্টি সাজলো পাখি। একটুও বাড়াবাড়ি নেই। আজ চকোলেট রঙের ফ্রকটা পরল ও। মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'সুন্দর।' কুহেলি মেয়ের দিকে তাকিয়ে সত্যি কথা বললেন।

সন্ধের পর নবনী এল দরজায়, 'রেডি? মিহিরদা পাঠাল। স্বপনদার কাছে যেতে হবে।'

পাখি মাথা নাড়ল, 'রেডি।'

নবনীদা বলল, 'আপনাকেও যেতে হবে ম্যাডাম। স্বপনদা আপনার সঙ্গে কথা বললেন।'

'সেকি! আমি কেন?' অবাক হলেন কুহেলি।

'তা জানি না।'

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল কুহেলি। শাড়ি পালটে নিলেন। তারপর দরজায় তালা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে নবনীকে অনুসরণ করলেন। দোতলায় উঠে নবনী ওপ্রান্তের ঘরটাকে দেখাল, 'যান, ওখানে স্বপনদা আছেন।'

কুহেলি দেখলেন, দোতলায় দুখানা ঘর, দুই প্রান্তে। মাঝখানে কোন ঘর নেই। আসলে বাড়িটা একতলা, ছাদের ওপর ঘর। বাইরে থেকে দোতলা বলে মনে হয়। নবনী নেমে গেলে কুহেলি মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। একটা ভারী পর্দার পাশ দিয়ে আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

পর্দা সরিয়ে কুহেলি দেখলেন প্রধান পরিচালক চেয়ারে বসে মগ্ন হয়ে কিছু পড়ছেন। কুহেলি বললেন, 'আসতে পারি?'

ধীরে ধীরে মুখ ফেরালেন স্বপন গুপ্ত, 'কে?'

'আমি পাখির মা। আপনি বোধহয় ডেকেছিলেন।'

'ওহো! আসুন আসুন। বসুন।' তারপর পাখিকে দেখে বললেন, 'তুমি একটু ছাদে পায়চারি করে এসো, তোমার মায়ের সঙ্গে দুমিনিট কথা বলে নিই।'

পাখি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল।

কুহেলি সেনের দিকে ভাল করে তাকালেন স্বপনবাবু, 'আপনি নিশ্চয়ই মেয়ের কাছে শুনেছেন ওকে কাস্ট করার আগে আমাকে ওর শরীর স্পর্শ করে বুঝতে হয়েছিল অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা! যে কিশোরীকে দেখে ভিলেন মুগ্ধ হয়ে রেপ করবে তার স্বাস্থ্য ভাল হওয়া উচিত। যেসব মেয়ে ভাল অভিনয় করে অথচ শরীরে বাড় নেই তারা আর্টিফিসিয়াল উপাদান ব্যবহার করে স্বাস্থ্যবতী হয়। আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন হয়নি। শোনার পর নিশ্চয়ই আপনি আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছেন। তাই তো?'

'হ্যাঁ। তার পরে মনে হয়েছিল কাজের জন্যেই—।'

'ঠিক তাই। কিন্তু আপনাকে ওর মা বলে কিছুতেই মনে হয় না। বড়দিদি বা ছোটমাসি বলে অবলীলায় চালানো যায়। শোভনের কাছে আমি শুনেছি আপনার কথা।'

'শোভন?' কুঁকড়ে গেলেন কুহেলি।

'বিখ্যাত লেখক। ওর গল্প নিয়ে আমি আগে ছবি করেছি, পরেরটাও ওর গল্প। যাক গে, একটাই অনুরোধ। মিহির নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে। আমার ছবির আগে বিজনবাবুর ছবি রিলিজ করতে পারে, কিন্তু আর কারও ছবিতে ও যেন না থাকে।'

'নিশ্চয়ই। আমরা আর কোন ছবি নিচ্ছি না যা আপনার ছবির আগে মুক্তি পাবে। ও সুযোগ পাচ্ছে বলে আমরা কৃতজ্ঞ।' কুহেলি বললেন।

'না না। ওই যে বলে না, পহেলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী। দর্শনে ও

ফুল মার্কস পাবে কিন্তু তারপরেই তো গুণের বিচার হবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি ওকে ঘষে মেজে নিজের হাতে তৈরি করতে পারি। অভিনয় শিখতে হয়। যেমন সাঁতার শেখে লোকে। প্রতিদিন স্যুটিং-এর শেষে কিছুক্ষণ পরের দিনেরটা ওকে দিয়ে রিহার্সাল করিয়ে রাখতে চাই।' স্বপন গুপ্ত তাকালেন।

'বাঃ। এতে তো ওরই উপকার হবে।'

'ব্যাস। আর কিছু নয়। দেখুন, আমি অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কিন্তু রেপড হওয়ার পর জঙ্গলে ওর শরীর বেহুঁশ অবস্থায় যখন পড়ে থাকবে তখন ওর স্কার্টের প্রান্ত হাঁটুর অনেকটা ওপরে উঠে থাকবে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। নইলে দর্শকদের মনে বীভৎস রস সৃষ্টি করা যাবে না। দয়া করে আপত্তি করবেন না।'

'ছবির প্রয়োজনে তো করতেই হবে কাজটা।'

'অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি তো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি স্যুটিং-এর আগের রাত্রে। ওকে ডেকে দিন, স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসি।' স্বপন গুপ্ত ঝুঁকে পড়লেন কাগজপত্রের ওপর।

মেয়েকে ডেকে ভেতরে যেতে বলে নিচে নেমে এলেন কুহেলি। নিচে নামতেই মিহির মিত্রকে দেখলেন তিনি। হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।

'স্বপনদার সঙ্গে কথা হল?' মিহির মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'এখন আমি ফ্রি। ওঃ, কি খাটুনি গেল। পনেরো মিনিট পরে আসুন না আমার ঘরে, একটু আড্ডা দেওয়া যাবে।' মিহির মিত্র বললেন।

'আপনার ঘরে?'

'হ্যাঁ, ওপরে উঠে ডানদিকে আমার ঘর, একদম ওপাশে স্বপনদার ঘর।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'ওই কথা রইল।' হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে গেলেন ভদ্রলোক।

মিহির মিত্রের কথা আরও অস্বস্তি বাড়াল। হুইস্কি খাওয়ার প্রস্তাব, মুখের গন্ধ শোঁকার চেষ্টার মধ্যে উনি যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছেন। এখন আড্ডা দেওয়ার অজুহাতে ঘরে ডাকছেন। কি করবেন তিনি?

নিজের ঘরে এসে খাটে বসলেন কুহেলি।

স্বপন গুপ্তের মুখে শোভন দাশগুপ্তের নাম শুনে চমকে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, স্বপনবাবু শোভনের গল্প নিয়ে আগে ছবি করেছেন। তাঁকে নিয়ে যখন শোভন স্বপনবাবুর সঙ্গে কথা বলেছে তখন বোঝাই যাচ্ছে সে সব খবর রাখে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার অধিকার শোভনকে কে দিয়েছে? এই কাজটা

পাখিকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই শোভনের কোন ভূমিকা নেই। দরজায় শব্দ হল। কুহেলি বললেন, 'কাম ইন।'

সই মুখার্জি হাতজোড় করলেন, 'নমস্কার। বিরক্ত করছি না তো!'

সই মুখার্জি নায়িকা নন, কিন্তু বাংলা ছবিতে পার্শ্বাভিনেত্রী হিসেবে তিনি খুব জনপ্রিয়। সরু স্ট্রাপের ব্লাউজ আর সিল্কের শাড়িতে ভদ্রমহিলা এখন বেশ আকর্ষণীয়া। কুহেলি উঠে দাঁড়ালেন, 'আসুন। বিরক্ত কেন হব? আপনি আমার ঘরে এসেছেন, এ তো ভাবতেই পারি না।'

ঘরে এসে চেয়ারে বসে সই জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে কোথায়?'

'রিহার্সাল দিচ্ছে স্বপনবাবুর কাছে!'

শুনে ঠোঁট মোচড়ালেন সই, 'স্বপনদা বুড়ো হতে চলল তবু—।'

'মানে?'

'মানে কিছু না। আমি যখন প্রথম ছবি করি তখন আমার বয়স সতেরো। এই স্বপনদারই ছবি। তখন আমাকে নিয়ে এক্সক্লুসিভ রিহার্সাল দিয়েছিলেন উনি। একটু বড় হয়ে গেলে আর রিহার্সালের জন্যে ডাকেন না।' হাসলেন সই।

'ওটা রিহার্সাল তো?'

'ওই আর কি? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন, স্বপনদা কখনই কোন মেয়েকে নিয়ে শোন না। লোকে আড়ালে এই নিয়ে নানান কথা বলে।'

কথা ঘোরাতে চাইলেন কুহেলি, 'কাল আপনার স্যুটিং আছে?'

'একটা শট। বিকেল বেলায়। আচ্ছা, যেজন্যে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম, আপনার মেয়ে বিজন দত্তের ছবিতে সুযোগ পেয়েছিল শোভনবাবুর জন্যে?'

চমকে উঠলেন আবার, 'হ্যাঁ।'

'শোভনবাবুর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কিরকম?'

'কেন বলুন তো?'

'তাহলে খুলে বলি। আমার মাসতুতো বোন কলেজে পড়ায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে রিসার্চ করছে। সম্প্রতি শোভনবাবুর সঙ্গে আলাপ করেছে। কারণ ওঁকে বাদ দিয়ে আজকের সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকে। আর আলাপ করে হয়েছে মুশকিল। প্রচণ্ড রকমের প্রেমে পড়ে গেছে সে শোভনবাবুর। বয়সের পার্থক্য মানতে চাইছে না। এই নিয়ে বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছে। যেহেতু শোভনবাবু তাকে বলেছেন এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়েছে কিন্তু কেউ তাঁকে শান্তি দিতে পারেনি তাই তার জেদ, সে ওঁকে শান্তি দেবেই।'

'আপনি চান আপনার বোন ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করুক?'

'হ্যাঁ। কারণটা বুঝতেই পারছেন।'

'কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর ওকে বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

সই খুব খুশি হলেন, 'আপনার কাছ থেকে ও নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে।'

'আমি সাহায্য করব কিন্তু সে নেবে কিনা সেটা তার ওপর নির্ভর করছে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখানে কদিন তো আছি, দেখা হবে।' দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন সই, 'কাউকে দিয়ে মেয়েকে ডেকে পাঠান, বড্ড বেশি রিহার্সাল হয়ে গেলে বেচারার অসুবিধে হবে।' সই বলে গেলেন।

পাখির কথা মাথা থেকে উধাও, প্রচণ্ড আক্রোশ জমেছিল শোভনের বিরুদ্ধে। পুরুষ জাতটাই যে বেইমান তা আর কতবার প্রমাণিত হবে! তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে না করতেই আর একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে শোভন? একটা মেয়ে-শরীর পেলেই হয়ে গেল, কোন বাছ বিচার নেই? শোভন যদি পুরুষ বলে রুচি বিবেক বিসর্জন দিতে পারে তাহলে তিনি কেন ওসব আঁকড়ে ধরে বসে থাকবেন? সদানন্দ স্বামী হিসেবে যা করে গেছে শোভন তো তা থেকে আলাদা কিছু করছে না।

দরজায় শব্দ হল। ঘরে ঢুকল পাখি। মেয়ের দিকে সতর্ক চোখে তাকালেন কুহেলি। মেয়ে বলল, 'ওমা, তুমি ঘরে একা বসে আছ?'

'রিহার্সাল হল?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ।'

'কি কি হল রিহার্সালে?'

'কি আর হবে। কোন্ কোন্ শটে আমাকে কি করতে হবে উনি দেখিয়ে দিলেন। আমাকে সেইমতো রিঅ্যাক্ট করতে বলল', পাখি জবাব দিল।

'তোর গায়ে হাত দিয়েছিল?' না জিজ্ঞাসা করে পারলেন না কুহেলি।

'আঃ। মা। এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তো! স্যুটিং-এর সময় যখন একগাদা লোকের সামনে ভিলেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার ফ্রক ছিঁড়বে, শরীরে হাত দেবে তখন তো ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠতাম, অভিনয় করতে পারতাম যদি রিহার্সাল না দিতাম?'

কুহেলির মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল। এইসময় প্রোডাকশনের ছেলে এল রাতের খাবার নিয়ে। পাখি বলল 'উঃ, আমার খুব খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ব। কাল খুব ভোরে উঠে স্পটে যেতে হবে।'

কুহেলি স্থির করলেন মেয়েকে আর প্রশ্ন করবেন না। তাঁর মনে হল মেয়ে নিজেকে সামলাবার কায়দাগুলো এর মধ্যে শিখে ফেলেছে। তিনি উঠলেন। টয়লেটে গিয়ে হাত ধুয়ে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি খেতে পারব কিনা জানি না।'

পাখি প্রতিবাদ করল, 'তুমি এখন খাচ্ছ যে?'

'তার মানে?'

'আমি যখন ওপর থেকে নামছিলাম তখন মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'তোমার মাকে বলেছিলাম কস্ট্যুম নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আসতে। বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। একটু মনে করিয়ে দিয়ো তো।'

'কস্ট্যুম নিয়ে!' হতভম্ব হয়ে গেলেন কুহেলি।

'মা, সব ছবিতে যে সমস্ত পোশাক অভিনেতা অভিনেত্রীরা পরে তা নির্বাচন করার জন্যে কস্ট্যুম ডিজাইনার থাকে। তার নির্দেশে ড্রেসার ওগুলো নিয়ে আসে। আমি যে ছবিতে কাজ করব তুমি যদি সেই ছবির কস্ট্যুম ডিজাইনার হও তাহলে তোমারও ভাল ইনকাম হবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কাজটা খুব ক্রিয়েটিভ।'

মেয়ে এত জানে জেনে অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি। বললেন, 'ওরা আমাকে এই কাজটা কেন দেবে? আমার তো কোন কোয়ালিফিকেশন নেই!'

'তোমার অভিজ্ঞতা আছে। তুমি বলে দ্যাখো না। এক জায়গায় কাজটা পেয়ে গেলে অন্য জায়গায় পেতে অসুবিধে হবে না। আমি খাচ্ছি, তুমি ঘুরে এসো।'

মেয়ের কথায় কুহেলির মনে হল এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তিনিও যে কিছু করতে পারেন তা প্রমাণ করার দরকার আছে। শুধু মেয়ের এসকর্ট হিসেবে যে তিনি আসছেন না এটা লোকের জানা দরকার। শোভনের মুখ মনে পড়ে গেল। পড়া মাত্র অদ্ভুত জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল।

পাখি বলল, 'খেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ব। তুমি বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যাও।'

'যদি কেউ ডাকতে আসে—!' গলা নেতিয়ে গেল কুহেলির।

'আসুক। বলব, ঘুমাচ্ছি, কাল কথা বলব।'

কুহেলি মেয়ের নির্দেশ মান্য করলেন।

দোতলায় উঠে দেখলেন স্বপন গুপ্তের ঘর বন্ধ, জানলা অন্ধকার। এ পাশে মিহির মিত্রের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে। কুহেলি দরজায় শব্দ করলেন।

'কে?' মিহির মিত্র জানতে চাইলেন।

'আমি।'

'ওহো, আসুন। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

ভেতরে ঢুকলেন কুহেলি। টেবিলে মদের গ্লাস, বোতল জল, প্লেটে কাজুবাদাম। মিহির মিত্র বললেন, 'আমি ভাবলাম, আপনি বোধহয় এলেন না।'

'মেয়ে বলল কি একটা কস্ট্যুমের ব্যাপারে কথা বলবেন—।' কুহেলি

বললেন।

'দূর! মেয়েকে তো একটা কিছু বলে আপনাকে আনাতে হবে!' মিহির মিত্র হাসলেন।

'কিন্তু আমি কস্ট্যুমের কাজটা করতে চাই।'

'অ্যাঁ?' চোখ তুললেন মিহির মিত্র।

'ও ব্যাপারে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'আপনি, আপনি সিরিয়াস?' বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মিহির মিত্র।

'না হলে বলব কেন?'

'দাঁড়ান, একবার স্বপনদার সঙ্গে কথা বলে নিই। এখনও কস্ট্যুম ডিজাইনারদের ইউনিয়ন তৈরি হয়নি। এই ছবিতে যা কিছু কাজ তা স্বপনদা ওঁর এক আত্মীয়কে দিয়ে করাচ্ছেন, ভদ্রমহিলা সময় দিতে পারছেন না।'

'আমি পুরো সময় দেব।'

'গুড। মিসেস সেন, আমি খুব চেষ্টা করব।'

হাসলেন কুহেলি, 'আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আমি হতাশ হব না!'

'কি যে বলেন! আমার কি ক্ষমতা। আসুন, অনেকক্ষণ থেকে আপনার গ্লাস খালি পড়ে আছে।' হুইস্কি ঢাললেন মিহির মিত্র, জল মেশালেন।

'আমি কিন্তু অভ্যস্ত নই।'

'অ। সিগারেট?' মুখ তুললেন মিহির মিত্র।

হুইস্কি ছেড়ে সিগারেটে চলে এলেন ভদ্রলোক যেভাবে তাতে খুশি হলেন কুহেলি। এর আগে কয়েকবার টান দিয়েছেন। এখন আর কাশি হয় না, নেশাও হয়নি। সিগারেট খেলে কেউ আউট হয় না।

বললেন, 'চলবে।'

'বসুন।'

পাশে রাখা ব্যাগ খুলে একটা কৌটো বের করে বললেন, 'এখানে দু-রকমের সিগারেট আছে। এইটে খেলে খুব ঘুম পেয়ে যাবে। টানা ঘুমোবেন। আর এইটে খেলে মন ভাল হয়ে যাবে। শরীরের সব অবসাদ দূর হয়ে যাবে। কোনটা খাবেন?'

'খামোখা একটানা ঘুমাবো কেন?'

'তাহলে এইটে, ধরিয়ে দেব?'

মনে মনে হাসলেন কুহেলি। সিগারেটের এত গুণ কেউ কখনও শুনেছে। এই লোকটি কি তাঁকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে মনে করছে।

'দিন। আমিই ধরবো।' খাটে বসে সিগারেট আর লাইটার নিলেন কুহেলি। একবারেই সিগারেট ধরে গেল। ধোঁয়া টানলেন। অন্যরকম গন্ধ, একটু কটু।

'খেতে তো ভাল নয়। কি সিগারেট?'

'নামে কি এসে যায়? খান না। তিনটে টান দেওয়ার পর দেখবেন ভাল লাগছে। টানুন টানুন।' মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন মিহির মিত্র।

চারবার টানার পর পার্থক্য বুঝতে পারলেন কুহেলি। প্রথমে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তারপরেই সমস্ত শরীর ঝরঝরে। হাসলেন তিনি, 'বাঃ। ভাল লাগছে।'

'গরম লাগছে না?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। বেশ গরম।'

'এখানে এ.সি. নেই। দরকার হলে শাড়িটা খুলে ফেলুন অর্ধেক।'

'তাই খুলি। উঃ, কি গরম।' কুহেলি আর যুঝতে পারছিলেন না। তাঁর শরীরের ভেতরটা আনচান করছিল। এইসময় মিহির মিত্র আদুরে গলায় ডাকল, 'আসুন।'

দুটো হাত তাঁর শরীর হাতড়াচ্ছে। কুহেলি তাদের অস্তিত্বও টের পেলেন না। একটা বড় ঢেউ তাকে গ্রাস করে নিয়ে গেল অন্ধকারে। তিনি নেমে যেতে থাকলেন।

ঘুম ভাঙল যখন তখন ধড়মড়িয়ে উঠলেন কুহেলি। দ্রুত বেশবাস ঠিক করলেন। ঠিক তাঁর পাশে মিহির মিত্র বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। ঘড়ি দেখলেন, এখন রাত তিনটে। ঘরে আলো জ্বলছে। বিশ্রী একটা গন্ধ পাক খাচ্ছে। দ্রুত দরজা খুলে বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা বাতাস তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

কি হয়েছিল তা বুঝতে বাকি নেই। লোকটা সিগারেটের মধ্যে কিছু পুরে তাঁকে খাইয়েছিল যা পাঁচ পেগ হুইস্কির চেয়ে অনেক শক্তিশালী। রাগ, অপমানবোধ, ইত্যাদি তাঁকে উত্তেজিত করতে চাইলেও তিনি সেটা হতে পারছিলেন না। হঠাৎ মনে হল তিনি সজ্ঞানে কিছুই করেননি। আর যদি করতেনও তাহলে কি অন্যায় হত? কারও কাছে তাঁর কোন দায় নেই। শোভন যদি প্রেমিকা বদলাতে পারে তাহলে তিনি কেন পুরুষ পালটাতে পারবেন না? শোভনের মতো তিনি তো প্রেমের ভাণ করে শরীরে পৌঁছাতে চেষ্টা করেননি! এরকম ভাবার পর মন শান্ত হল। নিচে নেমে এলেন।

ঘরের বাইরে থেকে তালা দেওয়া। পাখি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে। নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করলেন। বাইরের আলো জানলার কাচ ভেদ করে কিঞ্চিত বিছানায় পড়েছে। পাখি গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে। বিছানায় শুতে গিয়েও থেমে গেলেন কুহেলি। তারপর আর একটা পোশাক তুলে চলে গেলেন বাথরুমে। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে তার তলায় দাঁড়িয়ে বিবস্ত্র হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়ালেন। সশব্দে জল পড়ছে শরীরে। শেষরাতে তাঁর শরীর ধুয়ে দিচ্ছে

জলরাশি। যদি নোংরা কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেটা এই শরীর। মন কখনও নোংরা হতে দেবেন না তিনি।

পাখি যে এত ভাল কাজ করবে তা কুহেলিও ভাবতে পারেননি। একটুও জড়তা নেই, অভিব্যক্তি, হাঁটাচলা, সংলাপ বলার মধ্যে রীতিমতো পাকা অভিনেত্রীকে পাওয়া যাচ্ছিল। শট শেষ হলে স্বপন গুপ্ত ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চমৎকার। খুব খুশি হয়েছি।' তার পর ইউনিটের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি বল?'

সবাই একসঙ্গে প্রশংসা করতে লাগল। প্রেসের কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা ঘন ঘন ছবি তুলতে লাগলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বপন গুপ্ত বললেন, 'লিখবেন, আগামী কালের অন্যতম নায়িকার আজ জন্ম হল।'

এদিন রেপ সিন ছিল না। পাখির কাজ লাঞ্চ ব্রেকের আগেই শেষ হয়ে গেল। মিহির মিত্র এলেন কুহেলির কাছে, 'সুখবর আছে ম্যাডাম।'

কুহেলি তাকালেন।

'স্বপনদা খুশি হয়ে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারতেন। কিন্তু এখানে ইচ্ছে থাকলেও নতুন কোন কস্ট্যুম পাওয়া যাবে না। তাই নেক্সট লটের স্যুটিং-এর আগে কাজ শুরু করবেন।' মিহির মিত্র বললেন।

'ধন্যবাদ।'

'না না। এ কিছু নয়। যান ফিরে গিয়ে লাঞ্চ সেরে নিন। ও, পাখি, আজ যে ভাল কাজ করলে সেটা গতকাল রিহার্সাল দিয়েছে বলে। আজও সন্ধের একটু পরে স্বপনদার কাছে রিহার্সাল দিতে যেয়ো।' মিহির মিত্র মনে করিয়ে দিল।

পাখি হেসে মাথা নাড়ল। এটা লক্ষ্য করলেন কুহেলি।

তাঁদের জন্যে ঘরেই লাঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মিহির মিত্র। পাখি বলল, 'মিহিরবাবু খুব ভাল লোক। তোমাকে কাজটা পাইয়ে দিলেন। তুমি তো বিশ্বাসই করতে পারনি। এ লাইনে সবাই খারাপ লোক না।' কুহেলি চুপ করে থাকলেন।

আট

কলকাতায় ফিরে আসার পর পাখি যেন চট করে সাবালিকা হয়ে গেল। আউটডোরে থাকার সময় প্রতীক নামের একটি ছেলে, যে স্বপন গুপ্তের দ্বিতীয় সহকারী, পাখির প্রতি একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল। সে এখন স্বচ্ছন্দে বাড়িতে আসে। যাদবপুর থেকে পাশ করেছে। চার বছর ধরে সহকারীর কাজ করেছে। এবার নিজে ফিচার ছবি করতে চায়। একজন প্রযোজক তাকে আশ্বাস দিয়েছে। টিনএজার্স ছেলেমেয়ের প্রেম, নায়িকা পাখি। ছেলেটির বয়স বছর ছাব্বিশেক। দেখতেও সুন্দর। কুহেলি বুঝলেন পাখি ওর প্রতি অনুরক্ত। তাই মেয়েকে ডেকে সরাসরি বললেন, 'তুমি কি চাও অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি কি তা জানো না।'

'তাহলে কারও সঙ্গে জড়িয়ো না। যে কোন পুরুষ চাইবে বিয়ে করতে। বিয়ের পর তোমার অভিনেত্রী জীবন সে মেনে নেবে না।'

'কিন্তু সে যদি নিজে এই লাইনে থাকে?'

'তাহলেও না। প্রথম দিকে সে হয়তো উদার হবে, পরে সংঘাত হবেই। এই দ্যাখো, দিলীপকুমার সায়রা বানুকে বিয়ে করার পর তার অভিনেত্রী জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'আর কিছু বলবে?'

'না। নিজের কবর নিজে খুঁড়ো না।'

মেয়ে চলে গেল। কুহেলি বুঝলেন তাঁর কথা ওর পছন্দ হল না।

এখন পাখি ছবি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোথাও যেতে হলে ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। শুদ্ধকেও সাজিয়ে নিয়ে যায়। প্রতীকের সঙ্গে যখন বের হয় তখন বলে যায়, আড্ডা মারতে যাচ্ছি।

একটি সিনেমা পত্রিকায় খবর ছাপা হল, নবাগতা অভিনেত্রীর সঙ্গে তরুণ চিত্রপরিচালকের প্রেম। খবরটা দেখে মেয়েকে ডেকে দেখালেন। পাখি হাসল, 'মা, তুমি না ব্যাক ডেটেড।'

'মানে?'

'ওসব খবর না ছাপলে পাবলিসিটি হয় না। বাবুলালদাই খবরটা ছাপিয়েছে।' পাখি হেসে বলল।

বাবুলাল যে পাখির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, মাঝে মাঝে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যায় এটা কুহেলি জানতেন। কিন্তু—! এর মধ্যে বাবুলালের প্রযোজনায় বিজন

দত্তের ছবি মুক্তি পেয়েছে। প্রেস শো-এর দিন ইচ্ছে করে যাননি কুহেলি। তাঁর ধারণা ছিল ওখানে শোভন নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হবে। ছোটভাইকে নিয়ে পাখি গিয়েছিল পরীর মতো সেজে। ফিরে এসে মন খারাপ করে বসেছিল। তার পর টেলিফোনে বাবুলালের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। সেই ঝগড়ার ধরন এবং ভাষা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কুহেলি। ঠিক যেন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করছে। ছবিতে পাখিকে যতটুকু দেখানো হয়েছে তার অনেক বেশি স্যুটিং হয়েছিল। বাবুলাল বলতে চেয়েছে, বিজনবাবু পরিচালক, তিনি যেমন বুঝেছেন তেমন এডিটিং-এর সময় রেখেছেন। ছবির প্রশংসা হয়েছে। ভাল চললে তিনি এ ব্যাপারে বিজনবাবুকে কিছু বলতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত পাখি কথা আদায় করিয়ে নিল, প্রতীককে দিয়ে বাবুরাম ছবি তৈরি করাবেন।

মিহির মিত্র কথা রেখেছেন। কুহেলিকে স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেটা পড়ে কোন্ চরিত্র কোন্ পোশাকে পরবে তার লিস্ট তৈরি করে স্বপন গুপ্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কুহেলি। ভদ্রলোক খুব খুশি। কুহেলি লক্ষ করেছিলেন, একবারও ভদ্রলোক তাঁর শরীরের দিকে চোখ তুলে দ্যাখেননি। সই-এর কথাই বোধহয় ঠিক। স্বপন গুপ্ত কিশোরী-তরুণীদের মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

স্যুটিং-এর আগের দিন কুহেলি দেখে নিলেন তাঁর নির্দেশ মেনে ড্রেসার পোশাক এনেছে কিনা। কখন কোন্ দৃশ্যে শিল্পীরা সে-সব পরবেন তার চার্ট তৈরি করে দিয়েই এবার কর্তব্য শেষ। প্রতিদিন স্যুটিং-এ হাজির থাকার কোন দায় নেই। তাঁর নির্বাচন দেখে স্বপন গুপ্তও খুব খুশি। মিহির মিত্র তাঁকে পারিশ্রমিক হিসেবে যা দিলেন তার অঙ্ক যদিও খুব সামান্য তবু কুহেলির মনে হয়েছিল তিনি টাকাটা নিজের যোগ্যতায় উপার্জন করেছেন। স্যুটিং-এর শেষ দিনে সই মুখার্জি তাঁর কাছে এলেন। এই কদিনে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছিল কিন্তু সই নিজে থেকে কথা বলেননি বলে এগিয়ে যাননি কুহেলি। সই মুখার্জি বললেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে?'

'আপনি কবে ফ্রি আছেন?'

'কখন আসবেন?'

'রবিবার সকালে। এই ধরুন দশটায়।'

'বেশ। আমার ঠিকানাটা—।'

'ওটা আমি জেনে নিয়েছি।'

সই চলে গেলেন। কুহেলির মনে পড়ল, আউটডোরে থাকাকালীন সেই যে সই তাঁর ঘরে এসে কথা বলেছিলেন তারপর আর ঘনিষ্ঠতা বাড়াননি। অথচ বলেছিলেন, দেখা হবে। যে মেয়ে রিসার্চ করছে সে শিশু নয়। কেউ যদি

জেনেশুনে আগুনে হাত দেয় সে তো পুড়বেই।

কিন্তু রবিবার সকালে মেয়েটিকে দেখে তিনি আর এই ভাবনা ভাবতে পারলেন না। সুন্দরী বললে কম বলা হয়, অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী ওর সর্বাঙ্গে জড়ানো, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ভারী চুলের গোছা, মুখচোখে মিষ্টি লাবণ্য ঢলঢল করছে। বোঝাই যায় খুব শান্ত, লাজুক।

সই বললেন, 'ও আমার মাসতুতো বোন, তৃষ্ণা। ইনি, তোকে তো বলেছি, পাখির মা। পাখি ছবিতে অভিনয় করছে আমার সঙ্গে।'

তৃষ্ণা নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কুহেলি দ্রুত সরে গেলেন, 'একি! না না। প্রণাম করছ কেন? বসো।'

ওরা বসলে সই বললেন, 'এই পাগলিটাকে একটু বোঝান।'

কুহেলি তাকাতেই তৃষ্ণা মুখ নিচু করল।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বয়স কত?'

'তেইশ।'

'তুমি আমার বড় ছেলের থেকেও ছোট।'

'যাঃ।' প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল তৃষ্ণা।

'মানে?'

'আপনাকে দেখে মনেই হয় না।'

'কি মনে হয়?'

'বড় জোর থার্টি ফাইভ সিক্স।'

'আরও দশ বছর যোগ কর। আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।'

'কিন্তু আপনার চেহারা, স্কিন—!' তৃষ্ণা ভেবে পাচ্ছিল না।

'আমার ছয়টি ছেলেমেয়ে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' খুব জোরে কথাগুলো বলল তৃষ্ণা।

সই বললেন, 'সত্যিকথা। আপনি কিন্তু চমৎকার রেখেছেন ফিগার।'

'আমি চেষ্টা করে কিছুই রাখিনি। যা থাকার এমনি থেকে গিয়েছে। কিন্তু তৃষ্ণা, তুমি এত মিষ্টি মেয়ে, এত সুন্দর, রিসার্চ করছ যখন, তখন পড়াশুনায় নিশ্চয়ই বেশ ভাল, তোমার কোন ছেলে-বন্ধু নেই?' কুহেলি চট করে প্রসঙ্গে আসতে চাইলেন।

'ছেলে-বন্ধু?' তৃষ্ণা আড়চোখে সইকে দেখে নিল।

'হ্যাঁ। তোমার কাছাকাছি বয়সের কেউ?'

'ও। নাঃ।'

'ওমা। কেন? কেউ তোমাকে অ্যাপ্রোচ করেনি?'

'করেছে। অনেকেই করেছে। কিন্তু ওদের কেউ প্রাপ্তমনস্ক নয়। দুমিনিট কথা বলার পর বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরক্তিকর।' তৃষ্ণা গম্ভীর গলায় বলল।

'বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ো?'

'বাঃ। পড়ব না?'

'এখনকার লেখকদের মধ্যে কার লেখা ভাল লাগে?'

সই জবাবটা দিলেন, 'একজনই। শোভন দাশগুপ্ত।'

'হ্যাঁ। লাগে।' তৃষ্ণা জোর দিয়ে বলল, 'ওর মতো কেউ লেখেন না।'

'তাই? ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'হুঁ!'

'কথা বলতে কেমন লাগে?'

'খুব ভাল। ওঁর হাসি দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।' তৃষ্ণা বলল, 'গল্প করতে করতে কখন যে সময় কেটে যায় বুঝতে পারি না।'

'কোথায় দেখা হয় তোমাদের?'

'ফ্লুরিজে। ওখানকার চা খেতে উনি খুব পছন্দ করেন।'

'ওঁর বাড়িতে যাওনি?'

'ওঁর জন্মদিনে যাওয়ার কথা হয়েছে।'

'বাঃ। তৃষ্ণা, তুমি বিয়ে করবে না?'

'এখনই না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই। শোভনদাও তাই বলেছেন।'

'আচ্ছা, শোভন যদি তোমাকে বিয়ে করতে চান তুমি রাজি হবে?'

'এক কথায়। মনে করব এটা আমার ভাগ্য।'

'সেকি! ওঁর কত বয়স জানো?'

'জানার দরকার আছে কি?'

'নিশ্চয়ই। উনি তোমার থেকে অন্তত তিরিশ বছরের বড়।'

'তাতে কি অসুবিধে? উনি এখনও যুবক।'

'হ্যাঁ। চালচলন, হাবভাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার বয়স যখন চল্লিশ হবে তখন উনি সত্তর পেরিয়ে যাবেন। সত্তরে নিশ্চয়ই এরকম থাকবেন না!'

'চল্লিশে কি আমি এরকম থাকব?'

সই কথা বললেন, 'কুহেলিদিকে দেখেও বলছিস?'

'হ্যাঁ। উনি ব্যতিক্রম। আমার মায়ের বয়স যখন চব্বিশ ছিল তখন বাবার বয়স পঞ্চাশ। আমি মায়ের সঙ্গে শুতাম। বাবা মায়ের মধ্যে কথা হত শুধু সাংসারিক ব্যাপারে। প্রয়োজনে। বাবা কিরকম বৃদ্ধ বৃদ্ধ ভাব করে থাকে। খুব খারাপ হলে সেরকম হবে। তার চেয়ে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু হবে না।'

'কিন্তু উনি যখন মারা যাবেন তখন তোমাকে অনেকদিন বাঁচতে হবে।'

'বাঁচতে যে হবেই এমন কোন কথা নেই। মৃত্যু তো নিজের হাতে।'

গুটিয়ে গেলেন কুহেলি। বললেন, 'কি খাবে বল? চা, কফি?'

'কিছু না। আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসেছি।'

'আমি তোমাকে এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছি তা তুমি জানতে চাইছ না কেন? এটা তো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' কুহেলি সহজ হতে চাইছিলেন।

'আমাকে সইদি বলেছেন, শোভনদার ব্যাপারে কথা হতে পারে।'

'শোভন সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

'একসময় খুব স্ট্রাগ্‌ল করেছেন, জীবনকে দেখেছেন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থেকে। নইলে লেখাগুলো লিখতে পারতেন না।'

'ওঁর স্ত্রী?'

'খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। ভদ্রমহিলা ওঁকে বুঝতে পারেননি।'

'ওঁর প্রেমিকারা?'

তৃষ্ণা তাকাল, 'তাঁরা বোধহয় ওঁর যোগ্য ছিলেন না।'

হকচকিয়ে গেলেন কুহেলি, 'ও!'

'নির্বাচনের ব্যাপারে উনি বারংবার ভুল করেছেন। আসলে সামান্য সহানুভূতি অথবা বন্ধুত্ব পেয়ে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, পরে বুঝেছেন, বুঝে সরে গেছেন।'

'কিন্তু কোন মহিলা যদি মনে করেন শোভন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন?'

'মানে?'

'দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে যখন আকর্ষণ কমে গেছে তখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন, তাহলে কি জবাব দেবে?'

'ন্যাকা।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন সই মুখার্জি, 'দিনের পর দিন ওসব করেছেন তখন বুঝতে পারেননি, সরে গেলেন তখন যখন পুরোনো হয়ে গেল, না?'

তৃষ্ণা সোজা হয়ে বসল, 'শারীরিক সম্পর্কের সময় দুজনেই তো একমত ছিলেন। দায় তো দুজনের, ওঁর একার নয়।'

'নিশ্চয়ই। মহিলা তো ওকে ত্যাগ করতে চাননি। তাঁর কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত শ্রদ্ধার, অনেক পবিত্র। কিন্তু উনি তখন মুখ বদলাতে চাইছেন। মহিলা নিজের সম্মান বাঁচাতে ওঁর পেছনে ছোটেননি। কারণ পেছনে ছুটে যা আদায় করা যায় তাতে আর যাই থাক, ভালবাসা থাকে না।' কুহেলি বললেন।

'এরকম কোন মহিলাকে আপনি চেনেন? জিজ্ঞাসা করল তৃষ্ণা।

'চিনি।'

'আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন?'

'কেন?'

'আমি তাঁর নিজের মুখে শুনতে চাই।'

'কি শুনতে চাও?'

'আমি শুনতে চাই কি পরিস্থিতিতে উনি তাঁকে ছেড়ে গেছেন। আমি দেখতে চাই সেই মহিলা শরীর-সর্বস্ব কিনা!'

হেসে ফেললেন কুহেলি। সইকে বললেন, 'কি জবাব দেব?'

'এই কথার কোন মানে হয় না।' সই মুখার্জি বললেন, 'কোন মহিলা তাঁর অপমানের গল্প পা ছড়িয়ে ওকে বলতে বসবে না। ও যদি ডুবতে চায় তো ডুবুক, আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। আপনার অনেকটা সময় নিয়েছি। কিছু মনে করবেন না। চলি।' উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন সই মুখার্জি। কুহেলি হাত নেড়ে বসতে বললেন।

কুহেলি একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ কথা বললে, কেমন লাগছে?'

'ভাল। পরিষ্কার।'

'শরীর-সর্বস্ব মনে হচ্ছে?'

'না। আপনার কথা কেন উঠছে?'

'কারণ শোভন এই বাড়িতে দিনের পর দিন আসতো। ওই ঘরে বসে লিখতো? আমি যখন ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম তখন ও আচমকা হারিয়ে গেল।' হাসলেন কুহেলি, 'আমি একবারও ওঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি। তাতে আরও জটিলতা বাড়ত, দুঃখ পেতাম।'

'আপনার কথা আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। তবে উনি যেন না ভাবেন আমি ওঁর বিরুদ্ধে প্রচার করছি।'

কুহেলির কথা শেষ হতেই পাখি ঘরে ঢুকল। সই মুখার্জিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হল সে, 'ওমা, তুমি! কখন এসেছ! আমি জানতামই না।'

'অনেকক্ষণ। খুব প্রশংসা হচ্ছে তোমার।' সই হাসলেন।

'কেন?'

'স্বপনদার ছবিতে ভাল কাজ করেছ, তাই।'

'ওমা। ছবি তো এখনও মুক্তি পায়নি।'

'এডিটিং টেবিলে যারা দেখেছে তারা বলছে।'

'ও।'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কিছু বলতে এসেছিলি?'

'হ্যাঁ। বিজনবাবু আবার ছবি করছেন। আমাকে নাকি এবার ভাল রোল দেবেন। কিন্তু আমি ওঁর ছবিতে কাজ করব না।' পাখি বলল।

সই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি! কেন করবে না?'

'আগের ছবিতে অনেকটা স্যুটিং করে বেশির ভাগই ফেলে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করাতে বলেছেন ছবি নাকি বড় হয়ে যাচ্ছিল। এতদিন ছবি করছেন বড় হবে কিনা তা আগে থেকে বুঝলেন না?' অভিমানী গলায় জিজ্ঞাসা করল পাখি।

'ঠিক।' সই মাথা নাড়লেন।

'তাছাড়া, এবারও উনি শোভন দাশগুপ্তের গল্প নিয়ে ছবি করছেন?'

পাখি কথাটা বলামাত্র তৃষ্ণা চমকে তাকাল পাখির দিকে।

কুহেলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাতে তোর অসুবিধে কোথায়?'

'আছে।' পাখি বলল।

সই হাসলেন, 'শোন্, প্রফেশন্যাল হতে হলে অনেক কিছু উপেক্ষা করতে হয়। একেবারে ব্যক্তিগত অপমানের ঘটনা না থাকলে ভাণ করতে হয় যেন কিছুই হয়নি। শোভন দাশগুপ্তের গল্পের ওপর তোমার এত অনাস্থা কেন?'

'ওঁর গল্পের ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। উনি বলেছিলেন, অভিনয করতে গেলে আমাকে কিছু না দিলে কেউ কাজ দেবে না। আমার বাবার বয়সী একটি মানুষ একথা বলেছিলেন। শুধু উনি মায়ের বন্ধু বলে আমি সেদিন কিছু বলিনি। সেদিন সুযোগ পেয়েছিলাম যেদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। উনি মাতাল হয়ে পাশের ঘরে বসেছিলেন। আমি সোজা ওকে গিয়ে বলেছিলাম, আপনি সুযোগ করে দিয়েছেন, যা চান নিন। হয়তো নেশার ঘোরে একটু এগিয়েই ওঁর নিশ্চয়ই মায়ের কথা মনে পড়ায় চোরের মতো বৃষ্টির মধ্যেই এ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজনবাবুর সেই ছবি যেদিন রিলিজ করল সেই প্রেস শো-তে বারংবার আমাকে দেখছিলেন। আমাকে নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন বিজনবাবুর সঙ্গে। বোধহয় সেই কারণে বিজনবাবু আমাকে এবার বড় চরিত্র দিতে চাইছেন। আমি ওঁর মারফৎ কোন কাজ পেতে চাই না।' একটানা বলে গেল পাখি।

তৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল, 'যাচ্ছি।'

কুহেলি বললেন, 'আবার এসো।'

সইকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। বিদায় নিয়ে উনি তৃষ্ণার সঙ্গে চলে গেলেন। পাখিও ফিরে গেল তিনতলায়। অনেকক্ষণ গুম মেরে বসেছিলেন কুহেলি। আজ পাখি যেভাবে কথাগুলো বলল তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল সব। ও বড় হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে তাঁর আর যাওয়ার দরকার নেই স্টুডিওগুলোতে। মেয়ের পাহারাদার হিসেবে যেতে তাঁর ভাল না লাগলেও যেতে হত। ওই কস্ট্যুম ডিজাইনারের পদটা যে বাংলা ছবিতে অর্থহীন সেটা ইতিমধ্যে বুঝেও গিয়েছেন। স্টুডিওতে গেলে বৃদ্ধরাও যে তাঁকে চোখ দিয়ে চাটতো তা বুঝতেন, বুঝে নোংরা

লাগত খুব। সেই অনুভূতিটা আর হবে না। সেটা ভেবে খুশি হচ্ছিলেন কুহেলি। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তিনি এখন থেকে একেবারে একা হয়ে গেলেন। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই।

টেলিফোন বাজল। তিনবারের বার রিসিভার তুলে হ্যালো বললেন।

সুজাতার গলা, 'কেমন আছ?'

'আছি।' কুহেলি বললেন।

'বাব্বা। এমন গলায় কথা বলছ যেন কেউ মারা গিয়েছে।'

'সেরকমই। কেমন আছিস বল।'

'খুব খারাপ। মিস্টার পাকড়াশি খুব রাগারাগি করছেন। কতদিন হয়ে গেল উনি তোমাকে জমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন, অথচ তুমি ওঁকে কিছুই জানাচ্ছ না!' সুজাতার গলায় তাপ।

'জানাতে পারছি না। কারণ ওই জমি আমার একার নয়। তোমাদের বাবা যা রেখে গেছেন তার কোনটাই আমার সম্পত্তি নয়। সেসব ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। এটা ওঁকে বলে দিয়ো।' কুহেলি জানিয়ে দিলেন।

'কেন? ওরা আপত্তি করছে?'

'হ্যাঁ। অনেক সমস্যা তৈরি করছে।'

'এখন আমি কি বলি ওঁকে?'

'যা সত্যি তাই বলে দাও।'

'তুমি একবার আসবে?'

'কেন?'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলতে।'

'দেখি! শনিবার যদি যেতে পারি—।'

'শনিবারে উনি থাকবেন না। শুক্রবার জামশেদপুরে যাবেন। আমাকেও যেতে বলেছিলেন কিন্তু আমি যাচ্ছি না।'

হঠাৎ অমিয়র কথা মনে এল। কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, অমিয় কেমন আছে?'

'যেমন ছিল তেমন আছে। অফিস করছে। বোধহয় একটা প্রমোশন হয়েছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়েছে। আচ্ছা, রাখছি। কেউ বেল বাজাচ্ছে।' ঝটপট টেলিফোন রেখে দিল সুজাতা।

মেজ ছেলে ফোন করেছিল। গোবিন্দপুরের ঠিক কোথায় জমিটা আছে তা জানতে চেয়েছিল। সে নিজে গিয়ে দেখে আসবে। খোঁজখবর নিলে জানতে পারবে ওই জমির এখনকার দাম ঠিক কত হতে পারে। এতে মিস্টার পাকড়াশির

সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হবে।

কথাটা কুহেলির পছন্দ হল। বললেন, 'এ তো ভাল কথা। কিন্তু তোর বাবা কোন কাগজপত্র রেখে যাননি, এমনকি কোন ডায়েরিতেও লেখেননি জমিটার কথা। মিস্টার পাকড়াশি নিজে থেকে না জানালে আমি জানতামও না।'

'আশ্চর্য! ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকে জেনে নিতে পার তো।'

'পারি। কিন্তু জানতে চাইলেই ভদ্রলোক অবাক হবেন। জমিটার কথা আমরা জানি না তা ওঁকে জানানো কি উচিত হবে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে দিদিকে বল, কথায় কথায় জেনে নিতে!'

'তুই বল, ওর নাম্বার জানিস?'

'জানি।' ফোন কেটে দিল মেজছেলে।

কুহেলির ভাল লাগল। তিনি বুঝলেন ছেলে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। কথাটা কেউ তাঁকে বলেনি। বললে কি অসুবিধে হত ওঁদের।

এদিকে কলকাতার রাস্তায় স্বপন গুপ্তের ছবির পোস্টার পড়েছে। বড় নায়িকার চারপাশে ছোট ছোট মুখগুলোর একটি পাখির। স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে দূর থেকেই। মিহির মিত্র নিজে এসে তাঁদের নেমন্তন্ন করে গেছেন প্রেস-শোতে। বিজলি সিনেমায় হবে। তারপর গ্র্যান্ড হোটেলে ককটেল এবং ডিনার। বারংবার বললেন, 'পাখি, তুমি যদি মাকে সঙ্গে নিয়ে না যাও তাহলে আমরা খুব দুঃখ পাব।'

পাখি বলেছিল, 'আমরা তো যাবই। মা আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না। আপনি মাকে বলে যান। আমি কফি আনছি।'

এই প্রথম মেয়েকে উদ্যোগী হয়ে কোন গেস্টকে আপ্যায়ন করতে দেখলেন কুহেলি। একা হওয়ার পর মিহির মিত্র বললেন, 'বলুন ম্যাডাম, আমাকে একদম ভুলে গেলেন?'

'আপনারা কাজের মানুষ, ব্যস্ত থাকেন, বিরক্ত করে কি লাভ?'

মাথা নাড়লেন মিহির মিত্র, 'এ তো পর করে দেওয়া কথা হল। তবে দেখুন, ফিরে আসার পর আমিও আপনাকে বিরক্ত করিনি।' একটু থামলেন মিহির মিত্র, 'একটা কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি আগের থেকে আরও সুন্দরী হয়েছেন।'

'কি যে বলেন! আমার কত বয়স হয়েছে তা জানেন!'

'আজকালকার বেশির ভাগ মেয়ে তো ছানাকাটা দুধের মতো। দু-বলকা ফুটতেই দুধ কেটে যায়। চল্লিশের পরে তাকানো যায় না। দুধ ঘন হলে তার স্বাদ যে আলাদা এটা ওরা বুঝতেই পারে না। যাক গে, প্রেস শোতে আপনাকে দেখতে

পেলে খুব ভাল লাগবে। একটু আগেই চলে আসবেন।' মিহির মিত্র খুব বিনীত।

প্রেস শো-এর দিন সকালে হঠাৎ শিবানী ফোন করল। সেই যে স্বামী জাহাজ থেকে আসছে জানিয়ে সে পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল আবার এই তার আত্মপ্রকাশ। বলল, 'উঃ, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম গো। কাল রাতের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরে চলে গেল। ওখান থেকে জাহাজে উঠবে।'

'এবার এত তাড়াতাড়ি?'

'কোম্পানি জরুরি তলব করেছে, কি করবে। বেচারার ইচ্ছে ছিল আরও কিছুদিন এখানে থাকার, হল না। আজ সন্ধেবেলায় বাড়ি আছ?'

'আজ? আজ আমরা বাড়িতে থাকছি না।'

'নেমন্তন্ন?'

'ঠিক ওরকম নয়। পাখি বিখ্যাত পরিচালক স্বপন গুপ্তের ছবিতে অভিনয় করেছে। সেই ছবি আজ মুক্তি পাচ্ছে। বিজলিতে প্রেস শো। সেখানে যাব।' কুহেলি বললেন।

'প্রেস শো? বাঃ। আমি কখনও কোন প্রেস শো-তে যাইনি। আমি গেলে কি তোমাদের কোন অসুবিধে হবে?' শিবানী জিজ্ঞাসা করল।

ফাঁপড়ে পড়লেন কুহেলি। শিবানী তাঁকে কতদিন সঙ্গ দিয়েছে, ওকে না বলেন কি করে? সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন ওরা তিনজন, আর একজন বাড়লে কি খুব অসুবিধে হবে মিহিরবাবুদের? না হয়, সিনেমা দেখার পর গ্র্যান্ডে ডিনার খেতে যাবেন না। কুহেলি বললেন, 'তাহলে বিকেল পাঁচটার মধ্যে এখানে চলে এসো। একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তুমি গেলে অসুবিধে হবে কেন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' শিবানী বলেছিল।

সাজবো না সাজবো না করেও সেজে ফেললেন কুহেলি। পাখি শার্ট, জ্যাকেট আর লম্বা স্কার্ট পরেছে। শুদ্ধও বেশ মাঞ্জা দিয়েছে। শিবানী এল প্রায় নায়িকার বেশে। তার ব্লাউজের কাপড় যতটা কম না হলে নয় ততটাই।

শো শুরু হওয়ার মিনিট দশেক আগে ওঁরা পৌঁছে গেলেন। কার্ড দেখাতে হল না, নবনী দাঁড়িয়ে ছিল, খাতির করে ওপরে নিয়ে গেল যেখানে সাধারণ দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ। ওপরের লাউঞ্জে তখন প্রচুর মানুষ। মিহির মিত্র এগিয়ে এল। পাখিকে আলাপ করিয়ে দিল যাঁর সঙ্গে তাঁর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না শিবানী। ফিসফিস করে কুহেলিকে বলল, 'উত্তমকুমার, না?'

'হুঁ।'

'আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?'

'বোধহয় না।' কুহেলি দেখলেন, উত্তমকুমারকে নিয়ে কিছু স্বেচ্ছাসেবক

হলের ভেতরে চলে গেল। টালিগঞ্জের সব নক্ষত্র যেন এখানে একত্রিত। হঠাৎ স্বপন গুপ্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'ছবি কেমন লাগল দেখে বলবেন!'

'নিশ্চয়ই।'

'পাখিকে আমার পরের ছবির জন্যে দরকার।'

'আমরা সত্যি খুব গর্বিত।'

কেউ ডাকতে স্বপনবাবু সেদিকে চলে গেলেন। বেল পড়তে ওঁরা ভেতরে ঢুকলেন। উত্তেজিত পাখি পাশে বসে বলল, 'জানো, উত্তমকুমার আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। উঃ।'

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে উনি কি বললেন?'

বললেন, 'পরিশ্রম করবে, কাজে ফাঁকি দেবে না, তাহলেই বড় হবে।'

কুহেলি বললেন, 'ঠিক বলেছেন।'

ছবি শুরু হল। খুব ভাল এগোচ্ছে ছবি। পাখিকে যখন প্রথম পর্দায় দেখা গেল তখন কুহেলির হাত চেপে ধরল ও। শিবানী নিচু গলায় বলল, 'তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে পাখি।'

পাখিও ওই গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সেই দৃশ্যটি, যেখানে পাখিকে রেপ করছে ছেলেটি, পাখি সোজা হয়ে বসল। প্রেক্ষাগৃহে আলপিন পড়ার শব্দও বোধহয় শোনা যাবে। রেপড্ হওয়ার পর পাখি অজ্ঞান হয়ে শুয়ে রয়েছে ঘাসের ওপর, তার স্কার্ট উঠে গেছে অনেক ওপরে, হাঁটু, থাই-এর অনেকটাই দৃশ্যমান কিন্তু অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে না। উলটে করুণরস তৈরি করছে। কিন্তু নাড়া খেলেন কুহেলি। পাখির থাই বলে দিচ্ছে ও এখন পূর্ণ যুবতী। ওর কৈশোরবেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। মন খারাপ হল একটু।

ছবিটি সত্যি ভাল হয়েছে। শেষ হওয়া মাত্র হাততালির ঝড় উঠল। বেরিয়ে এসে সবাই স্বপন গুপ্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। শিবানী হতাশ হল। ছবির শেষ দৃশ্যেই অন্ধকারের আড়ালে উত্তমকুমার বেরিয়ে গেছেন। ওঁকে ওর দেখা হল না।

মিহির মিত্র ছাড়লেন না। শিবানী সমেত গ্র্যান্ড যাওয়ার জন্যে জোর করতে লাগলেন। পাখিরও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে যেতে। অতএব যেতে হল।

এই ছবির শিল্পীদের ভেতর থেকে নির্বাচিত কয়েকজন, প্রেসের লোকজন ও পরিবেশক এবং প্রেক্ষাগৃহের মালিকরাই আজকের ডিনারে আমন্ত্রিত। উত্তমকুমার আসেননি। শিবানী হতাশ হল। পাখিকে নিয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। সে ঠিক প্রজাপতির মতো ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঘুরছে; পেছনে শুদ্ধ।

বেয়ারারা ট্রেতে ড্রিঙ্ক নিয়ে ঘুরছিল। যেহেতু কুহেলি নিচ্ছেন না তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিবানী হাত বাড়ায়নি। এইসময় স্বপন গুপ্ত এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন, 'মিসেস সেন, আমার এই বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে

চাইছেন!'

'আমার সঙ্গে?' বুকে আঙুল রাখলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ।' স্বপন গুপ্ত বললেন।

'কারণটা জানতে পারি?' ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন কুহেলি।

'সিওর।' ভদ্রলোক বললেন, 'এই ব্যাঙ্কোয়েট হলে কত সুন্দর পুরুষ এবং নারী শোভাবর্ধন করছেন কিন্তু চোখ অন্য কাউকে দেখতে চাইছে না, তাই।'

কুহেলির মুখে রক্ত জমল, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'গোলাপ ফুটলে সেটা বাড়াবাড়ি বলে কি মনে হয়?'

স্বপন গুপ্ত হাসলেন, 'আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। রুদ্র রায়, বিজনেসম্যান, ফ্রান্সে থাকেন। ইনি কুহেলি সেন। আমার ছবিতে অভিনয় করেছে যে ছোট্ট মেয়েটি, সেই পাখির মা।'

'মাই গড। মনেই হয় না আপনার মেয়ে অত বড় হতে পারে।'

কুহেলি আলাপ করিয়ে দিলেন, 'আমার বন্ধু শিবানী, বয়সে অনেক ছোট যদিও। ইনি পরিচালক স্বপন গুপ্ত, ইনি—।'

'রুদ্র রায়। যিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না।' শিবানী বলল।

'একেবারে ঠিক।' রুদ্র রায় বললেন।

'আপনারা গল্প করুন, আমি—।' স্বপন গুপ্ত অন্যদের কাছে গেলেন।

রুদ্র রায় ডাকলেন, 'ব্যারা।'

বেয়ারা ট্রে নিয়ে কাছে এলে রুদ্র বললেন, 'এরকম সন্ধ্যায় মহিলারা খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকছেন, এ দৃশ্য দেখা যায় না।' নিজে ট্রে থেকে হুইস্কির গ্লাস তুলে প্রথমটা শিবানীর দিকে এগিয়ে ধরলেন, 'হুইস্কিতে কি আপত্তি আছে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' শিবানী গ্লাস নিল।

'ম্যাডাম!'

'ধন্যবাদ।' কুহেলি গ্লাস ধরলেন।

'উল্লাস।' রুদ্র গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি প্যারিসে থাকেন?'

'না। মিসে। তবে প্যারিসে আমার অফিস আছে।'

'কতদিন আছেন ওখানে?' শিবানী কৌতূহলী।

'ওয়েল। তেইশ বছর। চব্বিশে গিয়েছিলাম।' রুদ্র হাসলেন।

'বাব্বা! অতদিন? তাহলে নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষা আপনি জানেন!'

'অবশ্যই।'

এবার কথা বললেন কুহেলি, 'আপনি বাংলা ভুলতে পারেননি।'

'পারা যায়? প্রথম কথা বলেছি যে ভাষায়, গান গেয়েছি, ঝগড়া করেছি

সেই ভাষা কি মৃত্যু পর্যন্ত ভুলতে পারি?' রুদ্র বললেন।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি আত্মীয়দের বাড়িতে উঠেছেন?'

'নাঃ। কলকাতায় কিছু বন্ধু আছেন, কোন আত্মীয় নেই। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম, ওঁরা নেই। বিয়ে করেছিলাম এক ফরাসিনীকে, তিনি বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না আমাকে।' রুদ্র বললেন।

'কেন?'

'আমার বাঙালি-প্রীতি ওঁর পছন্দ হয়নি। আপনি ভাবুন, রাত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবো না, এটা কি মেনে নেওয়া যায়!'

'তাহলে কলকাতায় এসে কোথায় ওঠেন?' শিবানী জিজ্ঞাসা করল।

'এই হোটেলে। তিনশো দুই নম্বরে উঠি যখনই আসি। আগে জানিয়ে দিলে ওরা আমার জন্যে ঘর রেখে দেয়।'

'কলকাতায় কি বেড়াতে আসা?'

'না কুহেলি। বেশ কিছুদিন থেকে একটা ব্যবসার কথা মাথায় আসছিল। যেমন ধরুন, ট্যুরিজম। ভারত এবং নেপালে দেখার মতো জায়গা এত আছে অথচ অন্য দেশের মানুষ তার খবর পায় না। আমি ট্যুরিজমকে ডেভলপ করতে চাই। এখানকার সরকার আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন ধরুন, নেপালে এমন অনেক জায়গা আছে যা সুইজারল্যান্ডের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে, কষ্ট হয়। আমি ওরকম জায়গায় আধুনিক রিসর্ট করতে চাই। কাঠমুণ্ডু থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি রিসর্টে যাওয়া যাবে। ওরকম আটটি রিসর্ট এভারেস্টের বিভিন্ন জায়গায় করব। রোজ একটি হেলিকপ্টার সেই রিসর্টগুলোয় পাক খাবে। আমি সার্ভে করিয়েছি, খুব ভাল রেসপন্স পেয়েছি। গ্লাস শেষ করলেন রুদ্র, 'নাঃ। ইন্ডিয়ান ড্রিঙ্কস্ আমি বেশি খেতে পারি না।'

'মানে?' শিবানী অবাক হল।

'এই জল মিশিয়ে পাতলা করা হুইস্কি, যাতে খারাপ গন্ধটা কমে যায়, পছন্দ হয় না। আমি স্কচ খাই জল ছাড়া। নইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। নর্থবেঙ্গলের ভূটান পাহাড়ের নিচে সরকার আমাকে দশ বিঘে জমি দিচ্ছেন। সেখানে আমি ডিস্টিলারি করব। কিন্তু আমার ডিস্টিরলারি থেকে ইন্ডিয়ান মদ বের হবে না। প্রিমিয়াম স্কচের ফর্মুলায় ওখানে মদ তৈরি হবে। আবহাওয়াটা খুব সাহায্য করবে। এখন স্কচের যা দাম তার অর্ধেক দামে একই স্কচ পেলে কেউ আর এসব হুইস্কি খেতে চাইবে না।' রুদ্র হাসলেন।

'কিন্তু এসব করতে তো অনেক টাকা লাগবে।' শিবানী বলল।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার অনেকগুণ ফেরত আসবে দুবছরের মধ্যেই।'

এবার কুহেলি বললেন, 'আমি ভাবতেই পারছি না।'

'আসুন না কাল আমার ঘরে। পুরো ব্যাপারটা ডামি করা হয়ে গেছে, দেখবেন। খারাপ লাগবে না। কাল বিকেল ছটায় তাহলে কোন কাজ রাখছি না।'

শিবানী খুব উত্তেজিত। এখন উত্তমকুমারকে দেখার আনন্দও চাপা পড়ে গিয়েছে। বিকেলে কুহেলির বাড়িতে এসে রুদ্র রায়ের প্রশংসা করে যাচ্ছিল সে। বলেই ফেলল, 'আজ অবধি কোন বাঙালি হি-ম্যান দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম।'

কুহেলি হাসলেন, 'মনে হচ্ছে প্রেমে পড়ে গিয়েছ।'

'প্রেম? প্রশংসা করা মানে কি প্রেমে পড়া?'

'তোমার হাবভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মাথার ওপর স্বামী দেবতা আছেন না? অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তাঁকে ভাসিয়ে দিতে আমি পারব না। আমারটি আমারই থাকবে।'

'অর্থাৎ জলে নামব কিন্তু বেণী ভেজাবো না।'

'যা ইচ্ছে বলতে পার। লোকটার চেহারা ভাবো! অন্তত ছয়ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট। রিস্ট দেখেছ, কি চওড়া!' শিবানী বলে যাচ্ছিল।

'থামলে কেন? আর কি কি চোখে পড়ল?'

'সেগুলো তোমার জন্যে রেখে দিলাম।'

'মানে?' চমকে উঠলেন কুহেলি।

'শোন। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, রুদ্র রায় তোমার ভাল বন্ধু হতে পারেন। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে। তাছাড়া তুমি একা, ভদ্রলোকও তাই।' শিবানী হাসল।

'থাক। তোমাকে আর আমার জন্যে ঘটকালি করতে হবে না।' কুহেলি উঠে দাঁড়ালেন। আয়নার সামনে গিয়ে বসলেন তিনি।

তৈরি হওয়ার সময় হঠাৎ বুঝলেন যাওয়ার ইচ্ছেটা চলে যাচ্ছে। গেলে তো সেইসব সাজানো কথা বলতে হবে। কিন্তু কথাটা শিবানীকে বলতে পারলেন না। অভ্যস্ত হাতে নিজেকে তৈরি করলেন।

নয়

তিনশো দুই নম্বরের দরজা খুলে রুদ্র রায় বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা।'

শিবানী ঘরে ঢুকে বলল, 'আপনি দেখছি বাড়াবাড়ি রকমের বাঙালি। কিন্তু আপনার পোশাকে বিদেশ স্পষ্ট।'

নিজের পোশাকের দিকে তাকালেন রুদ্র রায়, 'ঠিক কথা। আসলে ফ্রান্সে বাঙালি পোশাক পাওয়া যায় না। এখানে এসে কোথায় গিয়ে কি কিনব তা বুঝতে পারি না। সময়ও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আসুন। বসুন।'

পাঁচতারা হোটেলের ঘর তো সুন্দর সাজানো হবেই। কুহেলি সোফায় বসলেন, শিবানীর পাশে। ঘরের প্রান্তে টেবিলে রাখা অ্যালবামটা নিয়ে এলেন রুদ্র, 'দয়া করে যদি এর পাতা ওলটান তাহলে আমার কল্পনাকে বুঝতে পারবেন।'

শিবানী সাগ্রহে পাতা ওলটাল। বাঁ দিকে একটি বরফে ঢাকা জায়গার ছবি। ঠিক মাঝখানে একটি সুদৃশ্য বাংলো রয়েছে। ডান দিকের পাতায় শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। বরফেব মধ্যে বিশাল বাংলো। চারপাশে গভীর খাদ। একটা হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে। রুদ্র রায় বললেন, 'বাঁ দিকের ছবি আল্পসের এক রিসর্টের। বারো মাস ওর কুড়িটা ঘর ভর্তি রাখে ট্যুরিস্টরা। ডানদিকের আঁকা ছবি আমার আগামী প্রজেক্টের কাছাকাছি। আমি তিরিশটি ঘর রাখছি। টোট্যাল কর্মচারীর সংখ্যা দশ। হেলিকপ্টার সমস্ত কাঁচা সবজি মাছ মাংস সাপ্লাই দেবে। তিনদিকে খাদ থাকলেও একদিকে ফুটবল মাঠের মতো জায়গায় শক্ত করা রয়েছে। সেখানে ট্যুরিস্টরা স্কি করতে পারবেন। আমরা ইয়েতির গল্প শুনি। যদি কেউ ওখানে থেকে ইয়েতির খোঁজ নিতে চান তাহলে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা হবে। বলুন, এই রিসর্ট কি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করবে না? ভারতবর্ষে এরকম ব্যবস্থা এখনও কেউ ভাবেনি।'

কুহেলি মুগ্ধ হলেন। এতবড় এবং এমন অভিনব প্রজেক্টের কথা বাঙালির পক্ষে কার্যকর করা দূরের কথা, ভাবাও বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

রুদ্র রায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বললেন, 'চমৎকার। কিন্তু নিশ্চয়ই ওখানে থাকাটা খুব ব্যয়সাপেক্ষ, আমরা কি পারব যেতে?'

'অবশ্যই। আপনারা আমার গেস্ট হিসেবে যাবেন।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু মিস্টার রায়, চব্বিশ ঘণ্টা আগে আপনি তো আমাদের চিনতেন না।'

'কারেক্ট। মিসেস সেন, পঁচিশ বছর এক বিছানায় শুয়ে দুই নারীপুরুষে কতটা চেনাজানা হয়?' হাসলেন রুদ্র রায়, 'আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে। ধরুন, নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হল, কথা বললাম, পরিচয়টা থেকে যাবে দীর্ঘকাল কিন্তু তার সম্পর্কে মনে কোন আগ্রহ আসে না। অর্থাৎ লোকটাকে আমি বন্ধু হিসেবে ভাবতে পারি না। আবার প্রথম আলাপের সময়েই মনের ক্যামেরা ক্লিক্ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে গেলাম এঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভাল জমবে।'

শিবানী হাসল, 'আমরা তাহলে বেশ লাকি, বলুন?'

'উলটোটা বলাই বোধহয় ঠিক হবে। আচ্ছা, এবার বলুন, কি খাওয়া যেতে পারে!'

'মানে?' শিবানী তাকাল।

'আপনারা এলে খাবো বলে অপেক্ষা করছি।'

কুহেলি বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

রুদ্র রায় টেলিফোন তুলে অর্ডার দিলেন।

কুহেলি বললেন, 'আপনি কাল বলছিলেন স্কচ তৈরির কথা!'

'হ্যাঁ। অনেকটা এগিয়ে গেছি। দিন তিনেকের মধ্যে জমি পেয়ে যাব। তারপর শুরু হবে কনস্ট্রাকশন। এখানকার একটা ফার্মকে দায়িত্ব দিয়ে যাব।' রুদ্র বললেন।

শিবানী বললেন, 'নর্থবেঙ্গলের জলে স্কচের স্বাদ পাওয়া যাবে?'

'অন্তত আশিভাগ পাবেন।'

কুহেলি বললেন, 'আপনারা হাসবেন না, আমি এখনও জানি না কিভাবে রাম, জিন, ভদকা, ব্র্যান্ডি এবং হুইস্কি একই ডিস্টিলারি থেকে তৈরি হয়।'

শিবানী মাথা নাড়ল, 'আমিও জানি না।'

রুদ্র রায় বললেন, 'সবাই সবকিছু জেনে বসে আছে এটা তো হয় না। আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারি কিন্তু তার চেয়ে যখন আমার ডিস্টিলারির কাজ শুরু করব তখন সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে ভাল বুঝতে পারবেন।' রুদ্র মাথা নাড়লেন, 'আমার সমস্যা এখন একটাই।'

কুহেলি তাকালেন।

রুদ্র বললেন, 'একজন মানুষ চাই যাকে আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে পারি। আমি না থাকলে কলকাতার অফিসের দায়িত্ব নেবে।'

'অন্ধের মতো বিশ্বাস কাউকে কি করা সম্ভব?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'কিন্তু করতে হবে। আমার পক্ষে এতগুলো দিক একা সামলানো সম্ভব নয়।'

'আপনি কলকাতায় অফিস খুলছেন?'

'হ্যাঁ। নর্থবেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে কলকাতাই ঠিক জায়গা। এখানে আর একটা ব্যবসার সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি। আমার পার্টনার একজন তামিল ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁকে আমি এই ব্যবসায় টানতে চাই না। ওখানে ওর আমার আধা আধি শেয়ার। উনি ওই ব্যবসায় থাকুন।'

'কি ব্যবসা?' কুহেলি জানতে চাইলেন।

'ধার দেওয়ার ব্যবসা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে জাহাজে মাল আনান। জাহাজ বন্দরে পৌঁছে গেলেই টাকা দিয়ে সেসব ছাড়াতে হয়। না ছাড়াতে পারলে যতদিন জাহাজ বন্দরে আটকে থাকবে ততদিনের জন্যে প্রচুর পেনাল্টি দিতে হয়। সবাই ঠিক সময়ে ওই টাকার যোগাড় করে উঠতে পারে না। পেনাল্টি এড়াতে তারা দুচারদিনের জন্যে ধার করেন। ধরা যাক এক কোটি টাকার জিনিস এসেছে। পার ডে পেনাল্টি যা তার অর্ধেক ইন্টারেস্ট হিসেবে দিলে আমরা ওকে টাকাটা ধাব দেব। জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে উনি আমাদের গোডাউনে রাখবেন। তিন চার পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা যোগাড় করে মূল এবং সুদ সমেত পেমেন্ট করে মাল নিয়ে যাবেন। খুব ভাল প্রফিট হচ্ছে এই ব্যবসায়।'

দরজায় শব্দ হল। বেয়ারা এল ট্রলি নিয়ে। খাবার সাজিয়ে টেবিলে রেখে রুদ্র রায়েব সই নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুদ্র বললেন, 'প্লীজ—!'

খুব অল্পই নিলেন কুহেলি। দুজনের কেউই চা খেতে চাইলেন না কারণ বাড়িতে খেয়ে এসেছেন। রুদ্র রায় যে খেতে ভালবাসেন সেটা ওঁরা দেখতে পেলেন।

খাওয়ার পর রুদ্র রায় বললেন, 'সমস্যা আরও আছে, চটজলদি টাকা আমি যদি ফ্রান্স থেকে আনাতে চাই সিস্টেম বাধা দেবে। অনেক নিয়মকানুন পেরিয়ে টাকাটা যখন হাতে পাবো তখন বেশ দেরি হয়ে যাবে। এর সমাধান করতে আমি একটা উপায় ভেবেছি।'

'কি উপায়?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আর একটু ভাবি, তারপরে বলব। আমি এমন একটা পরিকল্পনা নিতে চলেছি যা বাস্তবায়িত হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।'

'আচ্ছা!' কুহেলির ভাল লাগল। লোকটি শুধু নিজের কথাই ভাবে না।

রুদ্র রায় তিনটি গ্লাস আর বরফের পাত্র সামনে রাখলেন। তারপর একটা লম্বা গোলাকার কৌটো থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'এটা স্কচ?'

'অবশ্যই। এর নাম গ্লেন ফিডিক। এই বোতলটা বারো বছর আগে ভর্তি

করা হয়েছিল। এটা খাঁটি সিঙ্গল মল্ট। স্কটল্যান্ডের একটি পরিবার পাঁচ প্রজন্ম ধরে এই হুইস্কি তৈরি করে আসছে। আঠারোশ সাতাশি সালে গ্লেন ফিড্ডিক ডিস্টিলারি স্কচ তৈরি করতে আরম্ভ করে। এরা কখনও কোন কম্প্রোমাইজ করেনি। স্প্রিং ওয়াটারকে পরিশুদ্ধ করে ওদের ফর্মূলা অনুযায়ী তৈরি করে আসছে দীর্ঘকাল।' রুদ্র রায় গ্লাসে মদ ঢাললেন। তারপর দু টুকরো করে বরফ দিয়ে বললেন, 'আসুন, সান্ধেটাকে উপভোগ করা যাক।'

শিবানী গ্লাস হাতে নিয়ে কুহেলির দিকে তাকাল। বোধহয় ভাবল, জল ছাড়া কড়া মদ খেতে পারবে কিনা। কুহেলি গ্লাস তুলতেই রুদ্র বললেন, 'উল্লাস।'

'উল্লাস।' কুহেলি সাড়া দিলেন।

জিভে তরল পদার্থ কোন আন্দোলন সৃষ্টি করল না। মোলায়েম গন্ধ, সামান্য স্কচ গলা দিয়ে নামার সময় কিঞ্চিৎ উত্তাপ তৈরি করল মাত্র কিন্তু বুঝিয়ে দিল ভারতীয় মদের থেকে তার জাত একদম আলাদা।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ডিস্টিলারিতে ঠিক এই জিনিস তৈরি হবে?'

'কাছাকাছি। স্কটল্যান্ডের ঝরনা উত্তরবঙ্গে পাব কি করে?'

'এর অর্ধেকটাও যদি হয় তাহলে লোক অন্য কিছু খেতে চাইবে না।'

'ধন্যবাদ মিসেস সেন।'

'আমাকে কুহেলি বললে খুশি হব।'

শিবানী প্রথমবার একটু চেখেছিল। সাহসী হয়ে পুরোটা একবারেই গিলে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ। নাম ধরে ডাকাই ভাল।'

রুদ্র বললেন, 'ধন্যবাদ। কিন্তু শিবানী, একবারে গিলে ফেললে মজাটা কমে যাবে। এটা তারিয়ে তারিয়ে খেলে স্বাদটা পাবেন।'

শিবানী হাসল, 'যাই বলুন, আমাদের এখানে যে হুইস্কি পাওয়া যায় সেগুলো খেলে অল্পেই বেশ জমে যায়।'

'তাই? কিন্তু এটাকে অবহেলা করবেন না।' শিবানীকে আবার স্কচ ঢেলে দিলেন রুদ্র রায়। তারপর উঠে একটা গুন্ডিক টেপ রেকর্ডার চালু করলেন। খুব নরম একটা সুর বাজতে শুরু করল।

গল্প করতে করতে কুহেলি যখন দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করলেন তখন তাঁর মেজাজ বেশ ফুরফুরে। নেশা হয়নি কিন্তু একধরনের আনন্দ হচ্ছে। শিবানী ইতিমধ্যে চারপেগ শেষ করে ফেলেছে। ওর স্বামী জাহাজে চাকরি করে কিন্তু মদ খায় না। তিনি কলকাতায় থাকলে শিবানীকে বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে থাকতে হয়। শিবানীর কথায়, 'লোকটার একটাই লক্ষ্য, যতদিন থাকবে যখন তখন আমার শরীরটাকে উপভোগ করবে। আমার কি হচ্ছে কি হচ্ছে না তা দেখার প্রয়োজনই

বোধ করে না।' স্বাভাবিকভাবে ভদ্রলোক জাহাজে গেলেই স্বাধীন হয়ে যায় শিবানী।

পঞ্চম পেগটি নিয়ে শিবানী বলল, 'দারুণ, দারুণ।'

ওর কথা জড়ানো। শরীর দুলছে।

ততক্ষণে টেপরেকর্ডারে নাচের সুর শুরু হয়েছে।

রুদ্র রায় বললেন, 'ওয়েল! একটু নাচানাচি করলে আপত্তি আছে?'

শিবানী মাথা নাড়ল, 'নো। নট অ্যাট অল!'

'আসুন।' রুদ্র রায় উঠে দাঁড়াল।

শিবানী উঠতে গেল কিন্তু কোন মতে চেয়ার ধরে সামলাল।

'আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

কুহেলি ইতিমধ্যে ওকে ধরে ফেলেছে, 'মুখে জল দাও, ভাল লাগবে।'

টয়লেটে নিয়ে গিয়ে ওর মুখে ঘাড়ে জল দিতেই শিবানী বলল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্চে।'

'সিওর। কুহেলি ওঁকে খাটে শুইয়ে দিন।'

বিছানায় শরীর যাওয়ামাত্র শিবানী চোখ বন্ধ করে ফেলল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে ঘুমাতে লাগল।

রুদ্র বললেন, 'অত কুইক খাওয়া ঠিক হয়নি। স্কচ চার্জ করতে শুরু করে তিনের পরে। ঘণ্টাখানেক ঘুমালেই চাঙ্গা হয়ে যাবে?'

'তাছাড়া জল ঢেলে পাতলা করে খাওয়া অভ্যেস।'

'দুপেগ শুধু বরফ দিয়ে বিদেশে সবাই খায়। আর ওরা তো চার পাঁচ পেগ খাওয়ার কথা সচরাচর ভাবেও না। আসুন।' হাত বাড়ালেন রুদ্র।

'মানে?'

'বাজনাটা দারুণ। নাচা যাক।'

'দূর! আমি নাচ জানি না। কখনও নাচিনি।' কুহেলি মাথা নাড়লেন।

'ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। বাজনার তালে তাল মিলিয়ে স্টেপ ফেললেই হবে।'

'আমি পারব না।'

'পারব না বলা ঠিক নয় কুহেলি। চেষ্টা করুন। আসুন।'

মেজাজটা ফুরফুরে ছিল বলেই উঠলেন কুহেলি। হাত কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে রুদ্র বললেন, 'এবার আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে ছন্দ আনুন।'

কুহেলি চেষ্টা করলেন।

রুদ্র বললেন, 'বাঃ।'

কুহেলি হাসলেন, 'মোটেই ভাল হচ্ছে না।'

'কিন্তু হবে। আপনার মধ্যে একটা চেষ্টা রয়েছে।'

এমন পেশীবহুল শরীরের এত কাছাকাছি কুহেলি কখনও আসেননি। বাজনার তালে পা ফেলতে ফেলতে তিনি আড়চোখে শিবানীর দিকে তাকালেন। শিবানীর সঙ্গে এইসময় কোন মৃত মানুষের পার্থক্য নেই।

বাজনা শেষ হতেই কুহেলি হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন, রুদ্র বললেন, 'কয়েক সেকেন্ড, প্লীজ, পরের মিউজিক শুরু হয়ে যাবে।'

কুহেলি হাসলেন। সেই হাসি দেখে রুদ্র মৃদু আকর্ষণ করলেন। কুহেলির মুখ ঈষৎ ধাক্কা খেল রুদ্রর কাঁধের সঙ্গে। তখনই বাজনা বেজে উঠল। এবার দারুণ মিষ্টি সুর, ঢেউ-এর মতো দুলছিল। সেই ঢেউ-এ যেন শরীর ছেড়ে দিয়ে রুদ্র তাঁকে নিয়ে ভাসছিলেন। খুব ভাল লাগছিল, খুব।

'কুহেলি!' রুদ্রর গলার স্বর শোনা গেল কি গেল না।

'উঃ।'

'তোমার চোখদুটো দেখি!'

কুহেলি তাকালেন। চোখে চোখ। সুরের ঢেউ-এ দুটো শরীর যেন একত্রিত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। রুদ্র মুখ নামালেন। ধীরে ধীরে ওঁর ঠোঁট যেন আকাশ ছেঁকে উড়ে আসা বিমানের মতো বিমান বন্দরে অবতরণ করল। কুহেলি শুধু ঠোঁটে নয়, সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ আবিষ্কার করলেন। তিনি নড়তে পারছিলেন না, সমস্ত শক্তি যেন ওই এক চুম্বন শুষে নিয়েছে। ঠোঁট ছেড়ে গালে, চোখে, শেষে গলায় চুমু খেলেন রুদ্র। তারপর বললেন 'কুহেলি আমরা কি বন্ধু হতে পারি না।'

'আমি, আমি কেন?' আলিঙ্গনাবদ্ধ কুহেলি কোনমতে উচ্চারণ করলেন।

'কারণ এতকাল আমি যাকে খুঁজে যাচ্ছিলাম সেই মেয়ে হল তুমি।'

'মিথ্যে কথা।'

'না। এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। গতকাল থেকে আজ অবধি আমি এক ফোঁটাও ঘুমাইনি। শুধু ভেবে গেছি, একি স্বপ্ন না সত্যি? কুহেলি, আমি কি তোমার যোগ্য নই। দ্যাট, টেল মি—!'

'ভয় লাগে।'

'কিসের ভয়?'

'হারাবার ভয়। বিশ্বাসঘাতকতার ভয়। আমি খুচরো প্রেম করতে পারি না। যাকে ভালবাসি তাকে উজাড় করে দিই। আমাকে লোভ দেখিয়ো না, প্লীজ।'

'না। এ লোভ দেখানো নয়। আই নিড্ ইউ।'

ধীরে ধীরে রুদ্র ওঁকে নিয়ে গেল সোফায়। কোলে বসিয়ে পরমযত্নে আদর

করতে লাগল। একসময় সজাগ হল কুহেলি, 'না। আর নয়। এরপর আর আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারব না।' কুহেলি একটু আলাদা হতে চাইলেন।

পাশে বসে কুহেলির হাত আঁকড়ে ধরলেন রুদ্র। তারপর ওই হাতে চুমু খেলেন। কুহেলি বললেন, 'কি হচ্ছে! সামনে ও রয়েছে না?'

'এখন ওঁর সঙ্গে খাট দেওয়াল সোফায় কোন পার্থক্য নেই। কি যেন বলে, হ্যাঁ, জড়পদার্থ।'

রুদ্র উঠে আর একটা করে পেগ গ্লাসে ঢাললেন।

কুহেলি বললেন, 'আমাকে আর নয়।।'

'কেন?'

'তাহলে আমার অবস্থা শিবানীর মতো হবে।'

'বেশ। জোর করব না।'

'কটা বাজে? ওম্মা! দশটা বেজে গেছে, কি করে বাজল।'

'যেমন করে বাজে।' রুদ্র হাসলেন।

'এখন কি করি?'

'সমস্যাটা বলুন। সমাধানের চেষ্টা করছি।'

'বাড়ি ফিরতে হবে না?' কুহেলি ব্যস্ত হলেন।

'দেরিতে বাড়ি ফেরার জন্যে কাউকে কি কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'হ্যাঁ। নিজেকে। কিন্তু শিবানীকে ওর গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব কি করে?'

রুদ্র তাকালেন, 'যা অবস্থা, আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে হুঁশ ফিরতে।'

'তার মানে বারোটা? পাখিরা জেগে থাকবে। অসম্ভব।'

'তাহলে আমি ওকে কোলে করে নিচে নিয়ে যাই!'

'মাথা খারাপ নাকি? হোটেল সুদ্ধু লোক দৃশ্যটা দেখবে।'

'শিবানীর বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বুড়ি শাশুড়ি। সন্ধেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েন। স্বামী তো জাহাজে।'

'বেশ। শিবানী যদি রাত্রে আপনার বাড়িতে থাকেন তাহলে কি ওঁর কোন সমস্যা হতে পারে?' রুদ্র ভাবতে ভাবতে কথা বললেন।

'না। সেটা আমি ফোন করে ওর মেডসার্ভেন্টকে বলে দিতে পারি।'

'ব্যাস। আর কোন সমস্যা নেই। আপনি কি ওঁর গাড়িতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওঁর গাড়িতে আপনার বাড়িতে চলে যান। গিয়ে জেগে থাকবেন। আমি ওঁর সেন্স আসামাত্র ওঁকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'সত্যি?' উজ্জ্বল হলেন কুহেলি।

'এছাড়া আর কি উপায়?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আপনাকে বিব্রত করছি, কিন্তু—।'

'ব্যাস। আর নয়—।' রুদ্র বললেন, 'চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

শিবানীর দিকে একবার তাকিয়ে কুহেলি পা বাড়ালেন। লিফটের সামনে পৌঁছে রুদ্র বললেন, 'আপনি তো অদ্ভুত!'

'কেন?'

'ওঁকে নিয়ে কি সারারাত কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন?'

'ওহো।' ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে দ্রুত ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লিখে রুদ্রর হাতে দিলেন কুহেলি।

লিফট এসে গেল। ফাঁকা। ভেতরে ঢোকার পর বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হল, ছোট্ট পরিসরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কুহেলির মনে হল এখনই রুদ্র তাঁকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু রুদ্র ভদ্রলোকের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শিবানীর গাড়িতে কুহেলিকে তুলে দিয়ে চিন্তা না করতে বলে হাত নাড়লেন রুদ্র। শিবানীর ড্রাইভার একটু অবাক হয়েছিল। কুহেলি তাকে বললেন, 'মেমসাহেব একটু পরে আসছেন। তুমি আমার বাড়িতে চল।'

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বাড়িতে ফিরতে এত রাত্রে বেশি সময় লাগে না। রাস্তায় একটাও লোক নেই। কুহেলি চোখ বন্ধ করলেন। আজ কি হয়ে গেল? মানুষটার সঙ্গে হঠাৎ কি করে জড়িয়ে গেলেন তিনি। স্বীকার করতেই হবে রুদ্র তাঁকে তীব্র আকর্ষণ করেছে। ওঁর পাশে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ নিজেকে অভিভাবকহীন বলে মনে হচ্ছিল না। এত অল্প জেনে, বলা উচিত, একদম না জেনে কারও সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া কি ঠিক? মাথা নাড়লেন কুহেলি। না। কিছুই ভাববেন না তিনি।

বাড়িতে ফিরে এসে টেলিফোন গাইড থেকে নাম্বার বের করে গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন করে রুদ্র রায়ের ঘরে কানেকশন চাইলেন কুহেলি। ফোন বাজছে।

'হ্যালো। রুদ্র বলছি।'

শিবানীর ঘুম ভেঙেছে?'

'ও, আপনি। না। উনি এখনও একই অবস্থায়।'

'এবার ওকে তুলুন। নইলে ভোর করে ফেলবে।'

'তুলব?'

'মুখে জল দিন ছিটিয়ে।' কুহেলি বললেন, 'আপনি কতক্ষণ জেগে থাকবেন?'

'যথা আজ্ঞা।'

কুহেলি রিসিভার রাখলেন। লোকটির কথা শুনলে মনেই হয় না অত বছর

ফ্রান্সে রয়েছেন। যথা আজ্ঞা! কুহেলি হাসলেন।

রিসিভার রেখে রুদ্র রায় কিছুক্ষণ শিবানীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মাতাল মহিলা বদ্ধ উন্মাদের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। কিন্তু যেচে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।

রুদ্র শিবানীর মাথার পাশে বসে ডাকলেন, 'শিবানী, উঠুন।'

বার চারেক ডাকার পর শিবানীর মুখ নড়ল। কাঁধ ধরে নাড়তেই সে যেন খুব ভয় পেয়ে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠেই কোনদিকে না তাকিয়ে রুদ্রর কোলে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। রুদ্র বেকায়দায় পড়লেন। তিনি এবার বেশ জোরে ওকে ধাক্কা দিতে শিবানী মুখ তুলল। লাল চোখ আধফোলা। রুদ্রকে দেখার চেষ্টা করল। তারপর জড়ানো গলায় কিছু বলল।

'বুঝতে পারছি না!' রুদ্র বললেন।

'ট-টয়লেট— !' মাথা ঝুঁকে গেল শিবানীর।

'চলুন।' টেনে হিঁচড়ে ওকে খাট থেকে নামিয়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন রুদ্র। হাঁটুতে কোন জোর নেই।

টয়লেটের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এবার তো নিজে নিজে যেতে হবে। ধরে ধরে হাঁটুন। পারবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বলল শিবানী।

দরজা খুলে দিতে সে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে গেল।

রুদ্রর মনে হল শিবানী যদি বমি করে তাহলে ভাল হয়, নেশা কেটে যাবে। অথবা ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে কিছুটা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু এই অবস্থায় ওর পক্ষে স্নান করা সম্ভব নয়। দরজা ভেজিয়ে সোফায় গিয়ে বসলেন রুদ্র। তারপর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদে দরজা খুলল। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। জল লেগেছে জামা, শাড়িতে। চারপাশে তাকিয়ে শিবানী জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কুহেলি?'

'রাত হচ্ছে বলে বাড়ি চলে গেছেন।'

'আমাকে ফেলে চলে গেল!' হাত নাড়ল শিবানী।

'আপনি একটু সামলে নিন। আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'হোয়াই? কেন? আমার তো গাড়ি আছে।'

'আপনার গাড়িতে কুহেলি গিয়েছেন।'

'হোয়াই? আমার গাড়িতে কেন গিয়েছে? হু ইজ শী? আমি আমার গাড়িতে যাব। আমি কারও বাড়িতে যাব না। সেলফিশ।'

'শিবানী। উনি আপনার বন্ধু—।'

'কে বন্ধু? কক্ষনো না। শোভনদাকে ও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ভাল হয়েছে। শোভনদা ওকে ছেড়ে গেছে।' মাথায় হাত বোলালো শিবানী, 'আমার কি হয়েছিল? আমার কি খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিছু জানিই না। আপনি লোকটা ভাল।'

'কেন?'

'আমার গায়ে হাত দেননি, অন্য কাজ করলেও টের পেতাম না বোধহয়?'

'কি করে বুঝলেন? আপনার তো হুঁশ ছিল না।'

'কি জানি! আমি কিছু টের পাইনি।'

'টের পাওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। আউট হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেওয়ার মত নীচ আমি নই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। একটা দিন।'

'নো। আপনার শরীর খারাপ হবে।'

'মোটেই না। দেখবেন আমি ফিট হয়ে যাব।'

আঁচলটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সোফায় বসল শিবানী, 'দিন'।

'আপনি নেবেনই।'

'ওয়ান ফর দ্য রোড।'

আধপেগের মতো হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলেন রুদ্র রায়।

'গরম লাগছে না আমার?'

'না তো। এসি চলছে।'

চুমুক দিল শিবানী। তারপরেই নজর গেল রুদ্রর গ্লাসের ওপর, 'ও, আমি ঘুমোচ্ছিলাম আর নিজে আরাম করে খেয়ে যাচ্ছিল!'

'শেষ করুন। বাড়ি যেতে হবে।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে রুদ্রকে দেখতে আরম্ভ করল শিবানী। যদিও তার মাথা এক জায়গায় স্থির নেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল চেষ্টা করছে কিছু ভাবতে।

'কি ব্যাপার?' রুদ্র প্রশ্ন করলেন।

'সত্যি কথা বলবেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার চেয়ে কুহেলিদিকে আপনার বেশি পছন্দ হয়েছে, না?'

হেসে উঠলেন রুদ্র, 'হঠাৎ এমন চিন্তা এল কেন?'

'কুহেলিদি কেন চলে গেল? হয় আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কিংবা যা করেছিল তারপর লজ্জায় আমাকে মুখ দেখাতে পারেনি। ঠিক কিনা? আবার

আমি এতক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকলাম আপনি আমাকে ছুঁয়েও দেখলেন না। কেন? কারণ, আপনি কুহেলিদিকে পেয়ে গেছেন।' কথাগুলো শিবানী বলল অনেক সময় নিয়ে, জড়ানো গলায়, ভেবে ভেবে।

'আপনি যা বললেন তার কোনটাই সত্যি নয়।' রুদ্র হাসলেন।

'ঠিক?' শিবানী ঘাড় বেঁকাল।

'একদম।'

খুশি ফুটল শিবানীর মুখে। গ্লাস টেবিলে নাবিয়ে রেখে দ্রুত সরে এল সে রুদ্রর পাশে, 'তোমাকে কালকে দেখামাত্র আমি প্রেমে পড়ে গেছি।' দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখ নিয়ে গেল সে রুদ্রর মুখের কাছে।

'শিবানী, এখন তোমার নেশা হয়ে গেছে। যা করছ তার জন্য কাল সকালে তুমি আফসোস করবে।' রুদ্র সতর্ক করল।

'একদম না। হয় তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে কুহেলিদিতে ডুবছে। নয় আমাকে আদর করতে হবে।'

'আমার কিন্তু কোন দায় রইল না।'

'একদম না।'

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। শিবানী রিসিভার তুলতে যাচ্ছিল। রুদ্র ইশারায় নিষেধ করে নিজে সেটা তুললেন, 'হ্যালো।'

'বিরক্ত করছি। ও কি এখনও বেহুঁশ?'

'না।'

'ওঃ। কি চিন্তা হচ্ছিল। ও ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ। কথা বলবেন?'

'দিন।'

রিসিভারটা এগিয়ে ধরলেন রুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে কার ফোন বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল শিবানী, 'টয়লেটে যাচ্ছি।'

সটান টয়লেটে ঢুকে গেল সে। রুদ্র বললেন, 'তিনি টয়লেটে চলে গেলেন, অবশ্য আপনি ফোন করেছেন বুঝতে পারার পরে।'

হাসলেন কুহেলি, 'পাগলি। আপনারা এখনই আসছেন তো?'

'চেষ্টা করছি।'

'ওকে বলবেন ওর বাড়িতে আমি ফোন করে বলেছি ও এখানে আছে।' রিসিভার নামিয়ে আবার ডায়াল করে ফ্রন্ট ডেস্ককে রুদ্র অনুরোধ করলেন, 'একটা গাড়ি দরকার। এখনই পাওয়া যাবে?'

'সিওর স্যার।'

টয়লেট থেকে একটু সভ্যভব্য হয়ে শিবানী বের হতেই কুহেলির কথা

শুনিয়ে দিলেন রুদ্র। শিবানী বলল, 'ওটা একটা ছুতো। আমি এখানে এই হোটেলের নির্জন ঘরে আপনার সঙ্গে একা রয়েছি, একি সহ্য হয় কুহেলি সেনের। মনে মনে নিশ্চয়ই ভেবেছে আমি আপনাকে দখল করে নিয়েছি। তাই ডিস্টার্ব করার জন্যে এই রাত্রে ফোন করেছে। মুডটাই নষ্ট করে দিল। বলুন। এখানে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।'

'গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে।'

'গুড।'

লিফটের একটা দেওয়াল জুড়ে আয়না। সেখানে নিজেকে মুগ্ধ হয়ে দেখল শিবানী, 'আচ্ছা আমি কি দেখতে খুব খারাপ?'

'মোটেই না।'

'হ্যাঁ, ডানাকাটা সুন্দরী নিশ্চয়ই নয় কিন্তু ফিগার তো খুব ভাল।'

'অবশ্যই।'

'তবু তো আপনি সন্ন্যাসী হয়ে বসে রইলেন।'

'আজই কি আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়ে যাচ্ছে?'

পুলকিত হয়ে শিবানী থ্যাঙ্কস বলে রুদ্রর গাল স্পর্শ করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লিফটের দরজা খুলে যাওয়ায় নিজেকে সামলে নিল।

কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর রুদ্রর শরীরের সঙ্গে লেপটে বসল শিবানী, 'আবার কবে দেখা হবে? আমি এখন ফ্রি, একদম ফ্রি।'

'কেন?'

'ও তো জাহাজে।'

'যদি উনি জানতে পারেন?'

'কি করে জানবে? তাছাড়া ও যখন কোন পোর্টে নামে তখন কি করছে তা কি আমি জানতে পারছি। কথায় আছে, সব বন্দরে নাবিকদের একটা করে বউ থাকে। ওর তো সাধুপুরুষ হওয়ার কোন কারণ নেই।' হাসল শিবানী।

রুদ্র রায় বললেন, 'এইসময় কলকাতাকে কি শান্ত দেখাচ্ছে, না।'

'অদ্ভুত মানুষ আপনি!'

'কেন?'

'আমি বলছি আমার কথা আর আপনি কলকাতা দেখছেন।'

হাসলেন রুদ্র রায়। তারপর পকেট থেকে কাগজটা বের করে ঠিকানা বলে দিলেন ড্রাইভারকে।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি কুহেলিদি দিয়ে গেছে?'

'বাঃ। আপনাকে পৌঁছে দিতে দরকার হবে ভেবেছিলাম।'

'কেন? আমিই তো বলে দিতাম।'

'তখন তো আপনি বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না।'

'তা অবশ্য।'

গাড়ি যখন কুহেলিদির বাড়ির কাছাকাছি তখন শিবানী বলল, আদুরে গলায় নাকি সুরে বলল, 'এই, কবে দেখা হবে?'

'সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে। আমি আপনার ঠিকানা বা ফোন নাম্বার জানি না। আপনি আমার ঠিকানা জানেন, নাম্বার গাইডে পাবেন।' রুদ্র বললেন।

গাড়ি নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই কুহেলি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, শিবানী হোটেলের গাড়ি থেকে নেমে হনহন করে একটু ওপাশে দাঁড়ানো তার নিজের গাড়ির দিকে গিয়ে দরজা খুলে উঠে বসল। আলো জ্বললো, তারপর গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

রুদ্র নামলেন গাড়ি থেকে, 'উনি বোধহয় বাড়ি চলে গেলেন।'

'তাই মনে হল।' এত রাত্রে জোরে কথা বলতে চাইলেন না কুহেলি।

সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হল কুহেলির। ভদ্রলোক গলা নামিয়ে 'গুড নাইট' বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চলে গেল।

খারাপ লাগছিল কুহেলির। আজ প্রথমবার এ বাড়িতে এলেন রুদ্র কিন্তু ওঁকে বাড়িতে আপ্যায়ন করতে পারলেন না তিনি। পাড়ার লোকজনের কথা দূরে থাক, শেষরাত্রে ওঁকে আপ্যায়ন করলে পাখির প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ভাল হত না!

সকালে শিবানীকে ফোন করেছিলেন কুহেলি। কাজের লোক বলেছিল ঘুমোচ্ছে। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। বেলা সাড়ে দশটায় রুদ্র রায়ের ফোন এল।

কুহেলি অবাক, 'নাম্বার কোথায় পাওয়া গেল?'

হাসলেন রুদ্র, 'হোটেলের অপারেটারের কাছ থেকে। কাল রাত্রে একমাত্র আপনি আমাকে ফোন করেছেন। সহজেই দিতে পারল।'

'ও।'

'ফোন করে বিরক্ত করলাম?'

'না না। মোটেই না। তা কাল আমি চলে আসার পর কেমন কাটল?'

'আর বলবেন না। মহিলারা মাতাল হয়ে গেলে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়। শুনুন, আমি একটু পরে নর্থবেঙ্গলে চলে যাচ্ছি। ওই ডিস্টিলারির ব্যাপারে। হঠাৎই ফোন পেয়ে যেতে হচ্ছে। কাল ফিরব। কাল সন্ধ্যেবেলায় আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

কুহেলি বললেন, 'ফিরে এলে একটা ফোন করবেন। আমি বাড়িতেই থাকব।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। সন্ধেবেলায় আমার এখানে আসবেন। গতরাতে বলতে পারিনি বলে খুব খারাপ লেগেছে।' কুহেলি বললেন।

'বেশ। রাখছি এখন।'

বারোটা নাগাদ ফোন এল শিবানীর, 'কি ব্যাপার?'

'কেমন আছে শরীর?'

'আছে।'

'কেন অত খেতে গেলে! তাও আবার জল না মিশিয়ে।'

'আমার সন্দেহ লোকটা কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল।'

'ওমা, কেন মেশাবে?'

'যাতে আমি আউট হয়ে যাই।'

'তাতে ওর কি লাভ?'

'আমাকে যদি একা পেয়ে যায়, পুরুষদের তো ওই এক ধান্দা।'

'কি যা তা বলছ।'

'ঠিক বলছি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আমার নামে বানিয়ে বলেছে।'

'না না। একদম না।'

'কিছুই বলেনি?' শিবানী যেন স্বস্তি পেল।

'একটাও কথা বলেনি।'

'ও।'

'কেন, তোমার বেহুঁশ অবস্থার অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে নাকি?'

'নাঃ। সেটা নেয়নি।' একটু চুপ করে থেকে শিবানী বলল, 'তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। অন রক্ খেয়েই আমার ওইরকম হয়েছিল, কিছু মেশায়নি।'

'তাই বল। ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল?'

'ঠিক আছে। আমার সম্পর্কে একটু বেশি ইন্টারেস্ট নিয়েছেন। ওঁকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। মানুষটা তো একদম একা। আচ্ছা, রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। রুদ্র রায় তাহলে দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চান? কিন্তু শিবানী প্রথমে ভদ্রলোক সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিল। যেই শুনল উনি কোন খারাপ মন্তব্য করেননি অমনি ওর কথা বলার ধরন বদলে গেল। কেন? খটকা লাগল। কুহেলি ঠিক করলেন, দেখা হলে রুদ্র রায়ের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলবেন।

দশ

দুপুরে খেয়ে উঠতেই ফোন বাজল। হ্যালো বলতেই অমিয়র গলা কানে এল কুহেলির, 'একটা খারাপ খবর আছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল, কথা না বলে অপেক্ষা করলেন কুহেলি।

'আজ সকাল দশটায় মিস্টার পাকড়াশির গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। হলদিয়া মোড়ের কাছে একটা ভারী লরি মুখোমুখি মেরেছে গাড়িটাকে।'

'সেকি!' চিৎকার করলেন কুহেলি।

'মিস্টার পাকড়াশির গাড়িটা চালাচ্ছিল ড্রাইভার, বেশি স্পিড ছিল না।' যেন বাংলা খবর রেডিওতে পড়ছে অমিয়।

'আঃ। কারও কিছু হয়নি তো?' ব্যস্ত হলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ। খুবই খারাপ খবর। মিস্টার পাকড়াশি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন।'

'ও ভগবান!' শিউরে উঠলেন কুহেলি।

'সুজাতা অবশ্য ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।'

'সুজাতা? সুজাতা ওই গাড়িতে ছিল?' অসাড় হয়ে যাচ্ছিলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ। ওরা দীঘায় যাবে বলে বেরিয়েছিল।'

'সুজাতা কেমন আছে? কোথায় আছে?'

'হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর ছেড়ে দিয়েছে। এখন ও লোকাল পুলিশ থানায় আছে। আমি কাছাকাছি পেট্রল পাম্প থেকে ফোন করছি।'

'তুমি, তুমি কোথায় ছিলে?'

'কলকাতায়। থানা থেকে ফোন পেয়ে চলে এসেছি।'

'আশ্চর্য! তখন আমাকে জানাওনি কেন?'

'আপনার ফোন এনগেজড্ ছিল। অপেক্ষা করার সময় ছিল না। রাখি?'

'দাঁড়াও। তোমরা কখন কলকাতায় আসছ?'

'বলতে পারছি না। মিস্টার পাকড়াশির বাড়ির লোকজন এখনও আসেনি।'

'তোমরা চলে এসো। এখনই।'

'সুজাতা যেতে চাইছে না। খুব আপসেট হয়ে আছে।'

'ওকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বল।'

'ও থানায় বসে কেঁদেই চলেছে, আসবে না। রাখছি।'

হঠাৎ কান্না এল। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন কুহেলি। খুব অল্প আলাপ তবু জ্বলজ্যান্ত মানুষটার চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলেন না। এখন

সুজাতা কি করবে। অমিয় ওকে যে অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলেন ভদ্রলোক। উনি না থাকলে ওদের কি হবে? তারপরেই খেয়াল হল সুজাতা ওঁর সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এই খবরটা মিস্টার পাকড়াশির বাড়ির লোক নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে এতক্ষণে। তাই সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে সুজাতার ওপর। সুজাতার সঙ্গে ওঁর যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ওকে দেখাশোনা করেন তা ওরা এতদিন মুখ বুঁজে সহ্য করছিল। এখন এটাকেই ইস্যু করবে। সুজাতার উচিত ওখান থেকে চলে আসা।

ডায়েরি দেখে ফোন করলেন কুহেলি। কাছাকাছি গাড়ি ভাড়া দেওয়ার গ্যারেজ আছে। তাদের কাছে হলদিয়ায় যাওয়ার জন্যে গাড়ি চাইলেন। পাখি শুদ্ধকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়েছে। কাজের লোককে ঘুরে আসছি বলে তৈরি হলেন হলদিয়ায় যাওয়ার জন্যে।

ঝড়ের মতো উড়ছিল গাড়িটা। উলটোদিক থেকে দৈত্যের মতো ছুটে আসা ট্রাকগুলো যখন পাশ দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বুক কেঁপে উঠছিল কুহেলির। শেষ পর্যন্ত হলদিয়ার মোড় এল। এখানে আসার কারণ ড্রাইভারকে বলেছিলেন তিনি। গাড়ি থামিয়ে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে সে বলল, 'ওইখানে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে দিদি। গাড়ির যা ছিল তা থানায় টেনে নিয়ে গিয়েছে। থানায় যাবেন তো?'

মাথা নাড়লেন কুহেলি।

ড্রাইভার চৌকশ। থানার হদিস জানে। সেখানে পৌঁছাতেই মুখ থোবড়ানো ট্রাক আর গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। থানার বারান্দায় উঠতেই অমিয় ছুটে এল, 'আরে! আপনি? এখানে আসবেন বলেননি তো!'

'সুজাতা কোথায়?'

'ওপাশের ঘরে বসে আছে পাথরের মতো।'

'পুলিশ কি ওকে এখানে থাকতে বলেছে?'

'না, বোধহয়।'

'বোধহয়! অদ্ভুত! মিস্টার পাকড়াশির বাড়ির লোকজন এসেছে?'

'এখনও আসেনি।'

'সুজাতাকে ডাকো!'

'কিন্তু ও যেতে চাইছে না। মিস্টার পাকড়াশির ডেডবডির একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছে।' অমিয় বলল।

'পুলিশ জানে তোমরা স্বামী-স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। কি বলেছ পুলিসকে? তোমার স্ত্রী কেন ওঁর গাড়িতে ছিল?'

'বলেছি মিস্টার পাকড়াশির অফিসে চাকরি করে, অফিসের কাজে এদিকে এসেছে।'

'যাক। এই একটা ভাল কথা বলেছ। ও.সি. কোথায় বসেন?'

অমিয় ঘরটা দেখিয়ে দিল। তাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দরজার পর্দা সরিয়ে কুহেলি বললেন, 'এক্সকিউজ মি।'

ওসি সাদা পোশাকে। আর একজন অফিসারকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়েস?'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'অবশ্যই। আসুন। বসুন।'

ছন্দসমেত হেঁটে এসে চেয়ারে বসলেন কুহেলি, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার নাম কুহেলি সেন। একটু কথা আছে।'

ও.সি. অন্য অফিসারটিকে বললেন, 'আপনি বাকিটা কম্প্লিট করে নিয়ে আসুন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

ভদ্রলোক চলে গেলে ও.সি. বললেন, 'বলুন, কি করতে পারি?'

'আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন।'

'ব্যাপারটা বলুন।'

'আমার ছোট মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা প্রচারিত হলে সেটা নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।' ঠোঁট কামড়ালেন কুহেলি।

'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আজ আপনাদের হলদিয়া মোড়ে যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সেই ব্যাপারে বলছি। আমার বড় মেয়ে, ম্যারেড, ওই গাড়িতে ছিল। ওর বসের সঙ্গে অফিসের কাজে এদিকে এসেছিল। খবরটা প্রচারিত হলে, মানুষের মন তো জানেন, অন্য গল্প তৈরি করবে। বড় মেয়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলবে। দিদি যদি ওরকম হয় তাহলে কি বোনকে কি কেউ ঘরের বউ করতে চাইবে? অথচ আমি জানি বড় মেয়ে একেবারে ইনোসেন্ট।'

'এক মিনিট।' হাত তুললেন ও.সি., 'ওই ভদ্রমহিলা, কি যেন নাম।'

'সুজাতা।'

'হ্যাঁ। উনি আপনার মেয়ে?'

'বড় মেয়ে।'

'কী বলছেন আপনি? উনি আপনার মেয়ে? আপনাকে দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।' হাসলেন ও.সি.। বড়জোর ওকে আপনার বোন বলে মনে হয়।'

'ও আমার খুব অল্প বয়সের সন্তান।'

'হুঁ।' ও.সি. বললেন, 'আপনি ঠিক কি চাইছেন?'

'এই কেসের সঙ্গে ও যদি জড়িয়ে যায় তাহলে আমাদের খুব ক্ষতি হবে।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু মিসেস সেন এই অ্যাকসিডেন্টে মিস্টার পাকড়াশি এবং ওঁর ড্রাইভার মারা গিয়েছেন। ট্রাকের চালক এবং খালাসি পালিয়ে গিয়েছে। একমাত্র জীবিত সাক্ষী হলেন সুজাতা দেবী। আদালতে ওঁকে প্রয়োজন হবেই।' ও.সি. বললেন।

কেঁদে ফেললেন কুহেলি। রুমালে ঠোঁট চাপলেন।

—প্লীজ, আপসেট হবেন না।' ও.সি. নরম হলেন।

'কি হবে ভেবে পাচ্ছি না।' কুহেলি বললেন, 'ও সাক্ষী দিলে তো ওঁদের জীবন ফিরে আসবে না, তাই তো?'

'তা ঠিক।' কুহেলির খসে যাওয়া আঁচলের দিকে তাকালেন ও.সি.। হতেই পারে না, এই মহিলা কিছুতেই অতবড় মহিলার মা হতে পারেন না।

'আচ্ছা যদি বলা হয় গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সুজাতার কিছু হয়নি। অথচ দুজন মানুষ মারা গেল। ওর তো না থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন মিস্টার পাকড়াশি। মুখোমুখি সংঘাত তাই ওঁরা মারা গিয়েছেন। পেছনের আসনে থাকায় সুজাতা দেবী ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন।'

'ধরুন, ও পেছনের আসনে ছিল না!'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'তাছাড়া আর একটা কথা, মিস্টার পাকড়াশি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর পর ওঁর চরিত্রে দুর্নাম লাগাটা কি ঠিক?'

'দুর্নাম কেন লাগবে?'

'উনি কলকাতার এতদূরে একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। তারপর আর কি বাকি থাকল?'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন ম্যাডাম।'

'আর ভাবনার কি দরকার? সুজাতাকে নিষ্কৃতি দিন।'

'আমরা তো ওকে ধরে রাখিনি। শুনলাম, উনি নিজে থেকেই যাচ্ছেন না। ওই ডেডবডির জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'সেটা আমি ওকে বোঝাবো, আপনি শুধু ওর নাম বাদ দিয়ে দিন।'

'আপাতত আপনি সুজাতাদেবীকে এখান থেকে নিয়ে যান। মিস্টার পাকড়াশির মেয়ে দিল্লি থেকে বিকেলে কলকাতায় এসেই ওঁর মাকে নিয়ে এখানে চলে আসবেন। ওরা যদি সুজাতাদেবীকে এখানে দ্যাখেন তাহলে কিছু করা মুশকিল হয়ে যাবে। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।' ওসি বললেন।

সোজা হয়ে বসলেন কুহেলি, 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম অফিসার।'

'আমার নাম সুকোমল কর। কৃতজ্ঞতা কেন বলছেন? আপনার মেয়ের অপরাধ যে ওই গাড়ির ব্যাক সিটে বসেছিল। যদি কোন অবৈধ সম্পর্ক থাকত তাহলে ওঁর পাশে মিস্টার. পাকড়াশি বসতেন। তিনি বসেছিলেন সামনের সিটে। এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে সুজাতা দেবী ইনোসেন্ট। অথচ এই মামলায় জড়িয়ে পড়লে তাঁকে দীর্ঘকাল কোর্টে আসা যাওয়া করতে হবে, রিপোর্টাররা প্রশ্ন করবে। উকিলরা ওঁকে কাঠগড়ায় পেলে ওঁর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। আপনার অনুরোধ রাখলে উনি এসব ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন। যান, ওঁকে নিয়ে ফিরে যান।' সুকোমল কর মাথা নাড়লেন।

উঠে দাঁড়ালেন কুহেলি, কলকাতা গেলে আমাদের বাড়িতে এলে খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই। সুজাতা দেবীর টেলিফোন নাম্বার ওর স্বামীর কাছ থেকে নিয়েছি। ফোন করে জেনে নেব। এই দেখুন, সুজাতাদেবীর চরিত্র যদি খারাপ হত তাহলে খবর পাওয়ামাত্র কি ওঁর স্বামী ছুটে এসে ওঁর পাশে দাঁড়াতেন।'

বাইরে অমিয় অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে কুহেলি বললেন, 'তাড়াতাড়ি সুজাতাকে নিয়ে এসো। আমরা এখনই কলকাতায় ফিরে যাব।'

'ও আসতে চাইছে না।'

'আমি যে এসেছি তা ওকে বলেছ?'

'হাঁ।'

'কোথায় ও?'

'আসুন।' অমিয় থানার একটি ঘরে নিয়ে গেল যেখানে সুজাতা ছাড়া আর কেউ নেই। কুহেলির দূর থেকে দেখেই মনে হল মেয়ের মুখে যেন বৈধব্যের ছাপ।

সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম করলেন তিনি, 'ওঠ।'

সুজাতা তাকাল। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মা!'

'কান্নাকাটি বাড়িতে গিয়ে করবে। তোমাকে আদালতের কাঠগড়ায় তোলা হত। অনেক কষ্টে দারোগাকে রাজি করিয়েছি। বাঁচতে চাও তো ওঠ।'

'কিন্তু ওঁর—।'

'ঠাস করে চড় মারব। এমন গর্দভ মেয়ে জীবনে দেখিনি আমি। ওঠ।' হাত ধরে টানতেই মেয়ে উঠে পড়ল।

'আঁচলটা মাথায় জড়িয়ে নাও।'

'কেন?'

'যা বলছি তাই কর।'

সুজাতা বাধ্য হল মাথায় ঘোমটা দিতে। মেয়েকে নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে

উঠে বসলেন কুহেলি। অমিয় বসল ড্রাইভারের পাশে। হলদিয়ার মোড়ে এসে কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা লাঞ্চ করেছ?'

অমিয় মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি টুকটাক খেয়ে নিয়েছি, ও খায়নি।'

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন কুহেলি। সুজাতা কিছু খেতে চাইছিল না। তাকে জোর করে খাওয়ানো হল। সন্ধে হয়ে আসছে। কুহেলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে তাঁর মনে পড়ল ওই দারোগার মুখ। সুকোমল কর বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে সুজাতা ওর মেয়ে। বারংবার তার শরীরের দিকে তাকাচ্ছিল। লোকটা নিশ্চয়ই কলকাতায় গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দেখা করবেন না তিনি। এই শরীরটার জন্যে যে আসবে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। তারপরেই হাসি পেল তার। তিনি যদি শীর্ণা বিগত-যৌবনা হতেন অথবা নিতান্তই বৃদ্ধা, তাহলে কি সুকোমল কর সুজাতাকে ছেড়ে দিত? কক্ষনো না।

'মা।' চাপা গলায় ডাকল সুজাতা।

'এখন কোন কথা নয়। আগে বাড়ি চল।' কুহেলি মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন।

জামাইকে থিয়েটার রোডে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন কুহেলি। মিস্টার পাকড়াশির মৃত্যুর খবর পাখিকে বিচলিত করল না। কিন্তু শুদ্ধ বলল, 'এখন কি হবে?'

কুহেলি তাকালেন, 'কিসের কি হবে?'

'দিদি আবার ফিরে যাবে আগের বাড়িতে?' শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

'ফিরে যাবে কেন? এখন তো থিয়েটার রোডের বাড়িটাই তো ওর বাড়ি। যাও, দিদিকে এখন একটু একা থাকতে দাও।'

এইসময় গাড়ি এল। বাবুলাল গাড়ি পাঠিয়েছে। পাখি শুদ্ধকে বলল, 'নিচে গিয়ে ড্রাইভারকে বলে দে আমি বাড়িতে নেই। ফিরতে রাত হবে।'

শুদ্ধ চটপট নেমে গেল। কুহেলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? বাবুলালের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হল কেন?'

'সব ব্যাপারে খবরদারি করে। যেন আমাকে কিনে রেখেছে। তাছাড়া ওকে আজকাল আমার অসহ্য মনে হয়।' পাখি বলল।

'দেখিস, এরা খুব সহজেই ক্ষতি করতে পারে।'

'করে চেষ্টা করে দেখুক। এখন আমি আর নতুন নই।' পাখি চলে গেল ওপরে। সুজাতা অবাক হয়ে বোনের কথা শুনছিল।

সেটা লক্ষ করে কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বুঝছিস?'

'ও হঠাৎ খুব বড় হয়ে গিয়েছে, না?'

'হ্যাঁ। খুব তাড়াতাড়ি। যাও, এবার স্নানটান করে শুয়ে থাক। একটু বাদে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বে। তোমার অনেক ভাগ্য যে গায়ে আঁচড়ও লাগেনি।'

'আমার চোখের সামনে মানুষদুটো মরে গেল।'

'দেখলে। জীবন দেখতে পাও মরণও দেখা হল। দুটোই সত্যি।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সুজাতা। মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন কুহেলি। মেয়ে মুখ তুলল, 'এখন কি হবে মা?'

ভ্রু কোঁচকালেন কুহেলি, মেয়ে ঠিক কি বলতে চাইছে?

মায়ের মুখ দেখে অনুমান করল সুজাতা, 'থিয়েটার রোডের বাড়িতে যে কী পরিমাণ খরচ হত তুমি ভাবতে পারবে না। ওসব এখন কি করে পারব?'

'তোর নামে কিছু রেখে যায়নি?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন কুহেলি।

'না। একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন দুজনের নামে। আমি সেখান থেকে কখনও টাকা তুলিনি।' সুজাতা বলল।

'খরচ কমাও। অমিয়র যা রোজগার সেইমতো চল।'

'তাহলে গাড়ি বিক্রি করে দিতে হয়।'

'গাড়ি?'

'গত সপ্তাহে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কিনে দিয়েছেন আমাকে। ডেইলি বেসিসে ড্রাইভার রেখেছিলেন। ওটা আর রাখা যাবে না।'

'এখন আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। বিশ্রাম নাও।'

আবাব কাঁদল সুজাতা, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে লোকটা ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। পেছনে বসলে আমার এই দুরবস্থা হত না।'

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুজাতাকে ওর বাড়িতে পৌঁছাতে গেলেন কুহেলি। আজ ছুটির দিন। দরজা খুলল অমিয়। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। যমুনা আজ চমৎকার রান্না করেছে।' অমিয় হাসল, 'বসুন।'

বসে পড়ল সুজাতা, 'যমুনাকে এবার ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

'কেন?' অমিয় অবাক।

'এখন আর তিনশো টাকা দিয়ে কাজের লোক রাখতে পারব না।' সুজাতা বলল।

'এখনই ছাড়াস না। আর কিছুদিন দ্যাখ—!'

'লাভ নেই। খরচ বাড়িয়ে কি দরকার।'

অমিয় বলল, 'যমুনা না থাকলে কাজগুলো কে করবে?'

'বাড়ির ভেতরের কাজ আমি, বাইরের কাজ তুমি!'

'আশ্চর্য! এখানে কোন ফ্ল্যাট ওনার বাজারের থলে নিয়ে বের হয় না। যেটা

পার্কসার্কাস বা টালায় করা যায় সেটা এখানে করা যায় না।'

'তাহলে ওসব জায়গায় ফ্ল্যাট খোঁজ। এটা ছেড়ে দিলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। তোমার মাইনের টাকায় যেটুকু সম্ভব সেটুকুই করতে হবে।' সুজাতা ভেতরে চলে গেল।

অমিয় বলল, 'কি মুশকিল!'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চাকরির বাইরে পার্টটাইম কিছু করতে পার না?'

'আমি করি। রাত নটার আগে তো বাড়ি ফিরি না। অফিস থেকে বেরিয়ে আর একটা অফিসে গিয়ে খাতা লিখি। কিন্তু তাতে তো—। আচ্ছা, দেখি অন্য কিছু যদি করা যায়!' অমিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে কুহেলির মনে হল ও বলার জন্যে কথাগুলো বলল।

হঠাৎই রুদ্র রায়ের কথা মনে এল। রুদ্র তো বিশাল বিশাল ব্যবসা করার দিকে এগোচ্ছে, কলকাতাতেও অফিস খুলবে, সেখানে অমিয়কে পার্ট টাইমের জন্যে নিতে নিশ্চয়ই পারে। রুদ্রর তো আজই ফেরার কথা। গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন করলে জানা যাবে রুদ্র ফিরেছে কিনা। উঠতে যাচ্ছিলেন কুহেলি এইসময় বেল বাজল।

অমিয় বলল, 'এসময় আবার কে এল!'

'বসে আছ কেন, উঠে দ্যাখো।' বিরক্ত হলেন কুহেলি।

অমিয় দরজা খুলতে একজন মহিলার গলা শুনতে পেলেন কুহেলি, 'আপনি এই ফ্ল্যাটে থাকেন?'

অমিয় মাথা নাড়ল।

'আমি কিছু কথা বলতে এসেছি।'

অমিয় সরে দাঁড়াতে বছর চব্বিশের একটি সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে ভেতরে ঢুকল। তার পেছনে লম্বা স্বাস্থ্যবান যুবক।

মেয়েটি কুহেলির দিকে তাকাল, 'নমস্কার। বসতে পারি?'

কুহেলি সোজা হলেন, 'আপনারা?'

'আমি মুক্তো পাকড়াশি, ও আমার বন্ধু প্রীতম।' মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার বাবা গতকাল একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন।'

'ওহো! আপনি মিস্টার পাকড়াশির মেয়ে? দিল্লিতে থাকেন?' অমিয় চেনা মানুষকে আবিষ্কার করার গলায় বলে উঠল।

'ইয়েস। আমার মা হাউসওয়াইফ। তাঁর পক্ষে বাবার বিষয় সম্পত্তি কী আছে না আছে দেখে শুনে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমাকেই কাজটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটটা ঠিক কত স্কোয়ার ফিট?' মুক্তো জিজ্ঞাসা করল।'

কুহেলি কিছু বলার আগেই অমিয় বলে উঠল, 'ভেতরটা আঠারোশোর কাছাকাছি।'

'আচ্ছা!'

'এসব কথা জিজ্ঞাসা কেন করছেন জানতে পারি কি?' কুহেলি মুখ খুললেন।

'অফকোর্স! বুঝতেই পারছেন, থিয়েটার রোডের ওপর অত বড় ফ্ল্যাট আমরা ফেলে রাখতে পারি না। তবে আপনারা বাবার পরিচিত মানুষ। খুব প্রেসার দিতে চাই না। এই ফ্ল্যাট খালি করে দিতে কতদিন সময় চাই বলুন।' সরাসরি বলল মুক্তো।

অমিয় হাঁ হয়ে গেল। কুহেলি হাসলেন, 'ভাই আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি তো না বোঝার কথা কিছু বলিনি। আমার বাবা এই ফ্ল্যাটের মালিক। তিনি আপনাদের থাকতে দিয়েছিলেন। উনি এখন নেই, আমরা চাই না আপনারা থাকুন।'

'ও। আপনার বাবা গতকাল মারা গিয়েছেন। ওর পোস্ট মার্টেম কি হয়ে গেছে?'

'না। আজ ছুটির দিন বলে হয়নি। আগামীকাল রিপোর্ট পাওয়া যাবে।'

'তার মানে ওঁর শেষ কাজ এখনও হয়নি।'

'না।'

'আমি খুব অবাক হচ্ছি, এরকম শোকের সময় আপনারা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? মানুষটার জন্যে শোক পালন করার কথা মনে এল না?' কুহেলি বললেন।

'না। আসেনি। কারও জন্যে মানুষ শোকার্ত হয় যখন সে জীবিত কালে শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করে। তাছাড়া—।' বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল মুক্তো, 'আমরা বাধ্য হয়ে আপনাদের কাছে আজ এসেছি।'

'বাধ্য হয়ে? কেন?'

'কারণ আপনাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার কোন কারণ নেই।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'আমার কাছে খবর আছে, আমরা থানায় যাওয়ার আগে আপনারা সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। আপনারা চেষ্টা করলে গতকালই ওঁর পোস্টমর্টেম করানো যেত। কিন্তু বাবার মৃত শরীরকে ওখানে ফেলে রেখে দায় এড়াতে চলে এসেছিলেন আপনারা।'

'কে বলেছে এসব কথা?' কুহেলির নিজের কানেই গলার স্বর অন্যরকম ঠেকল।

প্রীতম এতক্ষণে কথা বলল, 'দুজন কনস্টেবল বলেছে।'

'ও.সি. কি বলেছেন?'

'উনি মিথ্যে কথা বলেছেন। অ্যাকসিডেন্টের সময় গাড়িতে ড্রাইভার আর বাবা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমরা কনস্টেবলের কথা বলতে উনি বললেন, গাড়িতে কোন মহিলা ছিল এটা প্রচার হলে আমার বাবার চরিত্র নিয়ে নোংরা কথা কাগজগুলো লিখবে। এতে নাকি আমাদের পরিবারের ইজ্জত নষ্ট হবে।' মুক্তো বলল।

'কথাটা কি ভুল? উনি চলে গিয়েছেন, ওর আর কি অসুবিধে হবে, হবে তো তোমাদের। আর যে গাড়িতে ছিল তার।' কুহেলি বললেন।

'আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে জীবিত অবস্থায় বাবা আমাদের পরিবারের ইজ্জত নিয়ে যেন খুব মাথা ঘামাতেন। উনি যাচ্ছিলেন দীঘায় ফুর্তি করতে। অ্যাকসিডেন্ট না হলে সেটা জানাই যেত না।'

'তোমাকে কে বলল উনি দীঘায় যাচ্ছিলেন।'

'আশ্চর্য! বাবা ছাড়া আর একজন ওই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। সেই ড্রাইভার তার স্ত্রীকে বলে গিয়েছিল সে সাহেবের গাড়ি চালিয়ে দীঘায় যাচ্ছে। যাক গে। বুঝতেই পারছেন আপনাদের জন্যে আমাদের কোন সহানুভূতি নেই। আপনারা পনেরো দিনের মধ্যে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবেন। ও কে?' মুক্তো সোজা হল।

অমিয় অসহায় গলায় বলল, 'কী আশ্চর্য! আমরা নিজেদের ফ্ল্যাটে ছাড়ব কেন?'

'সরি মিস্টার। আপনাদের এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল মানে এই নয় যে ফ্ল্যাটটা আপনাদের হয়ে গেল।'

'না। এটা আমাদেরই ফ্ল্যাট।' জোর গলায় বলল অমিয়।

'আপনিও কি আপনার স্বামীর সঙ্গে একমত?' কুহেলিকে জিজ্ঞাসা করল মুক্তো।

'স্বামী? মাই গড্! ও আমার জামাই, স্বামী নয়।'

'আপনার জামাই?' প্রীতমের দিকে তাকাল মুক্তো।

প্রীতম বলল, 'তার মানে আপনার মেয়ে—।'

'সুজাতা। সুজাতার স্বামী ও।' কুহেলি গম্ভীর গলায় বললেন।

'দেন আই অ্যাম সরি। আপনাকে দেখে বোঝা যায় না ওঁর স্ত্রী হওয়ার মতো মেয়ে থাকতে পারে। আপনার জামাইকে একটু বুঝিয়ে বলুন।' মুক্তো বলল, 'এখনও আমি ডিটেলস জানি না, তবে ফ্ল্যাট এবং গাড়ির কথা জানি।'

কুহেলি বললেন, 'আপনি ভুল জানেন। এই ফ্ল্যাট আমার মেয়ের নামে লীজ নেওয়া হয়েছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে যে দলিল তৈরি হয়েছে তাতে সুজাতারই নাম আছে, মিস্টার পাকড়াশির কোন অস্তিত্ব সেখানে নেই। গাড়িটাও আমার মেয়ের নামে কেনা হয়েছে। সন্দেহ থাকলে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

আরও নিঃসন্দেহ হতে চাইলে উকিলের কাছে যান, কেস করুন।'

প্রীতম খুব অবাক হয়ে বলল, 'এগুলো আঙ্কল আপনার মেয়েকে গিফ্‌ট করেছেন? কিন্তু একথা তিনি কাউকে জানাননি!'

'না গিফট নয়। লীজ নিয়েছে আমার মেয়ে।'

'টাকাটা কে দিয়েছে?' প্রীতম জিজ্ঞাসা করল।

'ক্যাশে পেমেন্ট করা হয়েছিল যখন তখন ধরে নিতে হবে সুজাতাই করেছিল। কারণ দলিলের কোথাও মিস্টার পাকড়শির নাম নেই।'

'দলিলটা একবার দেখতে পারি?' প্রীতম উঠে দাঁড়াল।

'আমার মনে হয় আপনারা বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে দেখুন, সেটাই ভাল হবে। এতক্ষণ যেসব কথা বললেন তারপর দলিল দেখাতে আমাদের ইচ্ছে নাও হতে পারে।'

ঠোঁট কামড়াল মুক্তো। প্রীতম তার কাঁধে হাত রাখল, 'প্লীজ।'

মুক্তো বলল, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না। ও খুব আপসেট।'

'ও।'

ওরা বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে অমিয় হাসিমুখে বলল, 'ওঃ, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনি একেবারে উকিলের মতো কথা বলে ম্যানেজ করলেন।'

'তোমার বউকে ডাকো।'

'অ্যাঁ।'

'কানে কম শুনছ নাকি?'

'ও। হ্যাঁ।' ভেতরে চলে গেল আমিয়। একটু পরে সুজাতা এল। একাই।

'বল।' সুজাতা ওপাশের সোফায় বসল।

'শুনেছিস?'

'হ্যাঁ। কী লজ্জা!'

'মানে?'

'মনে হচ্ছিল ওর বাবাকে ঠকিয়ে আমি সব দখল করে নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি কিছুই চাইনি, উনি নিজে থেকেই এসব দিয়েছেন।'

'এই ফ্ল্যাট আর গাড়ি ছাড়া আর কি কি দিয়েছেন?'

'কিছু গয়নাগাঁটি আছে।'

'কোথায়?'

'ব্যাঙ্কের লকারে।'

'সেটা কার নামে?'

'আমি জানি না।'

'কাগজপত্র কার কাছে?'

'ওঁর কাছে ছিল। শুধু চাবি আর একটা নাম্বার আমাকে দিয়েছিলেন।'

'ব্যাঙ্কটা কোথায়?'

'তিন চারটে বাড়ির পরে।'

'সব কাগজপত্র যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেটারও, বের করে রেখ। কাল সকাল দশটায় ব্যাঙ্কে যাবে অমিয়কে নিয়ে। লকার থেকে সব বের করে নিয়ে আসবে আর জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যে টাকা রাখলে নয় তা রেখে বাকিটা তুলে নেবে।'

'না।'

'না মানে?'

'ওকে নিয়ে আমি যাব না?'

'কেন?'

'মিস্টার পাকড়াশি পছন্দ করতেন না।'

'বলেছিলেন?'

'মুখে বলেননি, বুঝতে পারতাম। উনি এই বাড়িতে এলে ও সামনে আসত না। কেঁচোর মতো লুকিয়ে থাকত অথবা বেরিয়ে যেত। এটা ওঁর পছন্দ হত না।

'তা এখন তো লোকটা নেই। তোর একার পক্ষে কি এত কাজ করা সম্ভব হবে? একজনের তো সঙ্গে থাকা দরকার।'

'তুমি এসো।'

'আবার আমাকে টানবি?'

'এখানে দুপুরে খেয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে, তোকে ফোন করব। আজ উঠছি।'

'চা খাবে না?'

'না।'

'আচ্ছা, ওসব কি করতেই হবে?' সুজাতার গলায় দ্বিধা।

'কি সব?'

'ওই লকার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট?'

'ওগুলো যদি জয়েন্ট নামে থাকে তাহলে ওরা আপত্তি করলে তুই কিছুই পাবি না। মিস্টার পাকড়াশি তোকে যা দিতে চেয়েছিলেন তা তুই হাতছাড়া করবি কেন? ওরা ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা জানার আগেই তোকে যা করার করতে হবে।' কুহেলি বললেন, 'অমিয়কে ডাক, বল, ট্যাক্সি ডেকে দিতে।'

এগারো

মেয়ের ব্যাপারটা মাথা থেকে যাচ্ছিল না। ট্যাক্সিতে বসে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, হঠাৎ গ্র্যান্ড হোটেলটাকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। তারপর ভাড়া মিটিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লেন। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানলেন, রুদ্র রায় একটু আগে ফিরেছেন, ঘরেই আছেন। লিফটে চড়ে ওপরে উঠে এসে রুদ্র রায়ের ঘরের দরজার বেল বাজালেন কুহেলি। দ্বিতীয়বার বাজানোমাত্র দরজা খুলল। একটা বড় সাদা তোয়ালে কোমরে জড়ানো, বাকি শরীর উন্মুক্ত। বুক ভর্তি ঘন কালো লোম। তাঁকে দেখতে পেয়ে রুদ্র চিৎকার করলেন, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ!' তারপর দুহাতে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে একটা পাক খেয়ে নিলেন।

কুহেলি চিৎকার করলেন, 'আরে, একি! পড়ে যাব, পড়ে যাব।'

নিচে নামিয়ে বিপুল বেগে চুমু খেলেন রুদ্র রায়, 'লাকি গার্ল!'

'এই, আমি আর মোটেই গার্ল নই।'

'না। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত গার্লই থাকবে।'

'হঠাৎ এত আবেগ কেন?'

'সাকসেসফুল। সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল। জমি পেয়ে গেছি। সামনের মাসেই ডিস্টিলারির বাড়িঘর তৈরি শুরু হবে। স্কটল্যান্ড থেকে যে ব্লু প্রিন্ট এনেছি হুবহু সেইরকম। লেটস সেলিব্রেট।' রুদ্র রায় হাতদুটো দুদিকে বাড়ালেন।

'কি রকম?'

'কলকাতায় বেস্ট রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে সেরা ডিনার খাওয়াবো, তোমাকে।'

'আমি কেন?' চোখে চোখ রাখলেন কুহেলি।

'তুমি আসার পর আমার সব জট আচমকা খুলতে আরম্ভ করেছে।'

'পাগল।'

'ওয়েল, তোমার জন্যে পাগল হলে আর একবার জন্মাতে পারি।'

'আচ্ছা, লোকে শুনলে কি বলবে? মাত্র দু দিনের আলাপ, তৃতীয় দিনে এমন সব কথা বলছ যা সবাই দু-তিন বছর সম্পর্ক হওয়ার পরে বলে।'

'ওটাই তো আমার কৃতিত্ব। দু-তিন বছরকে দু-তিনদিনে এনে ফেলেছি।'

'আর কতক্ষণ এই পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা হবে?' কুহেলি আঙুল তুলে রুদ্র রায়ের তোয়ালে দেখালেন।

'ওঃ হো। পাঁচ মিনিট সময় দাও, তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তারপর কোথায় যাবে ঠিক করে নাও।' বাথরুমের দিকে এগোলেন রুদ্র রায়।

'অসম্ভব।' কুহেলি বললেন।

'কেন?' ঘুরে দাঁড়ালেন রুদ্র।

'আমি সেই দুপুরে বেরিয়েছি। এতক্ষণে চেহারা যা হয়েছে তা বুঝতে পারছি। তাছাড়া দুপুরের এই তাঁতের শাড়ি পরে রাত্রে কেউ ডিনারে যায়?'

'ওহো। তাই!' রুদ্র রায় বললেন, 'আসলে তোমাকে এখন এত ক্যাজুয়াল দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তোমার বাড়িতে চল। টেক ইওর টাইম। সেজেগুজে বের হবে। এখনও তো অনেক সময় আছে।' রুদ্র রায় বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

সারাদিনের সব উদ্বেগ, ক্লান্তি মুহূর্তে উধাও। সোফায় বসলেন কুহেলি। মনে হচ্ছিল অপূর্ব এক ভাল লাগার টলটলে পুকুরে তিনি দুলছেন। রুদ্র রায় তাঁর চোখে দেখা একদম আলাদা ধরনের মানুষ। শরীরটাই বড়, মনটা শিশুর মতো নরম। আজ হঠাৎ তাঁর মনে হল নির্ভর করার মতো মানুষ তার পাশে এতদিন ছিল না, এখন পেয়েছেন।

কিন্তু রুদ্রকে কি সুজাতার সমস্যার কথা বলা যায়? মিস্টার পাকড়াশি সুজাতার জীবনে কিভাবে এলেন এই প্রশ্নের জবাবে তিনি কী বলবেন? কখনই কি বলতে পারবেন মেয়েকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনিই ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়ের উপকার করার চেষ্টাটা রুদ্রর কাছে খারাপ লাগতে পারে। আর অমিয়র অবস্থান যে রকম ছিল তাতে ওকে শ্রদ্ধা করার কারণ নেই। সেক্ষেত্রে অমিয়র কাজের জন্যে ওকে অনুরোধ করা যাবে না।

রুদ্র রায় বেরিয়ে এলেন সিল্কের পাজামা পাঞ্জাবি পরে। একটু লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, 'অনেকদিন পরে এই পোশাক পরলাম। ওদেশে তো পরাই হয় না।'

'চমৎকার দেখাচ্ছে।' কুহেলি বললেন।

খাটে বসলেন রুদ্র রায়, 'ক্ষিদে পেয়েছে?'

'অ্যাঁ।' ধাতস্থ হলেন কুহেলি, 'ও, হ্যাঁ, সামান্য।'

'ওই রিসিভার তুলে—।'

'আমি পারব না।' উঠে রিসিভারটা রুদ্রর কাছে এনে দিলেন কুহেলি।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' হাসলেন রুদ্র রায়, তারপর খাবারের অর্ডার দিলেন।

কুহেলি বললেন, 'তাহলে এখন অনেক টাকা ঢালতে হবে।'

'ব্যবসার তো সেটাই নিয়ম। ঠিকঠাক প্রজেক্টে যত টাকা ঢালবে তত লাভ হবে। অবশ্য অপচয়টা আটকাতে হবে।' রুদ্র বললেন, 'এখানে এসে বসো, প্লিজ।'

'কেন?'

'বাবা! থাক। ওখানেই থাকো।'

কুহেলি উঠলেন। রুদ্রর পাশে বসামাত্র দুটো হাত তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

কুহেলি চাপা গলায় বললেন, 'এই, কি হচ্ছে!'

'তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

'উঁহু, কাজের কথা হচ্ছে এখন।'

'পরে হবে।'

'এখনই খাবার এসে যাবে।'

দুহাতে কুহেলির মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে কয়েক সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে দেখে ঠোঁট নামালেন রুদ্র রায়। কুহেলির মনে হল, অনন্তকাল, এত সময় ধরে যে চুম্বন করা যায় তা তিনি জানতেন না।

শেষ পর্যন্ত মুখ সরিয়ে বললেন, 'ডাকাত। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।'

হো হো করে হাসলেন রুদ্র রায়, 'আমার মনে হচ্ছে রেকর্ডটা করা যায়।'

'কিসের রেকর্ড?'

'গীনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে দুজন নারী পুরুষ সবচেয়ে বেশি সময় চুম্বন করেছেন তাঁদের নাম আছে। সেই রেকর্ডটা ভাঙতে হবে।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিসমাস আসছে, সান্তার কাছে বর চাও, তিনি তোমাকে একটি ঠিকঠাক পার্টনার পাঠিয়ে দেবেন।' কুহেলি হাসলেন।

'তুমি সান্তার গল্পটা জানো?'

'কোন্ গল্প?'

'ওই যে, একটা বাচ্চা ছেলের মনে খুব দুঃখ, তার কোন ভাই বা বোন নেই। সে কেবলই তার মাকে বলে একটা ভাই বা বোন এনে দাও। মা এড়িয়ে যায়। তখন সে ভাবল মাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কি করে পৃথিবীতে এল। প্রশ্ন শুনে মা হেসে বলল, 'ক্রিসমাসের আগে সান্তাক্লজের কাছে চেয়েছিলাম, তিনি তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড়দিনের আগের রাত্রে ছেলেটি ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটা চিঠি লিখল, 'মাই ডিয়ার সান্তা, তুমি প্লীজ সেন্ড মি এ ব্রাদার।' পরের ভোরে ঘুম ভাঙতেই সে রঙিন খাম দেখতে পেল। সান্তা ওর চিঠির উত্তর দিয়েছেন। মাত্র একটি লাইন, সেন্ড মি ইওর মাদার।'

রুদ্র রায় গল্প শেষ করতেই কুহেলি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইস, কী অসভ্য!'

খাবার এল। সঙ্গে চা। কুহেলি চা তৈরি করার সময় শুনলেন কোন অসুখ না থাকা সত্ত্বেও রুদ্র রায় চিনি বা দুধ না নিয়ে শুধু লিকার খান। ওঁর ভাল লাগল।

খাওয়ার পর আবার ব্যবসার কথা উঠল। রুদ্র রায় বললেন, 'সেদিন একটা নতুন ধরনের প্রজেক্টের কথা বলছিলাম, তুমি খেয়ালে রাখোনি।'

'কি?' কুহেলি তাকালেন।

'দ্যাখো, এদেশের নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিক ব্যাপারে

খুব টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। বেশিরভাগ মানুষের খরচ রোজগারের থেকে বেশি অথচ তাঁদের সামনে কোন পথ খোলা নেই। সরকারের এত সমস্যা যে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁদের নেই। এই নিয়ে আমি অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম। এই যে আমরা জাহাজের মাল খালাস করার জন্যে বা অন্য কোন বৃহৎ ব্যবসায় চটজলদি ঋণ দিই এর সঙ্গে যদি সাধারণ মানুষকে ইনভলভ করি তাহলে কেমন হয়?' রুদ্র রায় খুব ভেবে ভেবে কথাগুলো বলছিলেন।

'তুমি কত লোককে ঋণ দিতে পার? আর দিলে তাদের পক্ষে তা শোধ করা তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।' কুহেলি বললেন।

'না। ওদের আমরা লোন দেব কেন? বরং ওদের কাছ থেকে টাকা নেব। নিয়ে আমাদের ব্যবসায় খাটাবো। আমাদের এখানে বছরে শতকরা দুশো ভাগ লাভ হচ্ছে। ওরা টাকা খাটালে তার অংশ পাবে।'

'বাঙালি ব্যবসা করবে? অসম্ভব। কোনো ঝুঁকিতে কেউ যাবে না।'

'তাই? বেশ! ধরো, একজন নিম্নবিত্ত মানুষ তার সঞ্চয়ের দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক বা পোস্টঅফিসে রেখেছে। একবছরের জন্যে রাখলে সে বছরে বড়জোর পাঁচ পার্সেন্ট সুদ পাবে। অর্থাৎ পাঁচশো টাকা বছরে। এই সত্তর সালে তাতেই ওরা খুশি। আমি যদি বলি আপনি এই ব্যবসায় দশ হাজার টাকা রাখুন আমি আপনাকে মাসে চারশো টাকা দেব। অর্থাৎ বছরে চার হাজার আটশো টাকা। আপনার কোন ঝুঁকি নেই। যখন ইচ্ছে টাকা তুলে নিতে পারবেন। ব্যাঙ্ক যেখানে পাঁচশো দেবে সেখানে আমি দেব চার হাজার আটশো উইদ ফুল নিরাপত্তা। তোমার কি মনে হয় এতে সাড়া পাওয়া যাবে না?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'এত টাকা দিতে পারবে?' অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি।

'অবশ্যই। আমি যদি দশ হাজার টাকা খাটিয়ে বছরে কুড়ি হাজার টাকা সুদ পাই তাহলে চার হাজার আটশো দিতে আপত্তি করব কেন? তাছাড়া ওদের টাকা আমি খাটাচ্ছি, আমার তো পুরোটাই লাভ।'

'তাহলে হৈ হৈ পড়ে যাবে। কিন্তু লোকে তো গ্যাবান্টি চাইবে।'

'নিশ্চয়ই। চাওয়াটা তো স্বাভাবিক। এই জন্যে আমি এক কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গ্যারান্টি মানি হিসেবে রাখব। আমার যে অসৎ উদ্দেশ্য নেই, সাধারণ মানুষের উপকার করতে চাই তা ওই টাকা রাখায় প্রমাণিত হবে।'

কুহেলি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, 'আমিও কিছু টাকা রাখব।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'কি রকম?'

'আমি ধর্মতলা স্ট্রিট-এ একটা বড় অফিস নিচ্ছি। বুঝতেই পারছ। প্রচুর লোক কাজ করবে সেখানে। তোমাকে ওখানে বসতে হবে।'

'আমি? আমি কি করব?'

'কয়েকজন ডিরেক্টারের একজন হবে তুমি। অফিসের কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তোমাকে দেখতে হবে। এনি প্রব্লেম, আমার সঙ্গে যোগাযাগ করবে।'

'সর্বনাশ! আমি কি পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে! আরে তুমি তো অ্যাকাউন্টস করছ না। সেসবের জন্যে এফিসিয়েন্ট লোকজন থাকবে। তুমি আমার লোক হিসেবে যা করবে তা তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব।' রুদ্র রায় বললেন, 'কিন্তু তোমার সময় আছে তো?'

'তোমার জন্যে পৃথিবীর সব সময় দিয়ে দেব।'

রুদ্র রায় ঈষৎ ঝুঁকে কুহেলির কাছে মুখ নিয়ে আসতেই এবার কুহেলি তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। রুদ্রু আর একটু এগিয়ে যেতে চাইলে কুহেলি মৃদু আপত্তি জানালেন, 'না এভাবে নয়।'

'তাহলে কি ভাবে?'

জিজ্ঞাসা করা মাত্র বেল বাজল। কুহেলি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন,—'দেখলে তো!'

খুব বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন রুদ্র রায়, 'আরে!'

'বিরক্ত করলাম?'

'না না। আসুন।'

'কুহেলিদি কি এখানে?'

শিবানীর গলা শুনতে পেয়ে দ্রুত রুমালে মুখ মুছে নিলেন কুহেলি। ঘরে ঢুকল শিবানী, 'ঠিক ধরেছি। তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে সেই থেকে কত খুঁজে মরছি। বাড়িতে ফোন করলাম, শুদ্ধ বলল তুমি বড় মেয়ের সঙ্গে বেরিয়েছ। ওর কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে সেখানে ফোন করে শুনি, খানিক আগে বেরিয়ে গেল। তখন ভাবলাম, এখানে এলে তোমাকে ঠিক পেয়ে যাব।'

শিবানীর গলার স্বরে যে উত্তেজনা সেটাকে বেশ সাজানো বলে মনে হল কুহেলির। বললেন, 'হঠাৎ এত খোঁজাখুজি কেন?'

'শোভনদা খুব অসুস্থ।' করুণ মুখ করল শিবানী।

'আশ্চর্য!'

'কেন অসুস্থ সেটা শোন আগে। আগ্রার এক হোটেলে ওঁর বুকে ব্যথা হয়। সঙ্গে একটি অল্পবয়সী পাঠিকা ছিল। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেখে সে হোটেল কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে উধাও হয়ে যায়।'

'শোভনদা কে?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি চিনবেন না। বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক।'

'সঙ্গের মহিলা পালিয়ে গেলেন কেন?'

'ধরা পড়ার ভয়ে। শোভনদার হাঁটুর বয়সী মেয়ে। ফষ্টিনষ্টি করতে আগ্রায় গিয়েছিল বাপের বয়সী লোকের সঙ্গে। তুমি ঠিকই বলেছ কুহেলিদি। পুরুষমানুষগুলোর কোন চরিত্র নেই।' বলেই শিবানী জিভ বের করল, 'সরি, আমি আপনাকে আলাদা রাখছি।'

'আমাকে আলাদা রাখার কারণ কি? আমি পুরুষ নই বলে মনে হচ্ছে?'

'তা নয়। হাতের পাঁচ আঙুল তো সমান হয় না।'

'তা ভদ্রলোক এখন কেমন আছেন?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'একটু ভাল বলে শুনলাম। দিল্লিতে আছেন।'

'এই খবরটা আমাকে দেওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হলে কেন?' কুহেলি তাকালেন।

'তুমি তো চিনতে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তাই ভাবলাম তোমাকে বলি। শুনে দুঃখের বদলে আমার অবশ্য খুব রাগ হচ্ছিল!' শিবানী বলল।

'কেউ অসুস্থ এই খবর পেয়ে আপনার রাগ হচ্ছিল?' রুদ্র রায় অবাক হলেন।

'এই শোভনদারা মেয়েমানুষ ছাড়া থাকতে পারে না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পনেরো, কোন বয়সেই এঁদের আপত্তি নেই। ওই বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে বাইরে গিয়েছেন নিজের বয়স কত তা ভুলে গিয়ে। ঠিক হয়েছে। লাম্পট্যের একটা সীমা থাকা দরকার,' শিবানী বলল।

কুহেলি মাথা নাড়লেন, 'তুমি অন্য একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে চর্চা করছ।'

'আমাদের চেনা মানুষেরই এই অচেনা চেহারা নিয়ে কথা বলতে পারব না?'

'যদি তোমার স্বার্থে আঘাত লাগে তাহলে নিশ্চয়ই পারবে। শোভনবাবুর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই সেরকম সম্পর্ক ছিল না!' গম্ভীর গলায় বললেন কুহেলি।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শব্দ করে হেসে উঠল শিবানী, 'দিলে জল ঢেলে। কোথায় ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা হলে আবার খাওয়ার মতো ব্যাপারটা আলোচনা করব, তুমি পাত্তাই দিচ্ছ না। ঠিক আছে, চলি।'

'জরুরি কাজ আছে?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'মানে?' শিবানী তাকাল।

'হঠাৎ আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম—।'

'আমাকে তো আপনি ডাকেননি—।'

'আমিও তো কুহেলিকেও ডাকিনি। সম্পর্ক ভাল থাকলে ফর্মালিটিসের কি কোন প্রয়োজন হয়? কোন কাজ না থাকলে বসুন, আড্ডা মারুন।'

'কী জানি! ভাবলাম, আমি কাবাবমে হাড্ডি না হয়ে যাই।'

কুহেলি রেগে গেলেন, 'আমাদের কাবাব ভাবছ কি করে?'

রুদ্র রায় হাত তুললেন, 'নো মোর ঝগড়া। আজ আমার খুব ভাল দিন। ভেবেছিলাম দারুণভাবে সেলিব্রেট করব কোথাও গিয়ে। কিন্তু কুহেলি তৈরি হয়ে আসেননি, বললে আপনিও তৈরি হতে চাইবেন। অতএব নোটিশ দিয়ে অন্য আর একটা দিন করা যাবে। আজ আমার এই ঘরেই উৎসব করা যাক।'

'কি রকম?' শিবানী বসে পড়ল সোফায়।

'আপনার জন্যে রয়্যাল স্যালুট।'

'এম্মা। না—না।'

'রয়্যাল স্যালুট নেবেন না।'

'আমি যোগ্য নই। কুহেলিদিকে দিন।'

রুদ্র রায় হাসলেন 'আপনার কথা শুনে একটা জোক মনে এল। সর্দারজীদের নিয়ে অনেক জোকস তৈরি হয়েছে, যদিও ওঁদের বোকা ভাবার কোন কারণ নেই। সম্ভবত ওঁদের পাগড়ি দেখে কেউ কেউ ভেবেছে বুদ্ধি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তারই একটা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একটি সর্দারজীও দাঁড়িয়ে ছিল। প্ল্যাটফর্ম নম্বর তিন। স্টেশনের মাইকে ঘোষণা করা হল অমৃতসর মেল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। শোনামাত্র সর্দারজী ল্যাফিয়ে ট্রেন লাইনে নেমে গেল। এদিকে দূরে ট্রেন দেখা দিয়েছে। যাত্রীরা চেঁচালেন, 'ও সর্দার, তাড়াতাড়ি উঠে এসো, ট্রেন আসছে।' সর্দার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'জানি, একটু পরে তোমরা সবাই ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে মরবে।'

একজন যাত্রী চিৎকার করল, 'আমরা মরব?'

'আলবৎ। শুনলে না, মাইকে বলল, অমৃতসর মেল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। তোমরা তো সবাই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছ!'

বলার ধরনটা এমন ছিল, শিবানী তো বটেই, কুহেলিও হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে কুহেলি বললেন, 'গল্পটা কি কারণে মনে এল?'

রুদ্র রায় উঠলেন। তারপর দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা বোতল এনে টেবিলে রাখলেন যার গায়ে লেখা রয়েছে, 'রয়্যাল স্যালুট!'

'ওমা।' শিবানী চিৎকার করে উঠল, 'এই রয়্যাল স্যালুট! এর নাম আমি অনেক শুনেছি, আজ চোখে দেখলাম।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন, কুহেলিকে দিতে, নিজে স্যালুট নেবেন না।'

'আমি কি করে বুঝব?' শিবানী লজ্জা পেল।

'হ্যাঁ। সর্দারজীও বোঝেনি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসা মানে প্ল্যাটফর্মের গায়ের লাইনে আসবে, ওপরে উঠবে না।' রুদ্র রায় বললেন।

'ও কুহেলিদি, দ্যাখো, আমাকে সর্দারজী বলল।' শিবানী হাত নাড়ল।

কুহেলি বললেন, 'এটা ঠিক নয়। ও তো সম্পূর্ণ মহিলা, সর্দারজী হবে কেন? কিন্তু আজ আমি ওসব খাবো না।'

'কারণ?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি অভ্যস্ত নই। তাছাড়া গতকালই তো খেয়েছি।' কুহেলি বললেন।

শিবানী চোখ বড় করল, 'কুহেলিদি, তুমি রয়্যাল স্যালুটের নাম শোননি! বেস্ট স্কচ। এখানে চট করে পাওয়া যায় না।'

রুদ্র বললেন, 'থাক। ওঁর যখন অনিচ্ছে তখন জোর করে লাভ নেই।'

শিবানী মাথা নাড়ল, 'আমি টেস্ট করব।'

কুহেলি বললেন, 'সাবধানে। কালকের ঘটনা যেন আবার না ঘটে।'

'মাথা খারাপ। আর কখনও বেহিসাবী হই?' শিবানী হাসল।

গ্লাস এল। বোতল খোলা হল।

কুহেলি বললেন, 'আমি আজকে উঠি।'

রুদ্র রায় অবাক হলেন, 'সেকি! এখনই?'

'একটু টায়ার্ড লাগছে। তাছাড়া এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে আমার যখন কোন ভূমিকা নেই তখন খামোকা বসে থেকে লাভ কি!' কুহেলি উঠে দাঁড়ালেন।

শিবানী কুহেলির হাত ধরল, 'সত্যি বল তো, আমার ওপর রাগ করেছ?'

'কেন?'

'তাহলে চলে যাচ্ছ কেন?'

'তোমরা খাবে, আমি কি করব?'

'বেশ। আমি খাবো না। তাহলে তো থাকবে?'

রুদ্র আর একটি গ্লাসে সামান্য হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলেন, 'না খেতে পারো, তবু কম্প্যানি দিতে আপত্তি কোরো না।'

কুহেলি হেসে ফেললেন, 'ব্যাপারটা কুড়ি বছর আগে কেউ ভাবতে পারত?'

'কোন্ ব্যাপার?' রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'মধ্যবয়সী বাঙালি মহিলা আনন্দ করছেন হুইস্কি খেয়ে।'

'ওঃ, কুহেলিদি, তুমি আজ কিরকম বাঁকা বাঁকা কথা বলছ।' শিবানী গ্লাস তুলে চুমুক দিল, চোখ বন্ধ করল, তারপর বলল, 'আমি কোন পার্থক্য টের পাচ্ছি না। কালকের থেকে আলাদা মনে হচ্ছে না।'

'আকাশপাতাল ফারাক। যাঁরা জানেন তারাই বোঝেন।' রুদ্র বললেন।

শিবানীর এতক্ষণে মনে পড়ল, 'আজকের সেলিব্রেশন কি জন্যে?'

'আমার ডিস্টিলারির কাজ শুরু হতে চলেছে।' রুদ্র রায় জানালেন।

আজ সবাই ঠিকঠাক। ডিনারের পর সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পালা। শিবানী যেচে কুহেলিকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিল। কুহেলির ইচ্ছে হচ্ছিল তিনি রুদ্রর সঙ্গে ফিরবেন। আজ তেমন রাত হয়নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রুদ্রকে এক কাপ কফি খাওয়াবেন। কিন্তু শিবানীর উৎসাহ দেখে রুদ্র তেমন কিছু বললেন না বলে কুহেলিদিকে মেনে নিতে হল।

গাড়ি চলতে শুরু করলেই শিবানী বলল, 'কুহেলিদি, এবার তুমি বিয়ে কর।'

'বিয়ে? এই বয়সে?' কুহেলি চমকে উঠল।

'এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার। চেহারা দেখে বোঝাই যায় না।'

'আর ছ'টা ছানপোনা? ওরা?'

'ওরা তো বড় হয়ে গিয়েছে। যে যার মতো গুছিয়ে নিচ্ছে।'

'পাগল।'

'সত্যি বলছি, পাগলামি নয়।'

'বেশ। পাত্র কোথায়? কাকে বিয়ে করব?'

'কেন? রুদ্র রায়কে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে।'

'কাল বেশি মদ খেয়ে নেশা করেছিলে, আজ কম খেয়েই হয়ে গেল?'

'দূর। ভদ্রলোক তোমাকে ভালবেসে ফেলেছেন।'

'তাই?'

'তুমি যেন বোঝ না! তোমাকে অ্যাপ্রোচ করেননি?'

'উহুঁ!'

'ধ্যেৎ। বিশ্বাস করি না। হাতটাও ধরেননি?'

'নাঃ।'

'সেকি! আজ তোমার দিকে মাঝে-মাঝে যেভাবে তাকাচ্ছিলেন সেটা আমি লক্ষ করেছি। তুমি চলে আসতে যখন চেয়েছিলে তখন ওঁর মুখ করুণ হয়ে উঠেছিল। তুমি যদি বল আমি ওঁকে প্রস্তাবটা দিতে পারি,' শিবানী বলল।

'ভ্যাট!'

'দ্যাখো, গতরাত্রে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, যে কোন পুরুষ ওই অবস্থায় বন্ধ ঘরে একলা পেলে ছেড়ে দিত না। কিন্তু উনি আমাকে ছুঁয়েও দ্যাখেননি।'

'তোমাকে ছোঁয়নি মানে আমাকে চাইবে, এ কি যুক্তি!'

'তাহলে তো বলতে হবে লোকটা ইম্পোটেন্ট।'

'তা আমি কি করে বলব?'

'হ্যাঁ। ভেবে দ্যাখো। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, একটা বিয়ে করেছিলেন কিন্তু ছেলেমেয়ে নেই। বউ কেন ছেড়ে গেছে তা নিজেই আমাদের বলেছেন। সেই কথা সত্যি কিনা তা কে বলবে? ফরাসী মেয়ে যখন বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবে

তখন সে জেনেশুনেই করবে। পরে বাঙালিয়ানা মানতে না পেরে চলে যাবে এটা মানা যাচ্ছে না। তাছাড়া এত টাকার মালিক যে, স্বাস্থ্য ভাল, তার তো মেয়ের অভাব হওয়ার কথা নয়।' শিবানী বলল।

'তাহলে বলছ লোকটা খারাপ!' কুহেলি তাকালেন।

'না, তা বলছি না। লোকটা যদি ভাল হয় তাহলে তোমার সঙ্গে খুব মানাবে। একেবারে রাজযোটক যাকে বলে।' শিবানী হাসল।'

'বেশ। তুমি খোঁজ নাও আগে। তোমার বরকে বল না, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, তিনি নিশ্চয়ই ফ্রান্সের খবর এনে দিতে পারবেন।' কুহেলি বলল।

'দূর! আমার বর তো জলে জলে ঘোরে, ডাঙার খবর পাবে কি করে?'

কুহেলিকে বাড়িতে পৌঁছে চলে গেল শিবানী। কাজের লোক দরজা খুললে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তিনতলায় খুব হাসি এবং জোরে কথা হচ্ছে কানে এল। কুহেলি কাজের লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওপরে কেউ এসেছে?'

'হ্যাঁ। ছোটদির বন্ধু।'

'কে বন্ধু?'

'জানি না। এর আগে দুবার এসেছিল।'

স্বপন গুপ্তের তরুণ সহকারীর মুখ মনে পড়ল। তাকে নিয়ে এত রাত্রে বাড়িতে হৈ হৈ করছে পাখি? এত সাহস পেয়ে গেছে। কাজের লোককে বললেন, 'পাখিকে বল আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

নিজের ঘরে চলে এলেন তিনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে খুব খারাপ লাগল। সেই দুপুরে আটপৌরে সাজে বেরিয়েছিলেন। চেহারার হাল যা হয়েছে! আর এই চেহারা দেখেও শিবানীর মনে হল তাঁর বিয়ে করা উচিত! পাগল আর কাকে বলে।

'ও মা, তুমি এসে গিয়েছ! দিদির বাড়িতে ফোন করেছিলাম, তুমি তো সন্ধের আগে বেরিয়ে এসেছ ওখান থেকে, এত দেরি হল?' পাখি পাশে এসে দাঁড়াল।

'কাজ ছিল।'

'ও। দিদি চিন্তা করছে, একটা ফোন করে দিয়ো। হ্যাঁ, কি বলছিলে?'

'ওপরে কে এসেছে?'

'প্রবাল বসু। বিখ্যাত হয়ে গেছে "স্বপ্নের আয়না" ছবি করে। পুরস্কারও পেয়েছে। তুমি তো ওর নাম শুনেছ?' পাখি বলল।

হ্যাঁ, নাম শুনেছেন কুহেলি। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, তপন, মৃণালের পর এখন প্রবালের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী চলচ্চিত্র বোদ্ধারা। তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবি তৈরি না করে জীবনধর্মী ছবি করতে চায় যারা তাদের প্রথম নাম প্রবাল।

তবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমরা যেভাবে চেঁচাচ্ছে তাতে পাড়ার লোক জেগে থাকবে।'

'সরি মা,। আসলে ও এত দারুণ জোক বলছিল যে শুদ্ধটা—।'

'হঠাৎ এ বাড়িতে এলেন উনি?'

'হঠাৎ কেন হবে? এর আগেও তো কয়েকবার এসেছে। অ্যাকসিডেন্টলি তুমি তখন বাড়িতে ছিলে না তাই পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি।'

'ও। তা ওঁর মতো বিখ্যাত মানুষ এ বাড়িতে ঘন ঘন কেন?'

'ঘন ঘন নয়। তাছাড়া আমার তো বন্ধু। আমার কাছে ও বিখ্যাত নয়, আবার আমি যে অভিনেত্রী এটা ওর মাথায় নেই। আচ্ছা দাঁড়াও—।' হুট করে পাখি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আপত্তি জানানোর সুযোগই পেলেন না কুহেলি। নিশ্চয়ই এখন পাখি প্রবালকে নিয়ে এখানে আসবে। অন্যমনস্কভাবে চিরুনি তুলে চুলে বোলালেন।

'মা!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজায় পাখির পাশে যাকে দেখতে পেলেন তার বয়স তিরিশ কী তার আশে পাশে। দোহারা লম্বা চেহারা, গালে ঈষৎ দাড়ি, পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। হাতজোড় করে নমস্কার করল প্রবাল। নমস্কার করল কুহেলিও।

প্রবাল কথা বলল, 'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো। আমি নাম তো খুব শুনেছি কিন্তু ছবি দেখিনি।'

'কোথাও দেখানো হলে আপনাকে বলব।'

'এখন কি ছবি করা হচ্ছে?'

'বিষয় ভেবেছি। যাঁরা টাকা দেবেন তাঁদের বিষয় পছন্দ হচ্ছে না।'

'ও।'

'শেষপর্যন্ত রমাপদ চৌধুরীর লেখা আমার প্রিয় একটি গল্প নিয়েই করতে হবে।'

পাখি হাসল, 'আমি আছি মা।'

প্রবাল বলল,'ওকে ভেবেই গল্পটা নিয়ে করার উৎসাহ পাচ্ছি।'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় থাকা হয়?'

'আমার বাড়ি জামসেদপুরে। ওখানেই সবাই থাকেন। আমি টালিগঞ্জে আছি পেয়িং গেস্ট হিসেবে।' হাসল প্রবাল।

ঘড়ি দেখালেন কুহেলি, 'ওরে ব্বাবা। অনেক রাত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এখন বাস পাওয়া যাবে না। ট্যাক্সি—।'

পাখি কথার মাঝখানে কথা বলল, 'প্রবাল আজ রাত্রে এখানে থাকবে মা। একটু আগে আমাদের ডিনার হয়ে গিয়েছে।'

হঠাৎ মিইয়ে গেলেন কুহেলি। প্রবাল এখানে রাত্রে থাকবে অথচ তাঁর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না পাখি?

প্রবাল বলল, 'গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল। ট্যাক্সি অবশ্য পাওয়া যাবে—।'

'মিছিমছি অত টাকা খরচ করার কি দরকার? তিন তলায় তো এক্সট্রা ঘর আছে। প্রবাল থাকলে আমরা আরও কিছুক্ষণ গল্প করতে পারব।' পাখি প্রবালের দিকে তাকাল, 'চল। গল্পটা এখনও কমপ্লিট হয়নি।'

প্রবাল বলল, 'এলাম।'

ওরা চলে গেল। বসে পড়লেন কুহেলি। হঠাৎ মনে হল, এই বাড়ির কোন কিছুই এখন তাঁর অধিকারে নেই। চার ছেলে মেয়ে স্বাধীনতার জন্যে বাইরে চলে গিয়েছে। বাড়িতে থেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে পাখি। একটা লোক, যার একমাত্র পরিচয় সিনেমার পরিচালক, তার অন্য কোন দিক না জেনে এই বাড়িতে ডেকে রাত্রে থাকতে দিচ্ছে একটি সতেরো বছরের মেয়ে অথচ মা হয়ে তিনি কিছুই করতে পারছেন না? চেষ্টা করেও প্রবালের মুখের ওপর বলতে পারলেন না ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। হ্যাঁ, তিনতলায় দুটো ঘর আছে। শুদ্ধ আর পাখি সে দুটো ব্যবহার করত। আজ রাত্রে হয়তো শুদ্ধ দিদির ঘরে শোবে। কিন্তু—।

টেলিফোন বাজল। ইচ্ছে করছিল না ধরতে। কিন্তু রাত বাড়লে টেলিফোনেরও গলা বাড়ে। কর্কশ শব্দ হয়। বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। উঠে রিসিভার তুললেন কুহেলি।

'ঠিকঠাক পৌঁছেছ?' রুদ্র রায়ের গলা।

হঠাৎ নিজের ওপর খুব রাগ হল কুহেলির। তিনি যদি এতগুলো ছেলেমেয়ের মা হয়েও কয়েকদিনের চেনা একটি পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন তাহলে মেয়েকে শাসন করার কি কোন এক্তিয়ার আছে?

'হ্যালো! হ্যালো!' রুদ্র রায়ের গলায় উদ্বেগ।

'ও। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—।'

'আচ্ছা। আই অ্যাম সরি। গুডনাইট।' ভদ্রভাবে ফোন রেখে দিলেন রুদ্র রায়।

রিসিভার হাতে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকলেন কুহেলি। তারপর কেঁদে ফেললেন। রিসিভার রেখে দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলাতে চাইলেন। হঠাৎ মনে হল, যদি তিনি সদানন্দ সেনের সেই সময়ের বউ হয়ে আজও থাকতেন তাহলে কি পাখিকে বলতে পারতেন, প্রবালকে চলে যেত বল। আমি চাই না ও এখানে থাকুক! আর বললেই যে পাখি শুনতো তারও তো স্থিরতা নেই। ও যদি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে এ বাড়িতে থাকত, তাহলে কি করতেন?

বারো

সকালে ঘুম ভাঙতেই সুজাতাকে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই? কখন এলি? এখন কটা বাজে?'

'অনেক বাজে! তুমি তো অদ্ভুত মানুষ! কাল বিকেলে বাড়ি যাচ্ছি বলে চলে গেলে, রাত দশটাতেও ফেরোনি, পাখিকে বললাম, আসামাত্রই ফোন করতে বলবি, অথচ ফোন করলে না?' সুজাতা রাগী গলায় বলল।

'খুব টায়ার্ড ছিলাম। পাখি বলেছিল, কিন্তু—। তুই তো ফোন করতে পারতিস?'

'আমিই বারবার করব? তাছাড়া ফোন নিয়ে ঝামেলা হয়ে গিয়েছে।'

'দাঁড়া, বাথরুম থেকে এসে শুনি। তুই কি ওপরে গিয়েছিলি?'

'না। দেখলাম পাশের ঘরে শুদ্ধ ঘুমাচ্ছে। ভাইবোনে ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

শুনে চোয়াল শক্ত হল কুহেলির। মাথা নেড়ে না বলে বাথরুমে গেলেন। শুদ্ধকে দোতলায় শুতে নিশ্চয়ই পাখিই পাঠিয়েছে। এতদিন বাইরে ও কি করছে তা শুধু অনুমানে ছিল, এখন বাড়ির ভেতরেও সাহস পাচ্ছে, নাঃ, এবার রাশ টানা দরকার।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বললেন, 'টেলিফোন নিয়ে কি হয়েছে?'

'অমিয় অর্ডার দিয়েছে কেউ দিনে দুটোর বেশি কল করবে না।'

অবাক হলেন কুহেলি, 'অমিয় অর্ডার দিয়েছে, তোকে?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ এত সাহস পেল কি করে?'

'কারণ এখন থেকে ওর টাকায় সংসার চালাতে হবে।'

'আচ্ছা! দুটোর বেশি নয় কেন?'

'খরচ বাঁচাতে হবে। শুধু টেলিফোন নয়, সব কিছুরই।'

'তুই কি বললি?'

'আমি আর কি বলব! মেনে নিলাম। তোমাকে দুবার ফোন করা হয়ে গিয়েছিল। আমার দিনের কোটা শেষ। তাই রাতে ইচ্ছে থাকলেও রাগে করিনি।'

'এখনই এত বাড়াবাড়ি করছে অমিয়?'

'হ্যাঁ। বলছে, থিয়েটার রোডে থাকতে গেলে বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্যে ভেতরের খরচ কমাতে হবে। ভেতরে কি হচ্ছে তা তো বাইরের লোক দেখবে না।'

'আর কটা দিন সবুর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'কি করে?'

'সময় হলেই বলব। বেশি দিন না।'

'না মা, আমি আর কোন আশা করি না।'

'আমি করি। যখন বলছি বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না তখন জেনেশুনেই বলছি। এখনও চা দিল না কেন?' কুহেলি কথাটা বলতেই কাজের লোক চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'আজ কিন্তু দেরি করেছ!' কুহেলি বললেন।

'কি করব! ওপরের ঘরে দাদাবাবুকে দু-দুবার চা দিতে হল যে?' কাজের লোক চলে গেলে সুজাতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওপরের ঘরে দাদাবাবুটি কে?'

পাখির পরিচিত এক ভদ্রলোক। বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক। কাল রাত হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে ফিরতে পারেননি।' কুহেলি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'কি বলছ তুমি? লোকটা তিনতলায় পাখির সঙ্গে? শুদ্ধ তাই নিচে নেমে এসেছে? আমি ভাবতেই পারছি না তুমি এটা অ্যালাউ করেছ?' সুজাতা চাপাগলায় বলল।

'আমি জানতাম না শুদ্ধ নেমে আসবে দোতলায়।'

'তুমি পাখিকে কিছু বলনি?' সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

'বলার সুযোগ পাইনি। প্রবাল ওর সঙ্গে ছিল।'

'আমি বলব।'

'না।'

'না মানে? আমি ওর দিদি, আমার বলার রাইট আছে।'

'আছে। কিন্তু ও যদি তোকে অপমান করে?'

'আমাকে? পাখি? কি বলছ তুমি?'

'এই কয়েক মাসে বাইরে গিয়ে ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবার বয়সী মানুষেরা ওর স্তাবকতা করে, তাদের দাদা বলে ডাকে। এখন আর আমাকে সব কথা বলে না। শুনছি অনেক ছবিতে কাজ করছে। আমি তো চাই ওর ভাল হোক। ব্যস।'

সুজাতা বলল, 'ভাল হচ্ছে বলে আমাকে অপমান করবে?'

'তোকে কি করে বোঝাবো? ঠিকঠাক সমালোচনা কেউ সহ্য করতে পারে না। উলটে আঘাত করার চেষ্টা করে। যদি ও তোকে মিস্টার পাকড়াশির কথা বলে খোঁটা দেয় তখন সেটা সহ্য করতে পারবি?' সরাসরি বললেন কুহেলি।

'পারব। আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করিনি। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে তুমি। তিনি আমার প্রচুর উপকার করেছিলেন। কিন্তু সেই উপকার পেয়ে আমি আমার সংসার ভাঙিনি। অমিয়কে ছেড়ে ওঁর কাছে চলে

যাইনি। অমিয়কে নিয়েই থিয়েটার রোডে গিয়েছি। আমার সঙ্গে ওঁর কোন অবৈধ সম্পর্কের প্রমাণ অমিয় দিতে পারবে না। পারবে না বলেই আমি মাথা উঁচু করে থাকি। তাছাড়া আমি একজন বিবাহিত মহিলা, আমার স্বামী আছেন। আমি দশটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছি আর ভাঙছি না। আর ও? একটা পুঁচকে মেয়ে, এখনও অ্যাডাল্ট হয়নি।' সুজাতা ফোঁস ফোঁস করছিল।

কুহেলি বললেন, 'বেশ। তুই যা ভাল মনে করিস কর।'

'তোমার আপত্তি নেই তো?'

'বিন্দুমাত্র নয়। আমি চাই পাখি সুস্থ জীবন যাপন করুক।'

দরজায় শব্দ হল। প্রবালকে নিয়ে পাখি ঘরে এল।

পাখি বলল, 'মা, প্রবাল চলে যাচ্ছে। আরে দিদি! তুই কখন এলি। প্রবাল, আমার একমাত্র দিদি, সুজাতা। আর ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত পরিচালক প্রবাল বসু।'

প্রবাল নমস্কাব করল, 'ওর কথায় কান দেবেন না। আমি মোটেই বিখ্যাত নই। আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

এইসময় কাজের লোক খবরের কাগজ নিয়ে ঢুকল।

প্রবাল বলল, 'এক সেকেন্ড! হেডলাইনগুলো দেখি!'

কাগজটা হাতে নিয়ে প্রবাল চোখ বোলাল। ভেতরের পাতাগুলোতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে কাগজটা ফেবত দিতে গিয়ে থমকে গেল। খবরটা পুরো পড়ল। তারপর পাখিব দিকে তাকাল, 'কি করেছ?'

'কি করেছি?'

খবরটা দেখালো প্রবাল। পড়েই চিৎকার করে উঠল পাখি।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'পাখি বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। স্বপন গুপ্তের ছবিতে অভিনয় করার জন্যে পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র সমালোচকরা ওঁকে সবচেয়ে প্রতিভাময়ী নবাগতা হিসেবে পুরস্কৃত করবে। কনগ্রাচুলেশন।' হাত বাড়াল প্রবাল। সেই হাতে হাত ছুঁইয়ে ছুটে এসে কুহেলিকে জড়িয়ে ধরল পাখি। টপাটপ চুমু খেল। তারপর দিদির কাছে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাকে একটু আদর কর দিদি।'

সুজাতা জড়িয়ে ধরল ছোটবোনকে।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে হবে অনুষ্ঠান?'

প্রবাল আর একবার কাগজটা দেখল, 'এখনও তারিখ ঘোষণা করেনি।'

পাখি বলল, 'তুমি একটু অপেক্ষা করবে?'

প্রবাল জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমি একবার স্বপনদার বাড়িতে যাব। ওঁর জন্যেই তো এই পুরস্কার। ওঁকে প্রণাম করে আসব।' পাখি দরজার দিকে এগোল।

প্রবাল বলল, 'ঠিক আছে।'

'তুমি পাশের ঘরে একটু বসো, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' পাখি দৌড়াল ওপরে। প্রবালও চলে গেল ওর পেছন পেছন।

কুহেলি মেয়ের দিকে তাকালেন। সুজাতা ততক্ষণে প্রবালের রেখে যাওয়া কাগজটা টেনে নিয়ে খবরটা পড়তে শুরু করেছে। পড়া শেষ করে সুজাতা বলল, 'যাক, পাখি এখন বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

কুহেলি বললেন, 'একটা ব্যাপার দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। ওর মন থেকে এখনও কৃতজ্ঞতাবোধ চলে যায়নি। খবরটা শুনেই ওর মনে পড়েছে স্বপনবাবুর কথা।'

'যদ্দিন এরকম মন থাকবে তদ্দিন অমানুষ হবে না।' সুজাতা মন্তব্য করল।

কুহেলি হাসলেন, কিন্তু তুই তো ওকে কিছু বললি না?'

সুজাতা মায়ের দিকে তাকাল, 'আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই প্রবাল খবরটা পড়ে শোনাল। এরকম খবরের পর কি ওই প্রসঙ্গ তোলা যায়?'

'পরে বলিস। ওকে একা পেলে বুঝিয়ে বলিস।'

'তুমিও আর ওকে এসব করতে অ্যালাউ কোরো না।' সুজাতা কাঁধ ঝাঁকাল।

বেলা সাড়ে দশটায় কুহেলি সুজাতাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন।

সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই আগে লকার খুলেছিস তো?'

'হ্যাঁ। একবারই। প্রথমবার। তারপর থেকে উনিই খুলতেন। জয়েন্ট নামে তো!'

ব্যাঙ্কের কর্মচারী পরিচয়পত্র এবং কাগজ দেখার পর লকার রুমে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট লকার খুলে দিয়ে চলে গেলেন। এবার দ্বিতীয় চাবি যা সুজাতার কাছে ছিল, ঘোরাতেই লকারের দরজা উন্মুক্ত হল। সুজাতা বলল, 'বাব্বা।'

লাল সালুতে মোড়া দুটো বোঁচকা বের করে আনল সুজাতা। সঙ্গে কয়েকটা সার্টিফিকেট। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'খুলে দেখব?'

'না। এখানে না। বাড়িতে গিয়ে দেখিস।'

শূন্য লকার চাবি-বন্ধ করে সঙ্গে নিয়ে আসা ব্যাগে সম্পত্তি ভরে নিয়ে ওরা বেরিয়ে এসে জানাতেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী তাদের চাবি দিয়ে লকারটাকে দ্বিতীয়বার বন্ধ করল।

সেভিংস অ্যাকাউন্টে আটাত্তর হাজার তিনশো নব্বই টাকা রয়েছে, খোঁজ করে জানা গেল মাত্র একহাজার রেখে বাকিটা তুলে নিল সুজাতা কুহেলির পরামর্শে। গাড়িতে উঠে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি করবে?'

'বাড়িতে গিয়ে সবকিছু ভাল করে দ্যাখ।'

'যদি ও বাড়িতে থাকে!' সুজাতা তাকাল।

'বাড়িতে থাকবে কেন? আজ তো অমিয়র অফিস আছে।'

'ঝগড়া করে চলে এসেছি বলে মেজাজ গরম করে বাড়িতে থেকে যেতে পারে।'

'থাকে থাকবে। তুই তো চুরি ডাকাতি করিসনি। তোর নামে রাখা টাকা জিনিস ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিস। আর তাতে তো ওরও উপকার হবে।'

'না। আমি চাই না ও এসব জানুক।'

'কেন?'

'তুমি ঠিক বুঝবে না।'

'কেন বুঝব না সেটা আমি জানি না। তাহলে আমার ওখানে চল।'

'তাই চল।'

কাজের লোক দরজা খুলে জানাল পাখি আর শুদ্ধ এখনও ফেরেনি, আর একটু আগে জামাইবাবুর ফোন এসেছিল।

সুজাতা তাকাল কুহেলির দিকে, 'কি বলেছিলাম? ঠিক অফিস কামাই করেছে।'

'হয়তো অফিস থেকে ফোন করেছিল।'

'অসম্ভব। অফিসের ফোন ও পার্সোনাল প্রয়োজনে ব্যবহার করে না।'

'তাহলে তুই একবার ফোন করে দ্যাখ ও কি বলতে চায়!'

'বয়ে গেছে। দরকার হলে আবাব করবে!' সুজাতা বলল।

কুহেলি ভেতরের ঘরে নিয়ে এল মেয়েকে। প্রথমে সার্টিফিকেটগুলো দেখা হল। মোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাঁচ বছরের জন্যে জমা রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে। পাঁচ বছর পরে অঙ্কটা দ্বিগুণ হবে। প্রতিটি সার্টিফিকেটই জয়েন্ট নামে। কোনটায় সুজাতার নাম প্রথমে কোনটায় মিস্টার পাকড়াশির।

সুজাতা বলল, 'মা এ তো অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ। লোকটা তোর কথা ভেবেছে।'

সালুর মোড়ক খোলা হল। একটাতে বিভিন্ন সাইজের সোনার বালা। ঠিক কত ভরি হবে তা কুহেলিও অনুমান করতে পারলেন না। দ্বিতীয়টিতেও সোনা তবে গহনা নয়। বিস্কুটের আকারে অনেক অনেকগুলো সোনার স্তূপ।

'মা কি হবে?'

'গয়না নিয়ে সমস্যা নেই। এগুলা কি হবে?

'কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কোথায় পেয়েছি তাহলে কি জবাব দেব?'

'ঠিক। এগুলোকে বিক্রি করে দিতে হবে।'

'কোথায় বিক্রি করবে? সোনার দোকানে?'

'দোকানে গেলে তো ওরা প্রশ্ন করবে, কোথায় পেয়েছি!'

'তবে?'

'দাঁড়া। হরিপদবাবুকে খবর দিই। তোর বাবার চেনা স্যাকরা। উনি নিশ্চয়ই একটা পথ বলতে পারবেন।' কুহেলি বলল।

'না। হরিপদবাবু বুড়ো মানুষ। অবস্থাও ভাল নয়। ব্যাপারটা শুনে উনি পাঁচজনকে বলতে পারেন।' সুজাতা আপত্তি করল।

'তাহলে কটা দিন ভাবি। কিন্তু এগুলো রাখবি কোথায়?'

'তোমায় আলমারিতে রেখে দাও।'

'পাগল। ধর, আজ রাত্রে আমি মারা গেলাম। তোর ভাইবোনেরা বলবে এগুলো আমার জিনিস, ওরা ভাগ নেবে। তখন কি করবি?'

'দূর। তুমি আজ মরছ নাকি?'

'কিছুই বলা যায় না। সমস্যা তৈরি হতে পারে এমন কাজ করিস না।'

'তাহলে রাখব কোথায়?'

'তোর আলমারিতেই রেখে দে। অমিয় নিশ্চয়ই তোর আলমারি খোলে না।'

'এখন পর্যন্ত হাত দেয়নি।' সুজাতা বলল, 'টাকাগুলো।'

'তোর নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই?'

'আমার টাকা কোথায় যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলব।'

'ও। চল্, আমার ব্যাঙ্কে তোকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি।'

সুজাতা এতক্ষণে খুশির হাসি হাসল, 'সেই ভাল। তাহলে তোমার ব্যাঙ্কে যদি লকার পাওয়া যায় তো সেখানেই এগুলো রাখা যেতে পারে।'

'ঠিক বলেছিস।' কুহেলি উঠলেন, 'দাঁড়া ফোন করি।

নাম্বার বের করে ব্যাঙ্কে ফোন করলেন কুহেলি। নিজের পরিচয় দিয়ে অনেক অনুরোধ করার পর একটি লকারের প্রতিশ্রুতি পেলেন।

দুপুরের খাওয়া মাথায় উঠল। ওরা সব সম্পত্তি নিয়ে ব্যাঙ্কে ছুটলেন। পাড়ার ব্যাঙ্ক। কাজ শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং লকার সুজাতার একার নামেই খোলা হল। সুজাতা চাইল কুহেলির নামও সঙ্গে থাকুক। কুহেলি রাজি হলেন না ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

বাড়িতে ফেরার পর আবার কাজের লোক জানাল অমিয় ফোন করেছিল। একটু রেগেই নাম্বার ডায়াল করল সুজাতা। অমিয়র গলা পেয়ে বেশ কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'তুমি, তুমি কখন আসবে?'

'যখন খুশি। তোমার আপত্তি আছে?'

'না না। প্লীজ রাগ কোরো না। একটু টানাটানির কথা ভেবে বলেছি।'

'এতদিন যখন বলনি তখন দয়া করে আর নাই বললে।'

'না, মানে, বুঝতেই পারছ—!

'কিছুই বুঝছি না। টেলিফোনের বিল নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ওটাব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।' সুজাতা জানাল।

'তুমি!'

'হ্যাঁ। আমি? আর কিছু বলবে?'

চুপ করে থাকল অমিয়।

'কথা বলছ না কেন?' রেগে গেল সুজাতা।

'তুমি কখন আসবে?'

'কেন?'

'সেই সকাল থেকে খাওয়া হয়নি।'

'তার মানে?'

'আমি তো ঠিক রান্না করতে— !'

'কেন? কাজের লোক কি করছে?'

'ও আজ আসেনি।'

'একদিন না খেলে কোন মানুষ মরে না। আমিও এখন পর্যন্ত কিছু খাইনি। ন্যাকামি কোরো না।' রিসিভার রেখে দিল সুজাতা। তার পর বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। এখন যেতে হবে ওই বাড়িতে, হেঁসেল ঠেলতে।'

কুহেলি হেসে ফেললেন।

রুদ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি কুহেলি। ইচ্ছে করেই। বারংবার নিজেকে সতর্ক করেছেন, আর নয়। এবার নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে। রুদ্রর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে কিছুদিন সংসর্গে থাকলে সব পিছুটান ভেসে যাবে। সুজাতাকে তিনি সতর্ক করেছিলেন, পাখিকে কিছু বললে সে মিস্টার পাকড়াশির প্রসঙ্গ তুলে অপমান করতে পারে ওকে। ঠিক তখনই মনে হয়েছিল, পাখি তো তাঁকেও আঘাত করতে পারে শোভনের কথা তুলে। শোভনের এ বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে অনেককাল। কিন্তু পাখির মনে স্মৃতি তো থেকেই গেছে। তখন ওর সদ্য ডানা গজাচ্ছে, কথা বলার মতো সঞ্চয় হয়নি। একটি অনাত্মীয় পুরুষ, হোক নামকরা লেখক, সারাদিন, প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত মায়ের ঘরে থাকছে, মদ্যপান করছে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে একথা অবিশ্বাস করার বয়স তার হয়ে গিয়েছে। তারপর যখন সে ডানা মেলল, পৃথিবীটাকে দেখল, যে বয়সে কুহেলির সন্তানেরা আসতে শুরু করেছিল, সেই বয়সে বয়স্ক লোকদের স্নেহ পেতে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করল তারপর তো শোভন সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা লালন করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবু, যেহেতু

সেই দিনগুলো চলে গেছে, এই বাড়িতে আর নতুন করে মদ্যপানের আসর বসতে সে দেখছে না তাই কুহেলিকে আক্রমণ করার মতো কোন ছুঁতো সে পাচ্ছে না। এখন রুদ্র রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুদিন রাখলেই সেটা কারও কাছে লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাছাড়া এই সম্পর্ক রেখে কি লাভ?

হ্যাঁ, এখনও এতগুলো সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীর মাঝে মাঝে কথা বলে। মাঝে মাঝেই তপ্ত হলকা সারা শরীরে বয়ে যায়। পরে খুব খারাপ লাগে। তাঁর বয়সী অনেক বাঙালি মেয়ে বার্ধক্যকে টেনে এনে নির্মোহ ভাবে সংসারের যন্ত্র হয়ে বাস করছে। তাঁদের চেহারায় অকালেই বয়স্কা ছাপ পড়ে যায় কিন্তু তাঁকে ঈশ্বর এমন একটা শরীর দিয়েছেন যে তিনি ইচ্ছে করেও ভাঙতে পারছেন না। সন্ধ্যা মুখার্জির 'জানি না ফুরাবে কবে এই পথচাওয়া' শুনলেই বুকের ভেতরটা কেন টনটন করে ওঠে? কেন মাঝরাতে ঘুমঘুম চাঁদের দিকে তাকালে রাতটাকে মাধবী-রাত বলে মনে হয়। এই মনে হওয়াটা তো তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। আপনিই আসে। এই সেদিন সন্ধের মুখে ছাদে গিয়েছিলে খোলা চুলে। হঠাৎ হাওয়া বইতে শুরু করল। ক্রমশ তার জোর বাড়ল। তাঁর চুলগুলো উড়তে লাগল সেই হাওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে জোর করে হাত-খোঁপায় বাঁধলেন তাদের। সুরে সুরভিতে মেলা বসার নাম নেই আর তাঁর এলোচুল নিয়ে বাতাস খেলা করছে বলে রেগে গিয়ে নেমে এলেন ছাদ থেকে। হয়তো এসবই পাগলামি। কিন্তু তিনি কি করতে পারেন!

ভয় লাগে এখন। যদি রুদ্র রায় তাঁকে বাঁধনে বাঁধতে চায়? যদি তাঁকে স্ত্রী মর্যাদা দিয়ে কাছে পেতে চায় তাহলে তিনি কি করবেন? বড় ছেলে ঘেন্নায় মুখ বেঁকাবে। হয়তো বলেই ফেলবে, তার মা মারা গিয়েছে। মেজ সেজো খুশি হবে। ভাববে তাদের বাবার সম্পত্তির থেকে একজন দাবিদার সরে গেল। পাখি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। শুদ্ধ চুপচাপ এড়িয়ে যাবে তাকে। আর সুজাতা? বড় মেয়েকে এখন তিনি বুঝতে পারছেন না। তার চেয়ে এই ভাল। রোজ রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করবেন কাল সকালে যেন চোখের তলায় হাঁসেরা তাদের পায়ের ছাপ এঁকে দেয়। শরীর শিথিল হয়। চুলে সাদা ছাপ পড়ে। প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আর সেটা হলে কোন সমস্যা থাকবে না। রুদ্র রায় চমকে উঠবে, সরে যাওয়ার জন্যে ছল তৈরি করতে বিন্দুমাত্র সময় নেবে না। শরীরে আর তপ্ত বাতাস বইবে না। একেবারে সঠিক বাঙালি জননী হয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন যে-কদিন কপালে লেখা আছে।

কি মনে হল, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন কুহেলি। এনগেজড শব্দ শুনবে যেই ফোন করুক। কথা বলার দায় থেকে তো তিনি রক্ষা পাবেন।

তেরো

চটজলদি প্রবাল প্রযোজক পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে, কুহেলি জানতেন না। সন্ধ্যায় পাখি এসে জানাল, 'মা, রেডি হও, কাল যেতে হবে।'

কুহেলি তখনই জানলেন। বললেন, 'বলিসনি তো!'

'আমিই কি সব জানি?' পাখি বলল, 'সব ঠিক করার পর বলল। কাল দার্জিলিং মেলে যেতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি। ওখান থেকে ডুয়ার্সের চা বাগানে। সেখানেই থাকতে হবে। টানা আটদিনের আউটডোর।'

'চা বাগানে এত লোকের থাকার জায়গা আছে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানি না। আমার কি দরকার। আমাদের একটা দারুণ বাংলোয় রাখবে যার চারপাশে শুধু চায়ের গাছ। অন্যদের নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? তাহলে তৈরি হয়ে থেকো।' পাখি ঘোষণা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'তুই কি আমাকে সঙ্গে যেতে বলছিস?' কুহেলি বললেন।

পাখি তাকাল, 'ওম্মা, তাহলে এতক্ষণ কি বলছিলাম?'

'তুই শুদ্ধকে নিয়ে যা। তাছাড়া এখন তো সবাই তোর চেনাজানা।'

'তা অবশ্য। কিন্তু গেলে তোমার চেঞ্জ হত!'

'না রে! তুই স্যুটিং-এ যাবি আর আমাকে ঘরে বসে থাকতে হবে। খুব একঘেয়েমি লাগে। তাছাড়া এবার প্রবাল আছে, তোর তো কোন অসুবিধে নেই।'

'বেশ। তোমার যদি ভাল না লাগে তাহলে যেয়ো না।' পাখি চলে গেল।

এত সহজে অব্যাহতি পাবেন ভাবেননি কুহেলি। পেয়ে খারাপ লাগল। মেয়েটা তাঁকে একবারও যাওয়ার জন্যে জোর করল না। অথচ প্রথমদিকে তাঁকে ছাড়া ও এক পা-ও নড়ত না। শ্বাস পড়ল, বেশ জোরেই।

রুদ্র রায়ের ফোন এসেছিল এর মধ্যে। খুব ব্যস্ত। নর্থ-বেঙ্গলে চলে যেতে হচ্ছে। কুহেলি বলেছিলেন তাঁর শরীর খারাপ। শুনে ব্যস্ত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। কুহেলি জানিয়েছিলেন, চিন্তার কিছু নেই। ঠিক চিকিৎসা চলছে। আজ বিকেলে আবার নর্থ-বেঙ্গল থেকে ফোন করেছেন রুদ্র রায়। শরীর কেমন আছে জানতে চাইলে ভাল বলতেই হল। রুদ্র জানালেন, কাল দুপুরের ফ্লাইটে আসছেন, দেখা করতে চান। চট করে মিথ্যে বলতে পারলেন কুহেলি, মেয়ে স্যুটিং-এর জন্যে আউটডোরে যাচ্ছে, অভিভাবক হিসেবে তাঁকে যেতে হতে পারে। কারণ প্রত্যেকবারই তিনি যান। খুব হতাশ হয়েছিল রুদ্র। কিন্তু কিছু বলেনি।

এভাবে কতদিন একটা মানুষকে এড়িয়ে থাকা যায়? কুহেলি মনস্থির

করলেন। এবার সরাসরি বলে দিতে হবে। আর লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

বিকেলে পাখি এবং শুদ্ধ চলে গেল। যাওয়ার আগে পাখি ঘরে এল দেখা করতে, 'একি! তুমি সাদা শাড়ি পড়েছ কেন?' চিৎকার করল সে।

'কেন? কি হয়েছে?' কুহেলি হাসলেন।

'বিচ্ছিরি লাগছে। ওটা পালটাও, তুমি সাদা পড়বে না।'

'আমার তো সাদা পরার বয়স। আমার মা অনেক আগেই সাদা পরতে শুরু করেছিল। বয়স হলে সাদা পরতে হয়।' কুহেলি বললেন।

'তোমার মা নিশ্চয়ই তোমার মতো দেখতে ছিলেন না। আমি যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন তোমাকে ঠিক আগের মতো দেখি।'

'ঠিক আছে। এখন তো তুই ভালভাবে যা। সাবধানে থাকিস। শুদ্ধকে দেখিস।'

নিচের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন তিনি। লক্ষ করলেন, কাজের লোকটিও বারংবার সবিস্ময়ে তাঁকে দেখছে।

শুয়েছিলেন কুহেলি। বাড়ি ফাঁকা। একবার ভেবেছিলেন শিবানীকে ফোন করবেন। বেশ কিছুকাল চুপচাপ আছে সে। কিন্তু আলস্য বাধা দিল। হাত বাড়িয়ে একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। আজকাল পাখির দৌলতে এবাড়িতে বাংলা সিনেমা পত্রিকাগুলো আসে। হঠাৎ পাতা জুড়ে পাখির ছবি। ডোরাকাটা গেঞ্জি পরনে, বুক অনেকটাই উন্মুক্ত। মিষ্টি হাসছে। নিচে ক্যাপশন, 'পাখি সেন, টালিগঞ্জের উজ্জ্বল আবিষ্কার।' মেয়ের ছবির দিকে তাকালেন কিছুক্ষণ। শ্বাস পড়ল আবার, সশব্দে। 'নাঃ, মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে', ওর ঠোঁট, চিবুক বলে দিচ্ছে ও আর ছেলেমানুষ নেই।

খাট থেকে নেমে জল খেলেন কুহেলি। তারপর রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরালেন। রিং হচ্ছে। কিছু পড়ে শিবানীর শাশুড়ির গলা শুনতে পেলেন, 'হ্যালো।'

'হ্যালো। মাসিমা, আমি কুহেলি বলছি।'

'অ। বউমা তো বাড়িতে নেই।'

'কখন ফিরবে?'

'সে তো আমাকে বলে যায় না। এই যে কাল তোমার বাড়িতে কি উৎসব ছিল, সেখানে গিয়ে কখন ফিরেছে আমি জানিই না। রাত বারোটার পর তো জেগে থাকতে পারি না।' বৃদ্ধা বললেন।

হকচকিয়ে গেলেন কুহেলি। তাঁর এখানে আসছে বলে কোথায় গিয়েছিল শিবানী? এটা ঠিক নয়। বললেন, 'নিশ্চয়ই দরকারে বেরিয়েছে।'

'ঘরের বউ-এর বাইরে কি এত দরকার থাকে বলতে পারো? হ্যাঁ, তোমার কাছে গেলে কারণ বুঝতে পারি। তুমি বিধবা মানুষ, দুঃখে থাকো, তাঁরও স্বামী বিদেশে, সে একা দুঃখ নিয়ে থাকে, দুজনে এক হয়ে গল্প করতে পার। তা আজ তোমার ওখানে না গিয়ে কোথায় গেল কে জানে!' বৃদ্ধা চিন্তিত।

'ওকে বলবেন আমি ফোন করেছি।'

'নিশ্চয়ই বলব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে পেরে স্বস্তি পেলেন কুহেলি। কিন্তু শিবানী ভুল করছে। স্বামী এলে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সঙ্গে সময় কাটায় আবার স্বামী চলে গেলে প্রতি সন্ধ্যায় তার নিত্যনতুন মজা চাই, এটা কতদিন চলতে পারে। তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে যে স্বামী-টামি মানতে চাইবে না। তখন? নিরাপদ জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে আসার মূর্খামি যে কেন করছে তা বুঝতে পারছেন না কুহেলি।

অন্যমনস্ক ছিলেন, কাজের লোক দরজায় শব্দ করল। দরজা খুলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'একটা গাড়ি এসেছে, যে দিদি আপনার কাছে আসেন তিনি আর একজন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দরজা খুলব? আপনি বলেছেন জিজ্ঞাসা করে খুলতে।'

শিবানীর কথা ভাবতে ভাবতেই ও চলে এল? কিন্তু কাকে সঙ্গে নিয়ে এল? বিরক্ত হলেও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কুহেলি।

একটু পরেই হৈ হৈ করে ঢুকল শিবানী, 'তোমার উজবুকটা এতক্ষণ আমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যেন কোনদিন আমাকে দ্যাখোনি। একি!'

কুহেলির আপাদমস্তক দেখে সে চাপা গলায় বলল, 'এই বেশ।'

'গুড ইভনিং।' ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রুদ্র রায়।

চমকে গেলেন কুহেলি। তাড়াতাড়ি বললেন, 'গুড ইভনিং। আপনি?'

'তোমাকে দেখতে এলাম। শরীর কেমন আছে?'

'এখন ভাল। বসুন, প্লীজ। বসো শিবানী। কুহেলি বাইরের ঘরে সোফা দেখিয়ে দিলেন।

সবাই বসলে শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল আমাকে বলনি তো!'

'তোমাকে কি পাওয়া যায় যে বলব?'

'তার মানে? আমার কোন বাড়ি নেই?'

'থাকবে না কেন? তবে সেখানে সন্ধের পরে থাকো না!'

'এই কুহেলিদি, আমাকে বদনাম দিচ্ছে!'

'আমি দেবার কে? তোমার শাশুড়িই বলছেন!'

'শাশুড়ি? তুমি ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বনাশ! কি বলল বুড়ি?'

'সেটা তোমাকে বলব কেন? গতরাত্রে তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে বলে উনি জানেন।'

'মাই গড্। তুমি কি বলেছ আসিনি?'

'এবার বলিনি। তবে আমাকে না জানিয়ে ভবিষ্যতে যদি গুলি মারো তাহলে সত্যি কথা বলতে পারি।' কুহেলি হাসলেন।

রুদ্র রায় হাসছিলেন, 'বেশ মজার ব্যাপার তো!'

শিবানীর খেয়াল হল, 'তুমি আজকে ফোন করে আমার খোঁজ করেছ। তার মানে বুড়ি ভাববে তোমার কাছে আমি আসিনি। প্লীজ ফোন করে বলো আমি এখানে আছি।'

'এত ভয় কেন? বাড়িতে ফিরে বললেই তো হবে।'

'না হবে না। তুমি বুড়িকে চেনো না। ছেলের এনে দেওয়া সিগারেট খেতে খেতে কুমতলব ভাঁজে। প্লীজ কুহেলিদি!'

কুহেলি অবাক, 'তোমার শাশুড়ি সিগারেট খান?'

'হ্যাঁ। বিদেশি সিগারেট। ছেলে এনে দেয়!'

'সেকি! ওঁকে দেখে তো নিষ্ঠাবতী বিধবা বলেই মনে হয়েছে।'

'সিগারেট তো মাছ মাংস ডিম নয়। শাস্ত্রে নাকি লেখা নেই বিধবারা সিগারেট খেতে পারবে না। তবে পাঁচজনের সামনে খান না।'

রুদ্র রায় বললেন, 'ভদ্রমহিলার বয়স কত?'

'পঁচাশি বলে শুনেছি।' শিবানী বলল।

'ওঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে।' রুদ্র রায় বললেন।

'মাপ করবেন মশাই। আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে ছেলেকে ফোন করতে চাইবেন।'

'চাইবেন মানে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'অনেকগুলো নাম্বার তো। মনে করে ডায়াল করতে পারেন না। দেখেও না। আমাকেই করে দিতে বলেন। ছেলে তো আবার মা-অন্ত প্রাণ!'

কুহেলি উঠলেন। ডায়াল করার পর বললেন, 'মাসিমা, কুহেলি বলছি। না, না চিন্তা করবেন না। শিবানী আমার এখানেই আছে। অ্যাঁ? কথা বলবেন?

নিশ্চয়ই। এই যে শিবানী, মাসিমা—!'

শিবানী ঠোঁট মুচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল, 'হ্যালো। কখন? ও। আপনি কি বলেছেন? আশ্চর্য! আমি যদি কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখি সেটাও আপনাকে বলে যেতে হবে? কখন করবে বলেছে? ঠিক আছে, রাখছি।'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

'ওঁর ছেলে নাকি ফোন করেছিল। উনি বলেছেন আমি কোথায় গিয়েছি জানেন না। ছেলে বলেছে রাত এগারোটায় আবার ফোন করবে। নিশ্চয়ই কানে কোন মন্ত্র দিয়েছে। এই বুড়ি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলো।' শিবানী মাথা নাড়ল।

রুদ্র রায় ঘড়ি দেখলেন, 'আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি আছে। শিবানী, গৃহশান্তি বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি কাজ। তোমার চলে যাওয়া উচিত।'

'ওই বুড়িই ছেলেকে বলেছে এগারোটায় ফোন করতে যাতে তখনও আমাকে না পায়।'

'যাই হোক। তোমাকে এগারোটায় পেলে তো আর অশান্তি হবে না।' কুহেলি বললেন।

'কিন্তু আমি চলে গেলে আপনি ফিরবেন কি করে? আপনি তো আমার গাড়িতে এসেছেন। এক কাজ করি, আমি বাড়িতে গিয়ে গাড়িটাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কোন দরকার নেই। ট্যাক্সি পেয়ে যাব। নয়তো হোটেলে ফোন করে গাড়ি আনিয়ে নেব।' রুদ্র রায় হেসে বললেন।

শিবানী চলে গেল বিরক্ত হয়ে।

রুদ্র রায় বললেন, 'বেচারা!'

'আমি বেচারা বলব না। বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে যখন সব কিছু এনজয় করব তখন আমি কিছু নর্মস মানতে বাধ্য।

'স্বামী শহরে থাকলে নিশ্চয়ই সেটা মেনে চলে।'

'বেশি রকমের। আমার আপত্তি সেখানেই। সেই রাতে, আপনার হোটেলের ঘরে আউট হয়ে পড়েছিল যখন তখন তো নিজেকে প্রটেস্ট করার ক্ষমতা ছিল না। আপনার বদলে অন্য কেউ হলে ও স্বামীকে কি জবাব দিত?' কুহেলি সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

রুদ্র রায় বললেন, 'যাক। তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে। কিন্তু হঠাৎ আবার, তুমি থেকে আপনিতে চলে গেলাম কি করে?'

কুহেলি হাসলেন, 'মুখে যেটা স্বাভাবিকভাবে আসে সেটা বলাই তো ভাল।'

'যা অভিরুচি। তা এই ভৈরবী বেশের কারণ কি?'

'কেন? সাদাতে অপছন্দ?'

'মোটেই না। সাদায় সব রঙের মুক্তি। আফ্রিকার একটি উপজাতি আছে যাদের সামনে করে কোন মেয়ে সাদা পরলে বুঝতে হবে তার যৌনতৃষ্ণা হয়েছে।'

'সর্বনাশ!' চিৎকার করে উঠলেন কুহেলি।

'কেন?'

'ওরা যদি আমাদের বিধবা ঠাকুমা দিদিমা পিসিমাদের দেখত তাহলে কি বলত? নাঃ। আপনি নির্ঘাৎ গুল মারছেন।' হাসলেন কুহেলি।

'না। সত্যি বলছি। খুব বিপদে পড়তেন ওঁরা। কারণ ওদের দেশের ঠাকুমা শ্রেণীর মহিলারা কালো পরে থাকেন।'

'পৃথিবীটা আজব জায়গা। যাক গে, আপনি প্রথম এলেন আমার বাড়িতে, বাড়িতে যা আছে তাই খেতে হবে কিন্তু।'

'খাওয়ানোর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

'বাঃ। এটাই তো নিয়ম।'

'তাহলে একটু পান করলেই তো নিয়মরক্ষা হবে।'

'আগে জানা থাকলে আনিয়ে রাখতাম। বাড়িতে তো—!'

'কিছুই নেই।'

কুহেলির মনে পড়ল। একটা বোতল কিছুটা খাওয়ার পর থেকে গেছে। কিন্তু—।

কুহেলি বললেন, 'লেফটওভার আছে কিন্তু সেটা আপনার চলবে না।'

'কেন?'

'একেবারে ইন্ডিয়ান হুইস্কি।'

একটু গম্ভীর হলেন রুদ্র রায়। তারপর সেটা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'ঠিক আছে, ফর এ চেঞ্জ। প্রথম দিকে খুব অস্বস্তি হবে, মাথাধরা ছাড়ানোর ওষুধ বাড়িতে আছে?'

'আপনার মাথা ধরেছে?'

'না। কাল সকালে ধরবে। থাকলে দিয়ে দেবেন তো!'

'দেব।' হেসে ফেললেন কুহেলি।

গ্লাস আনবার সময় একটু দ্বিধা হয়েছিল। ভদ্রলোক ইচ্ছের বিরুদ্ধে খাবেন, ওঁকে সঙ্গ না দিলে খারাপ দেখাবে।

বোতল আনার পর দেখা গেল মাত্র পেগ দুয়েক আগে খাওয়া হয়েছে। রুদ্র বললেন, 'মোর দ্যান এনাফ।' তিনিই পরিবেশন করলেন।

করার পর বললেন, 'একটা বিটকেল গন্ধ পাচ্ছ তো? এটাকে দূর করতে হবে। চুমুক দেওয়ার সময় মাকে আর একটা গন্ধ ধ্বক্ করে লাগবে। মজা হল

কয়েকবার চুমুকের পর গন্ধটা তোমাকে গ্রাস করে নেবে, ফলে তুমি আর টের পাবে না। কিন্তু মেজাজ নষ্ট করার পক্ষে ওটা যথেষ্ট। ওর বদলে মসৃণ শষ্যের ঘ্রাণ পেলে কেমন লাগবে। আর এটা বেশ ঘন, অ্যালকোহল প্রায় আদিম অবস্থায় রয়েছে। আমার ডিস্টিলারি প্রোডাশন শুরু করলে এদের বাজার শেষ হয়ে যাবে। এসো, উল্লাস!'

কুহেলি শুকনো মুখে বললেন, 'উল্লাস।'

রুদ্র রায় প্রথম চুমুকের পর মুখ বিকৃত করলেন। চট করে গিলে ফেললেন। এর আগে শোভন এবং শিবানীর পাল্লায় পড়ে একটু আধটু ভারতীয় মদ পান করার সময় খুব একটা অস্বস্তিতে পড়েননি কুহেলি কিন্তু আজ হল। হয়তো রুদ্রর কথা শুনতে শুনতে মনের ভেতর ধারণাটা ঢুকে গিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে কিছু না খেলে পান করা যায় না। কুহেলি বললেন, 'আমি একটু আসছি।' সোজা রান্না ঘরে চলে এসে কিছুটা কাজু পেয়ে গেলেন বয়ামে। তাই একটা প্লেটে ঢেলে বেরুবার সময় কাজের লোক এগিয়ে এল, 'আবার শরীর খারাপ।'

'কি হয়েছে?'

'চারবার পায়খানায় গিয়েছি।'

'রাত্রে খাবে না?'

'না।'

'ওষুধ খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। আগের বারেরটা ছিল।'

'তাহলে যাও, শুয়ে পড়।'

ঘরে ঢুকে রুদ্র রায়ের সামনে প্লেট রাখলেন কুহেলি। 'আগে জানলে ভাল কিছু ব্যবস্থা করা যেত। আমি এখন একা মানুষ, যাহোক হলেই চলে যায়।'

'একা মানুষ মানে? ছেলেমেয়ে কোথায়?' একটা কাজু তুললেন রুদ্র রায়।

'মেয়ে স্যুটিং-এ গিয়েছে চা-বাগানে। ছেলে তার এসকর্ট।'

'ও বেশ নাম করেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বি এফ জে এ ওকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে।'

'বাঃ। ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। সিনেমা লাইন সম্পর্কে যদিও আমার কোন ধারণা নেই তবু একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কি বল?'

হাতজোড় করলেন কুহেলি, 'থাক। যেটা জানা নেই সেটা না করাই ভাল। বেশ তো বড়সড় ব্যাপার করা হচ্ছে। তাই নিয়ে থাকাই তো ভাল।'

'তবু তুমি আমাকে তুমি বলবে না!' রুদ্র রায় তাকালেন।

মুখ নিচু করলেন কুহেলি। কি বলা যায় ভাবলেন!

'কিছু হয়েছে কুহেলি?' রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'নাঃ। কিছু হয়নি।'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ!'

'বাড়িতে অতিথি এলে তাকে রূঢ় কথা বলা ঠিক নয়। সত্যি হলেও নয়।'

'রূঢ় কথা? আমি সত্যি কথাই পছন্দ করি তা সে যতই রূঢ় হোক।'

হাসার চেষ্টা করলেন কুহেলি, 'থাক এসব কথা। নর্থ-বেঙ্গলে এবার কি হল?' নিজের গ্লাস শেষ করলেন কুহেলি। করে এগিয়ে দিলেন।

রুদ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, 'আমি এসেছি বলে তুমি কি অস্বস্তিতে আছে?'

আবার গম্ভীর হলেন কুহেলি, মাথা নাড়লেন, 'কিছুটা।'

'অস্বস্তির কারণ?'

'নিজের ওপর আস্থার অভাব।'

'বুঝলাম না।'

'আচ্ছা, বলুন তো, আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি তোমাকে, আসলে, এতদিন বাদে তোমার মধ্যে আমি একজনকে পেয়েছি যার ওর আমি নির্ভর করতে পারি।' বললেন রুদ্র রায়।

'এটা কোন সম্পর্ক নয়। তাই না?'

'ওয়েল, আই অ্যাম ইন লাভ উইদ ইউ।'

'তারপর?'

'আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

'তারপর?'

'তুমি পরিণতি জানতে চাইছ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কুহেলি।

'ওয়েল, কিছুদিন থাক, আমাকে তুমি ভাল করে চেনো, তারপর বিয়ে করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার।' রুদ্র রায় পরিষ্কার বললেন।

'একানেই মুশকিলটা হচ্ছে। আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'যেহেতু আমি বাঙালি পরিবারে জন্মেছি, অনেক কিছু আমার রক্তে আপনা থেকেই এসে গিয়েছে তাই এই বয়সে এতগুলো সন্তানের মা হয়ে আমি আবার বিয়ে করতে পারি না।' স্পষ্ট বলে ফেললেন কুহেলি।

'কিছু মনে কোরো না, এই যে আমরা একসঙ্গে বসে পান করছি এটাও তো তোমার বাঙালি সংস্কারে আটকানো উচিত। অথচ তুমি সেটা অতিক্রম করেছ।'

'হ্যাঁ। এটা এই ঘরের মধ্যে পাঁচজনের নজর এড়িয়ে করছি বলে পারছি। প্রকাশ্যে কোন বার-এ বসে পারতাম না।'

'ঠিক আছে। তোমার যদি বিয়েতে এখন আপত্তি থাকে তাহলে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আমাকে কি গ্রহণ করেছ?'

'ভাল লেগেছে।'

'বেশ, ওই ভাল লাগা নিয়েই তো আমরা পরস্পরের বন্ধু হিসেবে থাকতে পারি।'

'ওইখানেই তো ভয়। নিজেকে ভয়। আমি হয়তো অল্পে সন্তুষ্ট হব না, আরও চাইব। তখন কি হবে? তার চেয়ে চুপচাপ সরে যাওয়াই ঠিক কাজ হবে।'

'ইডিয়ট।' চাপা গলায় বললেন রুদ্র রায়।

'কি?' কুহেলির মনে হল ঠিক শোনেননি।

'একমাত্র নির্বোধরাই এসকেপিস্ট হয়।'

'আমি নির্বোধ?'

'অন্তত এই ক্ষেত্রে। তুমি বলছ নিজেকে ভয় কর। এই যে তুমি স্বামী মারা যাওয়ার পর এতবড় সংসারের হাল ধরেছ, কোন অভিজ্ঞতা ছিল আগে? তবু পেয়েছ। অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছ!'

'কোথায় হাল ধরলাম? পেয়েছি ছেলেদের ধরে রাখতে? পারিনি। মেয়ে এই বয়সেই স্বাধীন হয়ে গেল। ছোটটা পড়াশুনা ছেড়ে দিদির সঙ্গে লেপটে রয়েছে। আমি কি পেরেছি ওদের ঠিকঠাক পথে নিয়ে যেতে? উলটে ওদের ইচ্ছেকে মেনে নিয়েছি।'

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করলেন রুদ্র রায়, 'আমার মনে হয় তুমি পারিপার্শ্বিককে ভয় কর। কে কি বলবে এই নিয়ে কুঁকড়ে আছ। দরজা বন্ধ করে কিছু করতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা যেন বাইরের লোক না দ্যাখে। কাকে ভয় পাচ্ছ তুমি? তুমি কি ওদের দয়ায় বেঁচে আছ। নিজে যেটা অন্যায় মনে করবে না সেটা মাথা উঁচু করে করবে। না করাটাই বোকামি। তাই তোমাকে নির্বোধ বলেছি।'

'আমি কিন্তু অপমানিত হচ্ছি!'

'হলে আমার কিছু করার নেই।'

'ও। বেশ, আমি আমার বাড়িতে একা থাকতে চাই।' কুহেলি বললেন।

'আচ্ছা! তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

কুহেলি জবাব দিলেন না।

রুদ্র রায় উঠলেন, 'কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'না। দরকার নেই ভালবাসার।'

'তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমার আছে।' রুদ্র রায় এগিয়ে গেলেন

কুহেলির সামনে, 'আমি তোমার ফোন আশা করব।'

'আমি চাই না কোন যোগাযোগ থাকুক।'

হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রুদ্র রায়। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করতে লাগলেন কুহেলি। সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারতে রুদ্র টলে গেলেন। তারপর ব্যালান্স হারিয়ে খাটের ওপর আছড়ে পড়লেন। পড়ে চুপ করে রইলেন।

কুহেলি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। তারপরেই পড়ে কাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক হল। মারাত্মক চোট লাগেনি তো? পড়বার সময় কোথায় লেগেছে তিনি দ্যাখেননি। যদি মাথায় লেগে থাকে—!

দ্রুত পাশে বসে শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করলেন তিনি।

'রুদ্র, রুদ্র, আমি, আমি চাইনি।' কেঁদে ফেললেন কুহেলি। রুদ্র রায়ের চুলে ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতেও কান্না থামছিল না।

হঠাৎ রুদ্র রায় কথা বললেন, 'কোন সম্পর্ক থাকলে এরকম করা যায়?'

থমকে গেলেন কুহেলি, 'এম্মা! কিছু হয়নি।'

সরে যাচ্ছিলেন কুহেলি কিন্তু রুদ্র তাঁকে দুহাতে বাঁধলেন। তারপর উঠে বসে দীর্ঘক্ষণ চুম্বন করলেন। কুহেলির চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁট সরিয়ে নিতে ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে না তো?'

'নো। নেভার। তুমি?'

'আমি? আমি খুব একা।' মুখ নামালেন কুহেলি।

'এখন থেকে নয়। এখন থেকে আর আমি নয়, আমরা।'

চোদ্দ

দুপুর বারোটায় ঘুম ভাঙল কুহেলির। সকালে, সেই ছটার সময় রুদ্র চলে গিয়েছিল। নিচে নেমে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এই-পাড়া তখন শব্দহীন। ফিরে এসে বিছানায় শরীর মেনে দিতেই ঘুম যেন লাফিয়ে এল।

কাজের লোকটি আজ একটু সুস্থ। তবু চা বানিয়ে নিলেন কুহেলি। তারপর চা খেতে খেতে গতরের কথা ভেবে হেসে ফেললেন। এমন চমৎকার একটা বাতের হদিস তাঁর জানা ছিল না। নিজেকে এখন কী ভরাট লাগছে। কথা বলতে বলতে, আদর করতে করতে যে গোটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়, এই বয়সেও যেসেটা ক্লান্তিকর বলে মনে হয় না, এটা তাঁর কাছে আবিষ্কারের মতো।

ফোন বাজল। উঠে রিসিভার তুললেন কুহেলি, 'হ্যালো।'

'ঘুম ভাঙালাম?' রুদ্র রায়ের গলা।

'উঠে পড়েছি। চা খাচ্ছি। তুমি?'

'বাঃ। আমিও চা খাচ্ছি। শোন, চটপট স্নান করে নাও। ঠিক দেড়টার সময় মোকাম্বোতে চলে এস। লাঞ্চ করে অফিসটা দেখতে যাব।'

'দেড়টা? বাব্বা। আর একটু দেরি করো প্লীজ!'

'ঠিক আছে। একটা পঁয়তাল্লিশ। চটপট।' লাইন কেটে দিলেন রুদ্র রায়।

যতটা দ্রুত সম্ভব স্নান করে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন কুহেলি, ফোন বাজল। মেজছেলের গলা, 'শুনলাম মিস্টার পাকড়াশি নাকি মারা গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে?'

'কি তাহলে?' মাথায় ঢুকছিল না কুহেলির।

'বাবার কেনা জমিটার কি হবে?'

'দ্যাখো, তোমার বাবা কোথায় কোন জমি কিনেছিলেন তা আমাকে বলে যাননি। মিস্টার পাকড়াশি বলেছিলেন তিনি জানেন। কিন্তু কোথায় সেই জমি তা বলেননি। তোমার বা তোমাদের যদি এত উৎসাহ থাকে তাহলে খুঁজে বের কর।'

'আশ্চর্য! দলিল না থাকলে কোথায় খুঁজব?'

'তাহলে খুঁজো না। আমি তো বলেছি আমার কাছে কোন দলিল নেই। আমি একটা জরুরী কাজে বেরুচ্ছি, বেশ দেরি হয়ে গেছে—।'

'দাঁড়াও। ভদ্রলোক কি বলেছিলেন ওঁর জমির গায়েই বাবার জমি?'

'হ্যাঁ। সেইরকম বলেছিলেন।'

'গোবিন্দপুরে ওঁর জমিটা কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! এত টাকা পড়ে আছে অথচ তুমি ইন্টারেস্ট নিচ্ছ না?'

'সব ব্যাপার তো আমাকেই দেখতে হচ্ছে, এটা তোমরা দ্যাখো না।'

'বেশ। ভদ্রলোকের ঠিকানা বল!'

'আমি জানি না।'

'ও। নিশ্চয়ই দিদি জানে। আমি ঠিকানা নিয়ে ওঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করছি। ওঁর জমিটা কোথায় জানতে পারলে আমাদেরটাও পেয়ে যাব। আমার খুব টাকার দরকার নইলে কে এ সবে মাথা ঘামাতো!'

'আমি রাখছি!' কুহেলি ফোন রেখে দিলেন। তিনি জানেন মেজছেলে সেজকে তাতাবে। নিশ্চয়ই দুজনে মিলে জমিটার খবর নেবে। পাবেও। কিন্তু ওরা গেলে মিস্টার পাকড়াশির মেয়ে নিশ্চয়ই ভাল ব্যবহার করবে না। আর কি হবে?'

পাঁচমিনিট দেরি হয়ে গেল মোকাম্বোর সামনে পৌঁছাতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কুহেলি কাউকে দেখতে পেলেন না। অথচ রুদ্রর এখানেই থাকার কথা। মোকাম্বো রেস্টুরেন্ট কোথায় তা জানা ছিল না কুহেলির। ভাগ্যিস ট্যাক্সিওয়ালা চিনতো। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ট্যাক্সি এসেছিল বেশ দ্রুত। ভাড়া মিটিয়ে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে ডাকলেন কুহেলি। তাঁর দেরি দেখে কি রুদ্র ফিরে গেছে? বিদেশে থাকা মানুষরা কি এত সময় ধরে বলে। অথচ রুদ্রর আচরণ, বাংলা কথায় একটুও বিদেশী ছাপ নেই।

হঠাৎ মনে হল রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দেখা যাক। দারোয়ান সেলাম জানাল, দরজা খুলে দিল। ভেতরটায় অল্প আলো। সুন্দর সাজানো। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে দূরে রুদ্রকে দেখতে পেলেন কুহেলি। হাত তুলেছে। কিন্তু রুদ্র একা নয়, ওর পাশের চেয়ারে আর এক ভদ্রলোক বসে আছেন?

টেবিলের কাছ যেতেই ওঁরা দুজন উঠে দাঁড়ালেন। রুদ্র এগিয়ে এসে একটা চেয়ার ঠিক করে দিল বসার জন্যে। বসতে বসতে কুহেলি বললেন, 'আমার একটু দেরি হল।'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। আলাপ করিয়ে দিই, মিস্টার কৃষ্ণান, আমার পার্টনার। কৃষ্ণান, শী ইজ কুহেলি হু অলওয়েজ ইন্সপায়ারস মি।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' হাত বাড়ালেন কৃষ্ণান।

হাত মেলাতে হল। কৃষ্ণান রুদ্রকে বললেন, 'ইউ আর লাকি।'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই। কুহেলি, কি খাবে বল?' ওয়েটারকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন রুদ্র। কৃষ্ণান ইংরেজিতে বললেন, 'মেনু আপনি পছন্দ করুন।

'বা রে। আপনারা কি খেতে ভালবাসেন তা তো আমি জানি না।'

কৃষ্ণান বললেন, 'আমি পছন্দ করি চাইনিজ খাবার।'

'তাহলে চাইনিজ হোক।' কার্ড দেখে খাবারের অর্ডার দিলেন কুহেলি।

রুদ্র বললেন, 'কৃষ্ণানের সঙ্গে আলাপ হল। এখান্ থেকে আমরা যাব ডালহৌসিতে। সেখানে একটা বড় অফিস নিয়েছি আমরা। আজকে ফার্নিচারের কাজকর্ম হচ্ছে। এই অফিসটা কৃষ্ণানই দেখবে তোমার সহযোগিতায়।'

'মানে?'

'তোমাকে অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখতে হবে। প্রতিদিনের কালেকশন ব্যাঙ্কে ঠিকঠাক জমা দিতে হবে। তোমার যা যা করণীয় তা কৃষ্ণান বুঝিয়ে দেবেন। নার্ভাস হওয়ার কোন কারণ নেই।' রুদ্র রায় বললেন।

কৃষ্ণান মাথা নাড়লেন। 'কুহেলি, রায়ের মুখে আপনার কথা আমি যা শুনেছি তাতে আমার মনে হয় আপনি সহজেই কাজটা করতে পারবেন। তাছাড়া—।' বলে থামলেন কৃষ্ণান। রুদ্রর দিকে তাকালেন।

'থামলে কেন?' রুদ্র বায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি গর্ব করে বলি যে আমার একটা ক্ষমতা আছে। আমি মানুষের মুখ দেখে বলতে পারি তার মনের গঠন কিরকম!'

'আচ্ছা!' কুহেলি কৌতূহলো হলেন, 'আমারটা বলুন তো?'

কৃষ্ণান হেসে মাথা নাড়েন, 'না, থাক।'

'কেন? বলা যাবে না? এত খারাপ?' কুহেলি হাসলেন।

'আপনি যদি খারাপ হতেন তাহলে হাসতেন না। ওয়েল, আপনার মনে জোর আছে। সেইসঙ্গে ভয় পান খুব। হয়তো ভয় থেকেই জোরটা আসে। বেসিক্যালি আপনি খুব রোমান্টিক কিন্তু সেটা নারকোলের মতো, শক্ত আড়াল রাখেন।' কৃষ্ণান কথা শেষ কার মাত্র রুদ্র বললেন, 'চমৎকার। সবটাই ঠিক।'

মাথা নাড়লেন কুহেলি, 'আপনি রুদ্রর কাছ অনেক কিছু শুনেছেন।'

'না ম্যাডাম। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে উনি কোন কথা বলেননি।'

'বেশ। এ থেকে আপনার কি করে মনে হল এত বড় কাজ আমি পারব?'

কৃষ্ণান বললেন, 'দেখুন, সব ডিপার্টমেন্টেই এফিসিয়েন্ট স্টাফ থাকবে। কিন্তু এদের সবার ওপরে একজন আমাদের লোক চাই যাঁর ওপর আমরা বিশ্বাস রাখতে পারব। ওরা যখন আপনাব নাম সুপারিশ করেছে তখন—!'

খাবার এল। কুহেলি লক্ষ করেছিলেন খাওয়ার আগে ওঁরা কোন হার্ড ড্রিঙ্ক নেননি। কেন জানেন না, তার ভাল লাগল।

খাওয়া শেষ করে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। গাড়ি ছিল। ওখান থেকে ডালহৌসিতে পৌঁছাতে দেরি হল না। লিফটে চেপে তিনতলায় পৌঁছে অফিস

দেকে চমকে গেলেন কুহেলি। বিশাল ফ্লোর। প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে ঘর করা হয়েছে একেবারে শেষের দিকে একটি ঘর পুরো তৈরী। সেখানে ঢুকে কৃষ্ণান বললেন, 'এটি আপনার ঘর। কালকের মধ্যে এসি বসে যাবে। আপনার ঘরে মনিটর থাকবে। পুরো অফিসে কোথায় কি হচ্ছে তার ছবি আপনি ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবেন।'

রুদ্র রায় বলবেন, 'কৃষ্ণান, তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বল। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। একটু বুঝিয়ে বললেই কুহেলির কোন অসুবিধে হবে না।'

রুদ্র রায় বেরিয়ে গেলে কৃষ্ণান টেবিলের ওপাশের বড় চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন কুহেলিকে। কুহেলি মাথা নাড়ল, 'না না, এখানে বসছি আমি।'

'ম্যাডাম। আপনার উচিত ওই চেয়ারে বসা। প্রথম দিন থেকেই আপনার ভাবা উচিত চেয়ারটা আপনার। সেটা ভাববে অফিসটাকে নিজের মনে করতে পারবেন।'

অতএব কুহেলিকে বসতে হল। অত্যন্ত আরামদায়ক চেয়ার। পাশের চেয়ারে বসে কৃষ্ণান বললেন, 'রায় নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রজেক্টের কথা বলেছে আপনাকে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি আপনার মুখে শুনতে চাই।' কুহেলি বুঝতে পারলেন না হোটেল, ডিস্ট্রিলারি অথবা ইনভেস্টমেন্ট ব্যবসার কোন্‌টা কৃষ্ণান তাঁকে বলছেন।

'এই মুহূর্তে আমাদের কয়েক কোটি টাকা লোন ব্যবসায় খাটছে। আমরা বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিকে শর্টটার্ম লোন দিয়ে থাকি। তার আলাদা অফিস, আলাদা কর্মচারী। কিছুদিন থেকেই আমার বুঝতে পারছিলাম যত লোক লোন চাইছে তত আমরা দিতে পারছি না। রায় বিদেশ থেকে যতটা সম্ভব এসেছে কিন্তু এর বেশী আনতে আইনের অসুবিধে আছে। অথচ টাকার জন্যে সবাই হাত বাড়িয়ে আছে। এই টাকা যোগাড় করতে পারলে আমরা একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারব।' কৃষ্ণান থামতেই কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যারা লোন নিচ্ছেন তারা যদি ফেরত না দেন?'

'না ম্যাডাম। সেটা সম্ভব নয়। আমরা ইম্পোটারদের মালের বিনিময়ে লোন দিই। লোনের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিলে মাল রিলিজ করে দিই। কিন্তু মাঝে মাজে খুব ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট চলে আসে। গত মাসে মুম্বাই পোর্টে দু লক্ষ ইতালিয়ান জুতো কেউ আমদানি করেছে। কিন্তু যে করেছে সে টাকা দিয়ে জুতো ছাড়াতে যায়নি। ওগুলো পেমেন্ট এগেনস্ট অর্ডার রিসিভ ছিল। কিছুদিন অপেক্ষা করে কাস্টমস মাল সিজ করে নিলামে তোলে জুতোগুলো। তখন দেখা গেল প্রতিটি জুতো ডান পায়ের, বাঁ পায়ের একটাও নেই। শুধু এক পায়ের জুতো কেউ কিনতে চাইল না। নিলামের সময় একজন লোক অবিশ্বাস্য কম দামে ডেকে

জুতোগুলো নিয়ে গেল। সে বলল মুচিকে দিয়ে এই জুতোর এক একটা বাঁ পায়ের করে নেবে। খবরটা আমরা পেলাম কিন্তু বিশ্বাস করলাম না। গতকাল কলকাতা পোর্টে দুলক্ষ জুতো এসেছে। আমি নিশ্চিত ওগুলো বাঁ পায়ের। যে মুম্বাইতে ডান পায়ের জুতো কিনেছে সে-ই আসবে নিলামে এগুলো কিনতে। তারপর ডান বাঁ একসঙ্গে করে প্রচুর দামে বিক্রি করবে।'

'এই তঞ্চকতা কেন?'

'ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যে। ইতালিয়ান জুতো আমদানি করলে প্রচুর ডিউটি দিতে হয়। নিলাম কিনলে সেটা লাগে না। একপায়ের জুতোর দাম নিলামে বেশি উঠবেই না, খদ্দেরই পাওয়া যাবে না। কাস্টমস যা পাওয়া যাচ্ছে তাই লাভ বলে ছেড়ে দিয়েছিল। ওই টাকার পরিমাণে ডিউটি অনেক কম। এবার কলকাতায় নিলাম হবে। আমরা বিড্ করব। ওই লোকটির চেয়ে বেশি দাম দেব। ডান পায়ের জুতোগুলোর গতি করতে ও আরও বেশি দাম বলতে বাধ্য হবে। শেষ পর্যন্ত ডিউটির সমান বা তার চেয়ে বেশি দাম বলে আমরা ছেড়ে দেব। ওই টাকা লোকটাকে তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হবে না যদিও কিন্তু সময়ও বেশি পাবে না। তার জন্যে আমরা আছি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।' কৃষ্ণান হাসলেন।

'আপনারা চাইছেন জনসাধারণ আপনাদের কাছে টাকা রাখুক—!'

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আপনাদের নয়, আমাদের বলুন।'

কুহেলি হেসে পেললেন, 'বেশ। আমাদের কাছে জনাসাধারণ যে টাকা বাখবে তা দিয়ে আমরা ব্যবসা করব। সেই ব্যবসার যে লাভ হবে তা থেকে মাসে শতকরা চার ভাগ সুদ ওঁদের দিলেও আমাদের প্রচুর লাভ থাকবে। তাই তো?'

'অ্যাবসিলিউটলি।' কৃষ্ণান মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু লোকে জানবে কি করে? আমরা কি বিজ্ঞাপন দেব?'

হাসলেন কৃষ্ণান, 'আপনার বাড়িতে ভগবান শিব এসেছেন, এই খবরটা যদি ফিসফিসিয়ে চারজনকে বলি তাহলে আজ বিকেলে এক লক্ষ লোক আপনার পাগল করে দেবে। গণেশকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে এবং তিনি খাচ্ছেন এটা সারাদেশে প্রচার করতে এক পয়সাও বিজ্ঞাপনে খরচ করতে হয়নি। প্রতি মাসে এক তারিখে আপনি ফোর পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পাবেন এই খবরটা সেরকমই। হু হু করে ছড়িয়ে পড়বে।'

'আমরা কি সরাসরি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে টাকা নেব?'

'সরাসরি যারা দিতে চান নেব, আবার এজেন্টদের মাধ্যমেও নিতে পারি।'

'এজেন্টরা কত কমিশন পাবেন?'

'ওয়ান পার্সেন্ট। অর্থাৎ মাসে একশ টাকায় আমরা পাঁচ টাকা সুদ এবং কমিশন দেব। আর হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকার নিচে হলে আমরা চেক নেব না।'

কৃষ্ণান একমুহূর্ত ভাবলেন, 'আপনাকে সমস্ত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করতে আমাদের কাগজপত্র আজই দিয়ে দেব। বাড়িতে দয়া করে স্টাডি করবেন। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে আগামি মাসের এক তারিখ থেকে আমরা কাজ শুরু করব।'

'আমার কাজ ঠিক কি হবে তা যদি বকেন?'

'সব লেখা আছে কাগজে, পড়লেই বুঝতে পারবেন। এবার ম্যাডাম, আপনার রেমিউনারেশনের ব্যাপারে কথা বলা যাক।' কৃষ্ণান বললেন।

'এ ব্যাপারে আপনারাই ঠিক করুন।'

'আপাতত মাসে ত্রিশ হাজার, এ ছাড়া প্রতিমাসে দশ হাজার টাকার রেস্টুরেন্ট বিল সই করতে পারবেন ক্লায়েন্টদের এনটারটেনমেন্টের জন্যে। এছাড়া সারা বছরের লাভ থেকে ওয়ান পার্সেন্ট আপনাকে দেওয়া হবে।'

'আমাকে ঠিক কি কাজ করতে হবে? কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'মনিটারিং। এই অফিস তিনটে ভাগে বিভক্ত হবে। ক্যাশ সেকশন, অ্যাকাউন্টস, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ক্যাশ সেকসনের চীফ হবেন হেড ক্যাসিয়ার, চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট দেখবেন অ্যাকাউন্টস সেকশন। ক্যাশ সেকসনে লেনদেন হবে। অ্যাকাউন্টস সেকশন সবচেয়ে জরুরি। ওঁরাই হিসেব করবেন কে কত টাকা সুদ পাচ্ছে। সেইমত ক্যাস সেকশনকে জানিয়ে দেবেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন আয়তনে ছোট। তারা কর্মচারীদের মাইনে, ছুটি, অফিসের নানান সমস্যা দেখাশোনা করবে। আর এইসবগুলো যাতে ঠিকঠাক চলে তা দেখার দায়িত্ব আপনার। আপনাকে যে পাইল পাঠাবো সেটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন, আপনাকে কি কি করতে হবে জেনে যাবেন। আমি শুধু একটা কথা বলব, কোটি কোটি টার্নওভার হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেখানে সেখানে আপনি কাউকে বিশ্বাস করবেন না। এমন কি আমাকে বা রায়কেও না।' কৃষ্ণান বললেন।

'সেকি! আপনারাই আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন আর আপনাদের অবিশ্বাস করব?'

'হ্যাঁ। ধরুন আমি এক বিকেলে এসে বললাম, ম্যাডাম দু লক্ষ টাকা আজকের ক্যাশ থেকে দিতে বলুন, খুব দরকার আছে। আমি কাল ফার্স্ট আওয়ারে ফেরত দেব। আপনি দেবেন না। বলবেন, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিন মিস্টার রায়কে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে তাহলে টাকাটা পাবেন। ঠিক এই কথাটা মিস্টার রায়কে বলবেন উনি যদি টাকা চান।'

'কেন?' কুহেলি অবাক হলেন।

'কে বলতে পারে, পরের দিন সকালে টাকাটা দিতে পারলাম না ফেরত অথবা নিয়েছি যে সেটাই ভুলে গেলাম। অতএব কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

প্রমাণ না রেখে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। নেওয়ার আগে যাচাই করে নেবেন।'

কৃষ্ণানের কথা শেষ হতেই রুদ্র রায় এসে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝে নিয়েছ?'

কৃষ্ণান বললে, 'ম্যাডাম যথেষ্ট ইনটিলেজেন্ট। বাকিটা ফাইল পেলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ও হ্যাঁ, রেকর্ড রাখার জন্যে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন দরকর।'

'পেয়ে যাবে।' রুদ্র রায় হাসলেন।

বিকেল হয়ে এসেছিল। কৃষ্ণানকে পার্কস্ট্রিটে নামিয়ে দিতে হবে। গাড়িতে উঠে রুদ্র রায় বললেন, 'একটু চা খেলে হত।'

কৃষ্ণান বলল, 'বেশ তো। পার্ক স্ট্রিটের ফ্লুরিকে বসা যাবে।'

'ফ্লুরিকের চা ভাল?'

'খুব ভাল।' কৃষ্ণান মাথা নাড়ল।

হঠাৎ হৈ হৈ করে গাড়ি থামাতে বললেন রুদ্র রায়। গাড়ি তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল ছাড়িয়ে রাজভবনের কাছাকাছি চলে এসেছে। বাঁ দিকের ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়ালে রুদ্র রায় বললেন, 'নেমে এসো, চমৎকার চা খাওয়াবো।'

কুহেলি চারপাশের কোথাও চায়ের দোকান দেখতে পেলেন না। রুদ্র রায় ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাত-ঘেঁষা ভাঁড়ের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণান বললেন, 'মাঝেমধ্যেই রায় এমন অদ্ভুত পাগলামি করে। আপনি গাড়িতে বসুন ম্যাডাম, চা ভাল লাগলে আপনাকে এখানেই দিয়ে যাবে।' কৃষ্ণান নামলেন।

কৃষ্ণান পাশে গেলে রুদ্র রায় বললেন, 'ভাল করে গরম জলে ভাঁড় ধুয়ে আমাদের জন্যে ফ্রেস চা বানাতে বলেছি।'

'খাওয়া যাবে?' কৃষ্ণান গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

রুদ্র জবাব না দিয়ে চা-ওয়ালাকে বললেন, 'এই যে ভাই, সাহেব জিজ্ঞাসা করছেন তোমার চা খাওয়া যাবে কিনা? কি বলব?'

লোকটি হিন্দীতে জবাব দিল, 'গরীব আদমি হ্যায়, চা ভি গরীব হোগা।'

হাসলেন কৃষ্ণান, 'সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

কুহেলি খুব অবাক হয়েছিলেন। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা যে করছে, বিদেশে যে দীর্ঘকাল থেকেছে সে ফুটপাতের চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে চাইছে অথচ রাত্রে দিশি মদ সহ্য হয় না বলে স্কচ খায়? এটা কি লোক দেখানো ব্যাপার? দ্যাখো আমার অত টাকা থাকা সত্ত্বেও আমি কি সহজ সরল? যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে রুদ্র রায় এখনও অবোধ্য। আর যদি ওসব না হয়, ভেতর থেকেই ব্যাপারটা আসে তাহলে এরকম লোককে ভাল না বেসে পারা যায় না।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে রুদ্র বললেন, 'গ্র্যান্ড।' তারপর গাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নেমে এসো। নইলে মিস করবে।'

কুহেলি নেমে এলেন। কৃষ্ণান চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম?'

'সিকি। সাহেব বোলা বড়িয়া হোনেসে আধুলি দেগা।'

'এক ভাঁড় চায়ের কাম মাত্র চার আনা? ভাবতে পারছি না।'

'পার্কস্ট্রিটে এক কাপ চায়ের দাম কত?'

'মিনিমাম পাঁচ টাকা।'

'আমি ওকে দেড় টাকা দেব। দিয়ে পনেরো টাকার আনন্দ পাব। মেম-সাহেবকে দাও।'

চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে কুহেলি দেখলেন কাছাকাছি ভিড় জমেছে। ওই চেহারার পুরুষ এবং মহিলা বোধহয় এরকম দোকানে চা খায় না, তাই লোকে এ অবাক হয়ে দেখছে। কুহেলি দেখলেন চায়ের স্বাদ মন্দ নয়।

চা খাওয়ার পর ডাবল দাম দিয়ে ওঁরা যখন গাড়ির দিকে ফিরছিলেন তখন একজন পুলিশ সার্জেন্ট মোটরবাইক থেকে নেমে ড্রাইভারের লাইসেন্স চাইল। সূর্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার অফিসার?'

'এখানে পার্কিং নেই কিন্তু আপনারা গাড়ি রেখেছেন।'

'আমরা জানতাম না।'

'ওই তো বোর্ড রয়েছে। দেখা উচিত ছিল। লাইসেন্স দাও।'

ড্রাইভার তার লাইসেন্স দিতে অফিসার একটা রশিদ লিখে এগিয়ে দিলেন। ফাইনটা ব্যাঙ্ক ফোন করে লালবাজার থেকে দুদিন পরে লাইসেন্স নিয়ে যেয়ো। ততদিন এই রশিদটা গাড়িতে রাখবে লাইসেন্সের বদলে।'

অফিসার তাঁর বাইকে উঠতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণান প্রশ্ন করল, 'অফিসার, আপনি কত টাকা ফাইন করলেন?'

'তিরিশ টাকা।' অফিসার চলে গেলেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন কৃষ্ণান।

রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসির কি হল?'

কৃষ্ণান বললেন, 'চায়ের দাম দেড় টাকা প্লাস ফাইন তিরিশ। অর্থাৎ একত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তিন দিয়ে ভাগ করলে প্রতিটি ভাঁড়ের জন্যে দাম দিতে হল দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। পার্ক স্ট্রিটের চায়ের দ্বিগুণের বেশি, তাই না?'

এবার কুহেলিও হেসে ফেললেন, 'বাঃ, আপনি তো হিসেব ভাল বোঝেন।'

রুদ্র রায় বললেন, 'হ্যাঁ, বেশি বোঝে বলে বিয়ে করতে পারেনি।'

কৃষ্ণান মাথা নাড়লেন, 'না। আসলে এখনও হিসেবী মেয়ের দেখা পাইনি।'

পনরো

কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ততায় কেটে গেল। কৃষ্ণানের পাঠানো ফাইল পড়ে সবটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল তাঁর। বোঝার পরে মনে হল অনেকটা শ্রম দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু এই শ্রম তাকে মর্যাদা দেবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার এমন সুযোগ সে কখনও পাবে না। রুদ্র রায় দিল্লিতে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ থেকে ব্যবসার ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে আসতে। রুদ্র রায় এবং কৃষ্ণানের এই ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির নাম 'সঞ্চয়'। ইচ্ছে করেই কোন ইংরেজি নাম রাখেননি ওরা। গত এক বছরে কোম্পানি কত টাকার ব্যবসা করেছে, কি লাভ হয়েছে তার বিশদ ওই ফাইল থেকে জানতে পেরেছেন তিনি। কোম্পানি যা লাভ করবে তা থেকে আমানতকারীদের বছরে আটচল্লিশ ভাগ সুদ দিতে কোন অসুবিধে নেই। আয় হবে বহুগুণ। তবে এত সুদ দেওয়ার জন্যে ব্যাঙ্কগুলো আপত্তি করতে পারে। তাতে তাঁদের ব্যবসা মার খাবে। তাই সুদ না বলে ডিভিডেন্ড বলতে চাইছে কোম্পানি। তাতে ব্যাঙ্কের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

আজ সকালে পাখি মনে করিয়ে দিয়েছে, সন্ধেবেলায় রবীন্দ্রসদনে যেতে হবে। ওই মঞ্চে আজ বি এফ জে এ পুরস্কার দেওয়া হবে প্রাপকদের। কার্ডের নাকি খুব চাহিদা। একসঙ্গে সন্ধে ছটায় বেরুতে চায় পাখি।

মেয়ে প্রথমবার পুরস্কার নিতে যাচ্ছে, দেখার আগ্রহ কুহেলির ছিল। কিন্তু একটু বেলা হতেই টেলিফোন আসতে লাগল। প্রথমে ফোন করল সুজাতা, 'মা, তুমি নিশ্চয়ই আজ রবীন্দ্রসদনে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও যাব। পাখি পুরস্কার নেবে আর আমি দেখব না?' সুজাতা বলল।

'কিন্তু কার্ড তো আর নেই রে। পাখি বলেছে কার্ডের খুব চাহিদা।'

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি ব্যবস্থা কর। আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যে তোমার কাছে চলে যাব। আর হ্যাঁ, অনেক কথা আছে, গিয়ে বলব।' টেলিফোন নামিয়ে রাখল সুজাতা।

এখন কি করা যায়? কুহেলি ফাঁপড়ে পড়লেন। আচ্ছা, পাখি তো পুরস্কার পাচ্ছে, ও কি সবসময় নিজের সিটে বসে থাকবে? ওকেও কি ঢোকার সময় কার্ড দেখাতে হবে? ভেবে পাচ্ছিলেন না কুহেলি।

একটু বাদে শিবানীর ফোন, 'কুহেলিদি, আজ পাখি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কি বাণের জলে ভেসে এসেছি?'

'তার মানে?'

'ওঃ, তুমি একটি টিউবলাইট। আমি কি যাব না?'

'কি করব শিবানী, কোন কার্ড নেই।'

'টাকা দিলে কার্ড পাওয়া যাবে না এ হতে পারে? তুমি কার্ড ম্যানেজ কর, আমি টাকা দিয়ে দেব। বিকেল বিকেল পৌঁছে যাব তোমার ওখানে। ফিল্ম আর্টিস্টদের ব্যাপার, বেশ মাঞ্জা দিতে হবে। আচ্ছা, সুচিত্রা উত্তম আসবে?'

'আমি কি করে বলব?'

'ওঃ, একটু খবর নাও না। দুজনকে একসঙ্গে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। ঠিক আছে? রাখছি।'

কুহেলি ঠিক করলেন, তিনি নিজেই যাবেন না। না গেলে এদের কিছু বলার থাকবে না। এগারোটা নাগাদ তৃতীয় ফোনটা এল রুদ্র রায়ের, 'দারুণ কাজ হয়েছে। বেলা সাড়ে বারোটার ফ্লাইট ধরছি। সাড়ে তিনটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাব। আজ সন্ধেবেলায় দেখা হচ্ছে নিশ্চয়ই।'

'আজকে? আমি ফোন করব। মেয়ের অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার অনুষ্ঠানে যদি না যাই—।'

'সেকি? এরকম একটা অনুষ্ঠানে যাবে না মানে? সেই বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, চল, আমরা একসঙ্গে ওখানে যাব। শেষ হলে সবাই মিলে ডিনার করব। ওকে!' ফোন রেখে দিলেন রুদ্র রায়।

মাথা খারাপ হয়ে গেল কুহেলির। ধীরে ধীরে উঠে এলেন তিনতলায়। পাখি তখন ব্যায়াম করছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? তুমি ওপরে?'

'কেন? আমার কি তোদের এখানে আসা নিষেধ?'

'উঃ। উলটো বকছ। এমনিতে তো আসো না! বল, কি ব্যাপার?' পাখি জিজ্ঞাসা করল।

'খুব মুশকিলে পড়েছি। তোর দিদি শুনে যেতে চাইছে।'

'দিদি? ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে গেলে হয়তো ঢুকতে পারবে।'

'হয়তো?'

'কি করব? আমাকে চারটে কার্ড দিয়েছে, আর চাওয়া যায় না।'

'চারটে? আর একটা কে?

'বাঃ। প্রবাল যাবে না?' ঘুরে আবার ব্যায়াম শুরু করল পাখি।

ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন কুহেলি। শিবানীকে হয়তো কাটানো যাবে

কিন্তু সুজাতা আর রুদ্রকে তিনি কি করে বোঝাবেন!

হঠাৎ মনে হল স্বপন গুপ্তকে টেলিফোন করলে হয় না? মনে হওয়া মাত্র নিজের খাতা থেকে নাম্বার বের করে ডায়াল করলেন কুহেলি। স্বপন গুপ্তই ফোন ধরলেন, 'বলুন।'

'আমি কুহেলি সেন বলছি। পাখির মা। অভিনন্দন।'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। আজ আসছেন তো?'

'বুঝতে পারছি না, খুব সমস্যায় পড়েছি।' কণ্ঠস্বর আদুরে হয়ে গেল।

'যেমন?'

'আমার বড় মেয়ে আর ঘনিষ্ঠ দুজন যেতে চাইছেন, অথচ কার্ড নেই।'

'তাই? আপনার কাছে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে। কটা কার্ড?'

'তিনটে।'

'তাহলে আসছেন?'

'নিশ্চয়ই। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো।'

'না বলাই ঠিক হবে। রাখছি।' স্বপন গুপ্ত ফোন রেখে দিলেন।

খুব রাগ হয়ে গেল কুহেলির। লোকটা যেন কি! এমন কাঠখোট্টা ব্যবহার কেউ মহিলাদের সঙ্গে করে? ঠিকই শুনেছেন তিনি, ওঁর নজর যত টিনএজারদের দিকে। হয়তো অক্ষম পুরুষ, অল্পবয়সীদের সঙ্গে গা ঘষে সাধ মেটায়! তা মেটাক। এক কথায় টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছে তো!

বিকেল পাঁচটায় শিবানী এসে গেল উর্বশী হয়ে। কি সাজ সেজেছে। এসে বলল, 'ওমা, তুমি এখনও রেডি হওনি?'

'শাড়ি পালটে নিলেই হবে।'

'অবশ্য তুমি না সাজলেও আমাদের টেক্কা দেবে। এখন বলতো, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?' শিবানী পোজ দিল।

'দারুণ।'

'উত্তমকুমার তাকিয়ে দেখবেন?'

'কাছাকাছি গেলে না তাকিয়ে পারবেন না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' শিবানী স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

কুহেলি তৈরি হতে না হতেই সুজাতা চলে এল। তার সাজে বাড়াবাড়ি নেই। তবে খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে। একটু ধন্দে পড়েছিলেন কুহেলি। মেয়ে পুরস্কার নেবে। এই দৃশ্য দেখতে মায়ের কিরকম সাজে যাওয়া উচিত? পোশাক যাতে তাঁর শরীরে মা মা ভাব ফুটিয়ে তোলে সেটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু শিবানী এবং সুজাতার তীব্র আপত্তিতে ভেসে গেল সেই ভাবনা। অত অফ্ হোয়াইট শাড়ি পরা

চলবে না। মা মানে কি বুড়ি সেজে থাকা?

রুদ্র রায় চলে এলেন। সাদায় শরীর মোড়া। জুতো থেকে ঘড়ির স্ট্র্যাপ সবটাই। সাদা শার্টের ওপর সাদা জ্যাকেটে চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। শিবানী রসিকতা না করে পারল না! আপনি তো আজ হিরোদের বাজার কেড়ে নেবেন!'

কুহেলি রসিকতা করলেন, 'উত্তমকুমারের?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল শিবানী, 'না। সেটা অসম্ভব।'

হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল পাখি, 'তোমরা রেডি?' পেছনে শুদ্ধ।

অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি ছোটমেয়েকে দেখে। একটা আগুনরঙা শাড়ি পরেছে সে। শরীরটাকে এমনভাবে মুড়েছে যে শিখার মতো দেখাচ্ছে। সুজাতাও বলল, 'কি দারুণ দেখাচ্ছে!'

সুজাতা জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না, 'তুই নিজে নিজে শাড়ি পরলি?'

'অনেকটাই। বাকিটা ভাই হেল্প করেছে।' পাখি জানাল।

'ও হেল্প করেছে মানে? ও শাড়ি পরার কি জানে!' অবাক কুহেলি।

'ও এখন অনেক কিছু শিখছে, তুমি খবর রাখো না।' পাখি হাসল। শুদ্ধ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছিল লজ্জা পাচ্ছে।

এইসময় রুদ্র রায় এগিয়ে গেলেন পাখির দিকে। তার হাতে একটা প্যাকেট, 'আজ শুরু হল, কিন্তু উই প্লে টু গড যাতে তিনি তোমাকে সবচেয়ে বড় পুরস্কারের জন্যে যোগ্য করে তোলেন। অভিনন্দন।' প্যাকেটটা দিলেন তিনি পাখির হাতে।

পাখি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল রুদ্র রায়ের দিকে। সম্পূর্ণ অচেনা একটি মানুষ, এ বাড়িতে যাঁকে প্রথম দেখছে, তাকে কিছু উপহার দিল! শিবানী এগিয়ে এল, 'পাখি, ইনি হলেন রুদ্র রায়, এতদিন বিদেশে ছিলেন, দেশে খুব বড় ব্যবসা শুরু করেছেন। আর এ হচ্ছে কুহেলিদির বড় মেয়ে, সুজাতা।'

সুজাতা নমস্কার করল। পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি বলে ডাকব?'

'যা বলে ডাকলে তোমার ভাল লাগবে ইয়ং লেডি।'

'রায় মামা?'

শিবানী খিঁচিয়ে উঠল, 'আগেই মামার কথা মনে এল? কাকা, রায়কাকা বলতে দোষ কোথায়?'

সবাই হাসলেও কুহেলি আড়চোখে শিবানীর দিকে তাকালেন। শিবানী নিশ্চয়ই বুঝে সুঝে কথাটা বলল। রুদ্রর সঙ্গে এখন তিনি ভাইবোনের সম্পর্কে থাকতে পারেন না, এটা ওর বোঝা হয়ে গিয়েছে।

প্যাকেটটা খুলল পাখি। একটা ছোট্ট লম্বাটে প্লাস্টিকের বাক্স। সেটা খুলেই তার চোখ বড় হয়ে গেল, চেঁচাল পাখি, 'কি দারুণ।'

শিবানী হাত বাড়াল, 'দেখি। তারপর তোমর সামনে একটা মেয়েলি ঘড়ি তুলে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক। এরকম ঘড়ি আমি এখানে কারও হাতে দেখিনি।'

'এমন কিছু নয়। বাড়িয়ে বলছ।' রুদ্র রায় হাসলেন।

'অ্যাটলিস্ট চার হাজার টাকা দাম হবে। তাই না? এই তো সুইজারল্যান্ডে তৈরি।' শিবানী পাখিকে দেখাল। পাখি ওটা হাতে গলাতেই চমৎকার মানিয়ে গেল।

রুদ্র রায় বললেন, 'এই এতক্ষণে ঘড়িটা দামি হল।'

চমকে তাকাল পাখি। তারপর বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

এই তাকানোটা পছন্দ হল না কুহেলির। রুদ্র এত সাজিয়ে গুছিয়ে একটা বাচ্চা মেয়েকে স্তুতি জানাল কেন? কি দরকার!

শুদ্ধ ফিসফিস করে কিছু বলতেই পাখি ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর পুরোনো ঘড়িটা খুলে কুহেলির হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দাও। এখন চল, নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

শিবানী ওর গাড়িতে পাখিকে তুলে নিল, সঙ্গে শুদ্ধ। সম্ভবত, পাখির সঙ্গে থাকলে ভি আই পি এনক্লোজারে ঢোকা যাবে, তাই। ড্রাইভারের পাশে বসলেন রুদ্র। পেছনে সুজাতা এবং কুহেলি। দুটো গাড়ি রওনা হল রবীন্দ্রসদনের দিকে।

সুজাতা চুপচাপ বসেছিল জানলার বাইরে তাকিয়ে। ঠিক তার মনে কয়েকটা প্রশ্ন ছোবল মারছিল। এই রুদ্র রায় লোকটা বিদেশ থেকে এদেশে একে বড় বড় ব্যবসা করতেই পারে কিন্তু মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক হল কবে? ঝট করে নয়, আগে ভেবে চিন্তে এসেছিল পাখিকে অমন দামি ঘড়ি উপহার দেবে বলে। আর কেউ তো পাখিকে কিছু দেয়নি, উনি না চিনেও নিয়ে এলেন কেন? মায়ের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়? যে মা তাকে সকালে বলেছিল আর কোন কার্ড নেই সেই একই মানুষ আরও তিনটে কার্ড জোগাড় করেছে যার একটায় যাচ্ছে ওই রুদ্র রায় লোকটা। শিবানী মাসীর কথা বাদ দেওয়া যাক, মা কি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছিল না সেই জন্যই কার্ড নেই বলে কাটাতে চেয়েছিল? অর্থাৎ মায়ের কাছে তার আলাদা কোন মূল্য নেই।

সুজাতা রাস্তা দেখল। গাড়ি ধর্মতলায় ঢুকছে। সে বলল, 'মা, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, আমাকে এখানে কোথাও নামিয়ে দাও, বাড়ি যাব।'

অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি, 'শরীর খারাপ লাগছে? কি হয়েছে?'

'প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।' সুজাতা চোখ বন্ধ করল।

'হঠাৎ মাথা ধরল কেন?'

'আশ্চর্য?' সুজাতা চিড়বিড়িয়ে উঠল, 'মাথা কেন ধরে তা আমি কি করে

জানব! ধরেছে, ব্যাস।'

'তাহলে তুই পাখির অ্যাওয়ার্ড নেওয়া দেখবি না?'

'জীবনে অনেককিছু দেখিনি, আর একটা না হয় দেখা হল না।'

সামনের আসন থেকে একটু ঘুরে বসে রুদ্র রায় বললেন, 'মাথা থাকলেই সেটা ধরতে পারে। কিন্তু তা থেকে মুক্তিরও উপায় আছে। এই নাও!' একট ছোট্ট চ্যাপটা গোলাকার কৌটো এগিয়ে ধরলেন রুদ্র রায়।

'কি এটা?' সুজাতা অবাক হয়ে দেখল।

'চাইনিজ বাক্স। নর্থ বেঙ্গলে একজন দিয়েছিল। কপালের দুপাশে সামান্য ঘষলেই মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। প্লীজ, ট্রাই দিন।'

বাধ্য হয়ে নিতে হল কৌটোটা। ওপরে চিনে ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। এত টাইট যে খুলতে সময় লাগল। রুদ্র ড্রাইভারকে বলল এক পাশে গাড়ি দাঁড় করাতে।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি লাগিয়ে দেব?'

'না।' আঙুলের ডগায় মলম নিয়ে দুই রগে বোলালেন সুজাতা। বেশ ঠাণ্ডা অনুভূতি, সেই সঙ্গে ঈষৎ জ্বলুনি। জ্বলুনিটা চলে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

রুদ্র রায় বললেন, 'যদি তিন মিনিটের মধ্যে মাথা ধরা না ছাড়ে তাহলে আমরা তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব। বাড়ি কোথায়?'

'থিয়েটার রোডে।' কুহেলি বললেন।

সুজাতার মনে হল, তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে মায়ের যেন ভাল লাগবে। সে চোখ বন্ধ করল। মা কি রুদ্র রায়ের সঙ্গে একা থাকতে চায়? তার মানে মা এই বয়সে—। অবশ্য মাকে তার মা বলে মনেই হয় না। সত্যি বলতে কি, তার নিজের ফিগার মায়ের তুলনায় কিছুই না। ওই মিস্টার পাকড়াশি একবার মাকে নিয়ে রসিকতা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'ভদ্রমহিলা যদি একটু প্রশ্রয় দিতেন তাহলেতোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হত না।' খুব রেগে গিয়েছিল সুজাতা। তিনদিন কথা বলেনি। শেষে মিস্টার পাকড়াশি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

মা কি এখন এই রুদ্র রায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? ভদ্রলোককে এখন ভালই বলে মনে হচ্ছে তার। চট করে কেমন ওষুধটা এগিয়ে দিলেন বিনয়ের সঙ্গে। যদিও তার মাথা ধরেনি তবু ওষুধ লাগাবার পর বেশ হালকা লাগছে।

'কেমন লাগছে এখন?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

চোখ খুলল সুজাতা,' অনেকটাই কম।'

'গুড। ওটা রেখে দাও তোমার কাছে। পরে কাজে লাগতে পারে। আর কিছুক্ষণেব মধ্যে মাথাটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর বাড়িতে ফেরার ইচ্ছে নেই তো?'

'নাঃ।' হেসে ফেলল সুজাতা।

দ্বিতীয় সারিতে বসেছিলেন ওঁরা। টালিগঞ্জের প্রায় সব স্টার তো বটেই বোম্বে থেকেও কয়েকজন এসেছেন পুরস্কার নিতে। যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা বসেছেন সামনের বাঁ দিকে। শিবানীও পাখর সঙ্গে তাঁদের মধ্যে ঢুকে গেছে। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'মা, উত্তমকুমার এসেছেন?'

কুহেলি ভদ্রলোককে খুঁজতে চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ বাবুলালজীকে দেখতে পেলেন তিনি। তার সামনের আসনের ওপাশে দুটো হাতে নমস্কারের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন ম্যাডাম?'

কুহেলি হাসলেন, 'বাঃ। চিনতে পারব না? কেমন আছেন?'

'আছি। একটা কথা বলি। আমি সুপারি খেতে খুব ভালবাসি। তাই একটা সুপারি গাছের চারা পেয়ে মটিতে পুঁতেছিলাম। বন্ধ হওয়ার পর বুঝলাম ওটা সুপারি না, তাল গাছ। তাল গাছ যে লাগায় সে নাকি ফল খেতে পায় না। পায় তার পরের পুরুষ। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার, আপনি কি বলেন?' বাবুলাল জিজ্ঞাসা করল।

কুহেলি শঙ্কিত হলেন। বাবুলাল তাঁকে ইঙ্গিতে কিছু বলতে চাইছেন। কথা বললেই সেটা যদি খোলাখুলি বলেন তাহলে রুদ্র এবং সুজাতার সামনে অস্বস্তিতে পরতে হবে। তিনি বললেন, 'আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না, দাঁড়ান।' তারপর 'এক্সকিউজ মি' বলে রুদ্রর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলেন সামনে। ওদিকে ঘোষণা চলছে। যেন শব্দ বাঁচাতে তিনি সরে গেলেন অনেকটা। তারপর বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'দেখুন ম্যাডাম, আমি যত্ন করে বাগান তৈরী করলাম আর তার ফুল ছিঁড়ে নেবে অন্য লোকে, এটা কি ভাল লাগে? বললেন বাবুলাল।'

'নিশ্চয়ই না।'

'দেখুন, অভিনেত্রীরা তো ঘরের বউ নয়। একটু আধটু ডিরেক্টর প্রোডিউসারদের সঙ্গে নক্‌শা করবেই। ওতে কিছু মনে করি না। কিন্তু ওই প্রবাল ছোকরা, যার কোন চালচুলো নেই। একটা ছবি কোনমতে করে ছিল, যা পাবলিক দেখতে চায়নি। পাখির কথায় আমি ওকে ব্রেক দিচ্ছি আর ও পাখির মাথা খাচ্ছে। আপনার মেয়ে নাকি ওর প্রেমে পড়েছে। অথচ আমি কি না করেছি পাখির জন্যে! আরে তোর বয়স তো এখনও কুড়ি হয়নি। বহুৎ সময় পড়ে আছে প্রেমের জন্যে। আসলে ওই প্রবাল ওর ব্রেন ওয়াশ করে ওকে ধরে উঠতে চাইছে ওপরে। কি করব বলুন?'

'বাবুলালজী এসব কথা আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। আপনি পরে

একসময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আলোচনা করব।' বললেন কুহেলি।

'ম্যাডাম, আলোচনা করে কি হবে? মন হল কাঁচের মতো, ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। আমি ইচ্ছে করলে ওই প্রবালের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি। কিন্তু পাবলিক বলবে একটা মেয়েছেলের জন্যে বাবুলাল নোংরা কাজটা করল। হ্যাঁ, আপনাকে দেখে মনে হল একটু সতর্ক করে দিই। ওই প্রবাল ছেলেটাকে ওর জীবন থেকে হঠান। ওকে বিয়ে করলে পাখির ক্যারিয়ার বরবাদ হয়ে যাবে। মাথা নাড়তে লাগলেন বাবুলাল।

ঠিক তখনই প্রেক্ষাগৃহের আলো কমে এল। অনুষ্ঠানটির পরিচালক মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাবুলাল ফিসফিস করবে বললেন, 'পরশু বিকেলে আমার অফিসে আসুন।'

কুহেলি দ্রুত চলে এল নিজের আসনে। ভেতরে ভেতরে তীব্র কাঁপুনি হচ্ছিল। পাখি এই বয়সে বাবুলালদের কাছে মেয়েছেলে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ খুব কান্না পাচ্ছিল তার। বাঁ দিকে বসেছিলেন রুদ্র রায়। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করবেন, 'কি হয়েছে?'

কান্না চেপে মাথা নাড়ল কুহেলি, বোঝাতে চাইলেন, কিছু হয়নি।

রুদ্র রায় মুখ ফিরিয়ে নিতে চোখ ঝাপসা হল, অথচ রুমালের সাহায্য নিতে পারছেন না কুহেলি। একসময় তিনি জনতেন বাবুলাল ছোট্ট মেয়ে পাখিকে খুব স্নেহ করেন। এই লাইনে গডফাদারের মতো আপনে রাখেন পাখিকে। কিন্তু হৈ লাইনে মেয়ে বলে কি কিছু নেই, একের চোখে সবাই মেয়েছেলে? হঠাৎ মেজাজটা তেতো হয়ে গেল তাঁর। পাখি আজকাল ওর প্রফেশন নিয়ে কোনও কথা বলে না। ওই প্রবাল আম্মার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। বাবুলালের সঙ্গে যে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে যে তাও তিনি জানতেন না। প্রবালকে বিয়ে করতে চাইছে, এসব তাঁকে জানানোর প্রয়োজন বলে মনে করেনি। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে।

'লোকটা কে মা?' ওপাশ থেকে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছেন কুহেলি। মুখ নামিয়ে চট করে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'একজন প্রোডিউসার। বাবুলালজী।'

'ওরকম বাঁকা বাঁকা কথা বলছিল কেন?' সুজাতার গলায় সন্দেহ।

'ওর কথা বলার ধরন ওই রকম।'

ভাষণ, গান, কৌতুক-নকশার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হল। উদ্যোক্তারা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 'হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় উত্তমকুমার আজকের এই অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানের সাফল্য চেয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন। আমরা ওঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে গর্বিত।'

কুহেলি শিবানীর মুখ মনে করল। বেচারি।

বিখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি যখন বলা হল, 'এ বছরের উজ্জ্বল আবিষ্কার, নবাগতা পাখি সেন,' তখন দর্শকরা চুপচাপ। কিন্তু যেই ওকে মঞ্চে উঠতে দেখা গেল অমনি হাততালির ঝড় উঠল। সুজাতা প্রবল উৎসাহে হাততালি দিচ্ছে, রুদ্র রায় বেশ কায়দা করে ধীরে ধীরে হাততালি দিচ্ছেন। ট্রফি হাতে নিয়ে ঝুঁকে পুরস্কারদাত্রী প্রবীণা অভিনেত্রীকে প্রণাম করল পাখি। তারপর দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নেমে গেল মঞ্চ থেকে। কুহেলির হঠাৎ খেয়াল হল। দিদির দেখাদেখি বিজয়ার পর পাখি প্রণাম করতে আসতো তাঁকে। সুজাতার বিয়ের পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মেয়ে প্রণাম করলে তাঁর নতুন কোন হাত পা গজাবে না কিন্তু আজ যে স্বচ্ছন্দতায় পাখি প্রৌঢ়াকে প্রণাম করল সেইভাবে কখনও কি তাঁকে করেছে!

অনুষ্ঠানের বিরতি হল। এরপরে নাটক। রুদ্র রায় কুহেলি এবং সুজাতা বাইরের লবিতে এসে দাঁড়ালেন। রুদ্র রায় ঘড়ি দেখলেন, 'নাটক দেখার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'আমার নেই।' সুজাতা বলল।

'তাহলে, লেটস গো আউট আ দিস প্লেস। সাড়ে সাতটা বাজে। ডিনার অর্ডার দিয়ে পেতে পেতে আরও একঘণ্টা লেগে যাবে।' রুদ্র রায় বললেন।

সুজাতা মনে করিয়ে দিল, 'কিন্তু পাখিরা, শিবানী মাসি—!'

রুদ্র রায় বললেন, 'আমি জানি না ওদের এখানে আর কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা।'

এইসময় শিবানীকে দেখা গেল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সুজাতা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। কুহেলি হাসলেন, 'তোমার ভাগ্যটা দেখছি খুবই মন্দ।'

'দ্যাখো না।' ছেলেমানুষের ভঙ্গি করল শিবানী, 'জ্বরটা আজই এল।'

'ওরা কোথায়?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'পাখিকে ঘিরে এখন ডিরেক্টার প্রোডিউসারদের ভিড়।' শিবানী বলল।

'তবু একবারকে জানাও, আমার বেরিয়ে যাচ্ছি ডিনারে। যদি ও আসতে পারে—।'

শিবানী চলে গেল। লবিতে এখন সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের মেলা। তবু, কুহেলি লক্ষ করলেন অনেকেরই চোখ তাঁর ওপর। এমন কি মেয়েরাও ঘুরে দেখছে। অস্বস্তিতে বুকের আঁচল টানলেন তিনি। হঠাৎ প্রবাল এগিয়ে এল, 'কেমন লাগছে?'

'মানে?' কুহেলি গম্ভীর হলেন।

'মেয়ে পুরস্কৃত হল, দেখলেন, কেমন লাগছে।'

'নিশ্চয়ই ভাল। তবে যেজন্যে ও পুরস্কার পেল সেটা ভবিষ্যতে আরও বেশি উন্নত যদি না করতে পারে তাহলে এর দাম আর থাকবে না।' কুহেলি বললেন।

'নিশ্চয়ই উন্নতি হবে ওর অভিনয়ের।' প্রবাল বলল।

'তার জন্যে অনুশীলন চাই, সাধনা করতে হয়। শুধু ফুর্তি করে বেড়ালে তো সব শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা!' শেষ শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি আর কথা বলতে চাইছেন না।

একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল প্রবাল। তারপর সরে গেল সামনে থেকে।

রুদ্র রায় হাসলেন, 'ছেলেটি কে?'

'একজন ডিরেক্টার। পাখির সঙ্গে সেঁটে আছে। ছবি করেছিল, চলেনি। বাজারে গুজব ও পাখিকে বিয়ে করতে চায়।' কুহেলি বললেন।

'সেটা তোমার অপছন্দ।' রুদ্র রায় বললেন।

'নিশ্চয়ই। পাখির এখন ক্যারিয়ার তৈরি করার সময়। বিয়ে করলে আর কাজ পাবে ও? ছেলেটি পাখিকে অবলম্বন করে ছবি পেতে চাইছে।' বাবুলালের বলা কথাগুলো উগড়ে দিলেন কুহেলি।

এইসময় পাখি এবং শুদ্ধকে নিয়ে বলে এল শিবানী। শুদ্ধর হাতে পাখির ট্রফি। পাখি বলল, 'মা, আজ অনুষ্ঠানের শেষে পার্ক হোটেলে ককটেল ডিনার আছে। ওটা অ্যাটেন্ড করলে ফিরতে রাত হবে।'

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে বাড়ি ফিরবে?'

'ওরাই পৌঁছে দেবে।'

'মাঝরাতে একা বাড়ি ফিরবে?'

'কেন? শুদ্ধ তো সঙ্গে থাকবে।'

সুজাতা বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! কিছু হলে ও কি করবে?'

'তুই বুঝছি না। ও সঙ্গে থাকে বলে অনেকে এগোতে পারে না? পাখি বলল।

রুদ্র রায় বললেন, 'আমরা গ্র্যান্ডে যাচ্ছি। ওখানেই ডিনার করব। ওই হোটেলেই আমি আছি। ইনকেস তুমি যদি মনে কর চলে আসতে পার।'

পাখির মুখে যেন আলো ফুটলো, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

একটি মুহূর্ত আর সেখানে না দাঁড়িয়ে পাখি ফিরে গেল প্রেক্ষাগৃহে, পেছনে শুদ্ধ।

কুহেলি চাপা গলায় বললেন, 'আমি যে কি করি!'

একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল সুজাতা, 'কিছু করার নেই। ওকে সিনেমায় নামানোর

াগে তোমার উচিত ছিল এসব ভাবার। এখন ও তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গছে।'

শিবানী আপত্তি করল, 'কি যা তা বলছিস; হাত থেকে বেরিয়ে গেলে ও ।খানে এসে পারমিশন চাইত না। আফটার অল বাচ্চা মেয়ে, ককটেল-ডিনারের ামন্ত্রণ পেয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের ম্মানেই তো ওই আয়োজন।'

রুদ্র রায় চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, 'এবার যাওয়া যাক।'

একটা গাড়িতেই চারজন আরামসে বসতে পারে। দ্বিতীয় গাড়িটি বাড়তি ়য় গেলেও শিবানী তারটা ছাড়ল না। ড্রাইভারকে বলে দিল অনুসরণ করতে। াড়িতে বসে কুহেলি চুপচাপ ছিলেন। রুদ্র রায় ড্রাইভারের পাশে বসে বললেন, ্যাপারটা নিয়ে এত ভাবার বোধহয় তেমন কোন কারণ ঘটেনি। এই বয়সে ও ম করছে প্রাইজ পেয়েছে, এখন ওর চাহিদা বাড়বেই। যে লাইনের যা নিয়ম। ও দি ডাক্তার হত আর মাঝরাতে কল্ পেয়ে বাড়ির বাইরে যেত তাহলে কি াপত্তি জানাতেন? তাছাড়া, শিবানী তো বললই, বয়সটাও দ্যাখো।'

সুজাতা বলল, 'মা যখন ওই বয়সে ছিল তখন আমি তো বটেই, ভাই-ও সে গিয়েছিল। এই কয়েকমাসে যে ওর আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা দেখলেই াঝা যায়।'

রুদ্র রায় হাসলেন, 'ঠিক আছে। আমরা চাইব ও ভালভাবে এনজয় করে ড়ি ফিরে যাক। সঙ্গে ওর ভাই আছে, চিন্তার কিছু নেই। লেটস এনজয় দ্য ইট।'

গ্র্যান্ড হোটেলের কর্মচারীদের কাছে রুদ্র রায় যে খুবই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তা াতে কোনও অসুবিধে হয় না। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার নিজেই উঠে এসে সেরা বিলে ওদের বসিয়েছিলেন। বললেন, 'মিস্টার রায়কে আমরা আপনজন বলে ন করি। তাই অনুরোধ করব আপনারা এখানে হোমলি ফিল করুন।

বসার পর রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে কি ড্রিঙ্ক নেবে?'

'আমি হুইস্কি।' শিবানী বলল।

'তুমি? কুহেলির দিকে তাকালেন রুদ্র রায়।

'কিছু না।' কুহেলি মাথা নাড়লেন।

'সেকি! ও, মেয়ে সঙ্গে আছে বলে!' শিবানী সুজাতার দিকে তাকাল।

'না। এমনিতেই আমি রসিক নই, আজ ভাল লাগছে না।' কুহেলি বললেন।

'তাহলে তোমার জন্যে জলজিরা বলছি। একটা কিছু হাতে ধর। তুমি?' াতার দিকে তাকিয়ে বললেন রুদ্র রায় জলজিরায় আপত্তি নেই তো?'

'আমি একটা জুস খেতে পারি।' সুজাতা বলল।

শিবানী চোখ কপালে তুলল, 'ও মাই গড! আমি কোথায় এলাম! এই সুজাতা, তুই অ্যাট লিস্ট হাফ ভদকা উইদ টনিক নে।'

'আমি এখন পর্যন্ত ওগুলো খাইনি। তাতে কিছু মিস্ করছি না।' সুজাতা হাসল।

অতএব দুজনের জন্যে হুইস্কি আর দুজনের জন্যে জলজিরা আর আপেলের জুসের অর্ডার দিলেন রুদ্র রায়। সেইসঙ্গে চার পদের দারুণ ডিনার।

শিবানী আপত্তি জানালেন, 'এত তাড়াতাড়ি ডিনার বললে কেন?'

'আমরা হুইস্কি খাবো কিন্তু ওরা তো বোর ফিল্ করবে!' রুদ্র রায় বললেন।

কাঁধ নাচাল শিবানী, 'কুহেলিদির মাঝে মাঝে কি যে হয়!'

রুদ্র রায়ের ইচ্ছে ছিল ডিনারের পর ওঁর ঘরে সবাই যাক, কিছুক্ষণ গল্পসল্প করুক। কিন্তু কুহেলি সুজাতার দোহাই দিলেন, 'দশটা বেজে গেছে, ওকে বাড়ি যেতে হবে।'

'এক রাত্রে না হয় তোমার কাছে থাকল কুহেলিদি। কিরে, একরাত স্বামীকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি না?' শিবানী বাঁকা গলায় প্রশ্ন করল।

কুহেলি মাথা নাড়ল, 'আমি বাড়ি যেতে চাইছি কারণ—।' আচমকা থেমে গেলেন তিনি। মনে হল, কারণটা বললে বোকা বোকা শোনাবে।

রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনে হচ্ছে তুমি উদ্বিগ্ন। এখানে থাকলেও এনজয় করতে পারবে না। আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?'

'না-না। দুজনে আছি, দিব্যি চলে যাব। একটা ট্যাক্সি—।'

'ট্যাক্সি কেন? হোটেলের গাড়ি আছে। চল, তুলে দিয়ে আসছি।

ওরা নিচে নেমে এল। সেই পরিচিত ড্রাইভারকে রুদ্র রায় বললেন, 'মেমসাহেব যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেবে।'

ওঁরা গাড়িতে উঠে হাত নাড়লেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে সুজাতা বলল, 'মা, আমি ওকে বলে এসেছি তোমার ওখানে রাত্রে থাকব।'

'তাই? ড্রাইভার দাঁড়াও একটু।' কুহেলি বলতেই গাড়ি দাঁড়াল।

সুজাতা বলল, 'দাঁড়াতে বললে কেন?'

কুহেলি গম্ভীর হলেন, 'ভেবেচিন্তে বলছ তো! আমি চাই না তোমার স্বামীর সঙ্গে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হোক।'

'বাঃ। বলেই তো এসেছি, ও আপত্তি করেনি।'

'ও তো অনেক কিছুতেই আপত্তি করেনি। কিন্তু মেনে নিয়েছিল কি?'

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে। ড্রাইভার আমার বাড়িতে চল।'

'তোমার কি হয়েছে বল তো?'

'আমার ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে পাখির সঙ্গে কথা বলার সময় হয়েছে। নিজেকে নষ্ট করার কোনও অধিকার ওর নেই।' কুহেলি বললেন।

'আমরা বোধহয় একটু বেশি ভয় পাচ্ছি।'

কুহেলি কথা বললেন না। একটু বাদে সুজাতা আবার বলল, 'এই রুদ্র রায় বেশ ভাল মানুষ। তাই না?'

'ভাল কিনা জানি না তবে বেশ ভদ্রমানুষ।'

'তোমার সঙ্গে কিভাবে আলাপ হল?'

'কোনও একটা পার্টিতে। তারপর কয়েকবার দেখা হয়েছে। দেশে এসে বিরাট ব্যবসা করছেন। একটা ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব আমাকে দিতে চান।'

'ওমা, তাই? আমাকেও একটা কাজ দিতে বল না!'

'সেই ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে যাব। আজ থাক।'

আবার কিছুক্ষণ বাদে সুজাতা বলল, 'শিবানী মাসি খুব হুইস্কি খায়?'

কুহেলি কিছু বললেন না।

সুজাতা বলল, 'এখন আবার খাবে, না?'

'জানি না।'

'রুদ্র রায় আর শিবানী মাসি খুব বন্ধু বলে মনে হল। খেতে খেতে নিশ্চয়ই অনেক রাত হয়ে যাবে। শিবানী মাসি বাড়ি যাবে কখন?'

বিরক্ত হলেন কুহেলি, 'তোর এত চিন্তার কি আছে? চুপ কর তো!'

ষোলো

ঘরে ঢুকে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল শিবানী, 'উঃ, কি বোর কাটল ডিনারটা।'

রুদ্র রায় স্বীকার করলেন, 'কখনও এমন হয়। মেয়ের ব্যাপারে ডিসটার্বড ছিল কুহেলি।'

'ওই তো দোষ। নিজে ডিসটার্বড হয়েছি বলে সঙ্গীদের কথা ভাবব না।' শিবানী বলল।

'তাই তুমি রেগে গিয়ে ডিনার সামান্যই করলে!' হাসলেন রুদ্র রায়।

'না। বেশি খেলে আর ড্রিঙ্ক করতে পারি না। এক পেগে মন ভরে?'

একটা স্কচের বোতল আর একটা ওয়াইনের বোতল বের করলেন রুদ্র রায়।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখন ওয়াইন খাবে?'

'আমি তো পুরো খেয়েছি। খাওয়ার পর শুধু ওয়াইন চলে।'

শিবানী চুমুক দিল। দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঢোক গিলল।

রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ড্রিঙ্ক করতে এত ভালবাসো কেন?'

চোখ খুলল শিবানী, 'খেলে শরীর অন্যরকম হয়ে যায়, মনের দুশ্চিন্তারা পালিয়ে যায়। বিছানায় গেলেই ঝুপ করে ঘুম এসে যায়। রাত জাগতে হয় না।'

'এটা কি ঠিক? মদ খাবে ক্ষণিক আনন্দের জন্যে। কিন্তু যেই তুমি এর ওপর নির্ভর করতে শুরু করবে অমনি মদ তোমাকে খেতে শুরু করবে। তার পরিণতি তো ভয়ঙ্কর।'

শিবানী উত্তর না দিয়ে আবার চুমুক দিল।

'তার চেয়ে তোমার উচিত মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে জাহাজে গিয়ে থাকা। বাইরে বেড়ালে মনের পরিবর্তন হয়। তুমি নিশ্চয়ই ওকে খুব মিস্ করো—।'

'করতাম। এখন করি না। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

শিবানীর মুখ দেখে রুদ্র রায় বুঝতে পারলেন এ বিষয়ে আলোচনা করতে চায় না সে। খাট থেকে নেমে সোজা টয়লেটে চলে গেল শিবানী। মুখে ঘাড়ে জল দিল। আলতো করে ঝোলানো নতুন তোয়ালেতে মুখ চাপল। তারপর ঘরে ফিরে এক চুমুকে হুইস্কি শেষ করে বলল, 'নতুন কথা বল।'

দ্বিতীয় পেগ নিয়ে শিবানী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আবার বিয়ে করনি কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি।' রুদ্র রায় হাসলেন।

'শরীর চায়নি?' চোখ ছোট করল শিবানী।

'শরীর যখন আছে তখন তার একটা চাহিদা তো থাকবেই।'

'তখন?'

'আমি তো সন্ন্যাসী নই।'

'সেকি! আমার তো তাই মনে হচ্ছিল।'

তৃতীয় পেগ শেষ করার পর রুদ্র রায় বললেন, 'আর খেয়ো না।'

'আর একটা—।' আদুরে বেড়াল হয়ে গেল শিবানী।

'তোমার নেশা হয়ে গেছে।'

'কিছুই তো হল না, নেশাই হোক।' বোতল থেকে নিজেই গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে চাইল শিবানী। তার আঁচল খসে পড়েছে কিন্তু সে-ব্যাপারে কোন হুঁস নেই।

রুদ্র রায় তার হাত ধরলেন শক্ত করে। 'আমি বলছি, আর নয়।'

'তুমি বলছ আমি মদ খাবো না?'

'না।' মাথা নাড়লেন রুদ্র রায়।

'বেশ। তাহলে চুমুই খাই।' আচমকা গ্লাস ছেড়ে দিয়ে দুহাতে রুদ্র রায়কে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল শিবানী। রুদ্র রায় স্থির হয়ে রইলেন। শিবানী তাতে সাহসী হল। রুদ্র রায়ের কোলের ওপর উঠে বসল সে। পাগলের মতো চুমু খেয়ে চলল সে। হঠাৎ রুদ্র রায়ের চোখ জ্বলে উঠল। দুহাতে শিবানীর শরীরটাকে ওপরে তুলে এক পাক ঘুরিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল। পতনের ধাক্কাটায় জোর থাকায় ককিয়ে উঠল শিবানী, 'উঃ।' একটানে নিজের জামা খুলে রুদ্র ওর পাশে বসে হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠো ধরলেন। তারপর টেনে নিয়ে এলেন শিবানীর মুখটাকে। ওই এক মুহূর্তেই রুদ্রের চোখ মুখের বীভৎস অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল শিবানী। একটুও আমল না দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ালেন। শিবানী গোঙাচ্ছে। ঠোঁট থেকে রক্ত পড়ছে। কিন্তু রুদ্র রায় তখন উন্মাদ।

সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে ছিল শিবানী। যেন একটা ভয়ঙ্কর ঝড় নিষ্ঠুরতায় গুড়িয়ে দিয়ে গেছে গাছপালা, বাড়িঘর। সে পড়ে আছে বিছানায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়। যন্ত্রণাতে পাশ ফিরতে পারছে না। সে তাকাল। ঘরে রুদ্র রায় নেই। পশুর চেয়ে অধম লোকটা। অথচ কথা বললে, বাইরে থেকে দেখলে ওই পশুটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

কোনরকমে উঠে বসতেই চমকে গেল শিবানী। তার দুই উরুতে অনেকগুলো ক্ষত। দাঁতের চাপে রক্ত জমেছে ওগুলোতে। বিছানার একপাশে পড়ে থাকা চাদরটা টেনে নিয়ে নিজের শরীর ঢাকল সে।

এইসময় রুদ্র রায় বেরুল ঘর থেকে, 'কি, আর একটা হুইস্কি নেবে নাকি!'

কেঁদে ফেলল শিবানী। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

'অলরাইট বেবি। তোমার এখন নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি স্বীকার করছি, কিন্তু দুদিন পরে তোমার মনে হবে এই যন্ত্রণাটার কোন বিকল্প নেই। তুমি এটা আবার পেতে চাইবে। দিস ইজ রিয়েল সেক্স।' রুদ্র রায় হাসলেন।

'আমি যদি তোমার শরীরে চাবুক মেরে এই অবস্থা করে দিই তাহলে এসব কথা আর উচ্চারণ করতে না।' হিংস্র গলায় বলল শিবানী।

এগিয়ে এসে শিবানীর ডান হাত সযত্নে ওপরে তুলে চুমু খেল রুদ্র রায়। তারপর ওটাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ তুমি ওটা পারবে না। আগে থেকে দিন ঠিক করে চলে এসো। আমার কোমর থেকে পা পর্যন্ত যত শক্তিতে পার পঁচিশবার চাবুক মেরো। পৃথিবীর আদিমতম আনন্দ দেওয়ার জন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব, তোমাকে স্পর্শ না করেই।' রুদ্র রায় চেয়ারে ফিরে গেলেন।

'তুমি, তুমি স্যাডিস্ট।' শিবানীর চোখে মুখে ভয়।

'আমি জানি না। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনও মেয়ে যদি আমাকে প্রভোক করে তখন এই চাহিদা প্রবল হয়ে যায়।'

'তুমি, তুমি নর্মাল মানুষের মতো আচরণ করতে পার না?'

'করার অভিনয় করি। যার সঙ্গে সেটা করি সে বুঝতে পারে না। আমার শুধুই পরিশ্রম হয়, আনন্দ পাই না। আর এই কারণে আমি বিয়ে করতে পারলাম না।'

'তাহলে তুমি মিথ্যে বলেছ। এই বিকৃত রুচির জন্যে তোমার ডিভোর্স হয়েছে। কোনও মেয়ে তোমাকে টলারেট করতে পারবে না।'

'হয়তো।'

'আমি বাড়ি যাব।'

'এখন গিয়ে কি করবে। রাত তিনটে বাজে।'

'সেকি! উঠতে গিয়ে শরীরে যন্ত্রণা বাড়ল। তাড়াতাড়ি চাদরটাকে টেনে নিয়ে বলল, 'প্লীজ, একটু এঘর থেকে যাবে। আমি—।'

'ও, শিওর।' দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুদ্র রায়। তাড়াতাড়ি শাড়ি জামা পরে নিল শিবানী। যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে। যত রাতই হোক তাকে বাড়িতে ফিরতেই হবে।

কুহেলির ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে, আটটা বেজে গেছে, শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারলেন তাঁর শরীর আজ ঠিক নেই। ম্যাজ ম্যাজ করছে, ঘুমাতে ইচ্ছে করছে আবার। জোর করে বিছানা ছাড়ল সে।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে আসামাত্র কালকের রাতের স্মৃতি সামনে চলে এল। ওই ঘটনার পর তার কি করে ঘুম হল নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

তাঁর বসার ঘরে স্যাঁতসেতে গন্ধ। দরজা খুললেন। পাশের ঘরের ভেজনো দরজা ঠেলতেই চোখে পড়ল সুজাতা বালিশ আঁকড়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক।

কাল রাত্রে ওঁরা জেগেছিলেন। সুজাতা কিছুক্ষণ অন্যপ্রসঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি আর কতক্ষণ জাগবে? একটা বেজে গেছে!'

কুহেলি বলেছিলেন, 'তুই শুয়ে পড়।'

সুজাতা বলেছিল, 'শুনলে তোমার খারাপ লাগবে কিন্তু প্রশ্রয়টা তোমার ছিল।'

'বোধহয়। তবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে আমি উৎসাহ দিইনি। পড়াশুনায় একদম ভাল ছিল না। শেষপর্যন্ত হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করত কিনা সন্দেহ। যে বিদ্যের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় তা কখনই ওর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত না। যদি অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা পায়, নাম হয় হোক। এই সুযোগটা ওকে হয়তো ভবিষ্যতে সাহায্য করবে এই ভেবে রাজি হয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছি।' কুহেলি বললেন।

'কিন্তু ওইটুকুনি মেয়ে বাপের বয়সী লোকদের সঙ্গে ককটেল পার্টিতে যাচ্ছে আর তুমি সেটা অ্যালাউ করছ!' সুজাতা বিরক্ত।

'না করলে কি হবে জানিস না! আজ হয়তো চলে আসতো, কিন্তু কালই ওইরকম একটা অকেশন পেলে জোর করে চলে যাবে। বেশি বললে ও বাড়ি থেকে চলে যাবে।'

'ইস বাড়ি থেকে চলে যাওয়া কি এতই সোজা?' ফোঁস করে উঠল সুজাতা।

'হাতে টাকা থাকলে সোজা। ও ছবিতে কাজ করে এখন কি টাকা পাচ্ছে তা আমি জানি না। প্রথম দিকে জানতাম, এখন বলেও না। আমিও জিজ্ঞাসা করি না। তাছাড়া ও বাইরে গিয়ে থাকতে চাইলে মদত দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।'

'তার মানে ও এই বাড়িতে থেকে যা ইচ্ছে তাই করবে আর তুমি কিছু বলবে না?'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। তুই যা, শুয়ে পড়।' কুহেলি বললেন।

সুজাতা যখন শুতে চলে গেল তখন খুব ইচ্ছে হচ্ছিল রুদ্রর সঙ্গে কথা বলতে। রুদ্র নিশ্চয়ই এখন ঘুমিয়ে আছে, শিবানী অবশ্য থেকে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও কি থাকবে? যদি থাকে তাহলে তাঁর খারাপ লাগবে। মদ খাবে মেয়েটা, খেয়ে মাতাল হবে। না, দরকার নেই ফোন করার। তারপরেই মনে হল, রুদ্রও তো ফোন করে খবর নিতে পারত।

রাত পৌনে তিনটের সময় গাড়িটা বাড়ির সামনে এসে থামল। ব্যালকনিতে ছুটে গেলেন কুহেলি। ইচ্ছে করেই আলোটা জ্বালেননি। দরজা খুলতেই ভেতরে আলো জ্বলল। আর দাঁড়ালেন না। ওদের বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে পাড়ার লোক জেগে যেতে পারে। নিচে নেমে দরজা খুলতেই চমকে উঠলেন।

বাবুলালজী পাখিকে জড়িয়ে ধরে গাড়ি থেকে নামছেন। সামনের সিট থেকে নামল শুদ্ধ।

দরজার দিকে ওরা কয়েক পা এগিয়ে আসতেই কুহেলি বুঝতে পারলেন মেয়ের অবস্থা কহিল। ততক্ষণে বাবুলালজী দেখতে পেয়েছেন তাঁকে, 'না ম্যাডাম, আর কিছু বলবেন না ওকে। আমি সব মাপ করে দিয়েছি। হ্যাবিট নেই তো, একটু ড্রিঙ্ক করেই—। হে হে—। যদি ওকে ওপরে নিয়ে যান—!'

মেয়েকে ধরলেন কুহেলি। পাখির চোখ বন্ধ। হাঁটুতে বিন্দুমাত্র জোর নেই। শুদ্ধকে বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দাও।' তারপর অনেক কষ্টে মেয়েকে তিনতলার বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন তিনি। কাটা কালাগাছের মতো সেখানে লুটিয়ে পড়ল পাখি।

গন্ধ পেয়েছিলেন আগেই, এখন মুখ দেখে মনে হল গলা টিপে মেরে ফেলতে। কিন্তু এখন মরে গেলে তো ও জানতেও পারবে না। মুখ ফিরিয়ে ছোট ছেলেকে দেখতে পেলেন। চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে দিদির ট্রফি হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ল শুদ্ধর ওপর। বেদম মারলেন ছেলেকে। ছেলে যে এতটা লম্বা হয়ে গেছে, গোঁফের রেখা বেরিয়েছে তা এতকাল টের পাননি। কিন্তু চুপচাপ মার হজম করল শুদ্ধ। ট্রফি রেখে দিয়ে দুহাতে নিজের মুখ আড়াল করল আঘাত বাঁচাতে। যখন হাত ব্যথা হয়ে গেল, ছেলে মাটিতে বসে পড়েছে, তখন আর দাঁড়ালেন না কুহেলি।

বিছানায় শুয়ে চুপচাপ কেঁদেছিলেন কিছুক্ষণ। মেয়েটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে ওকে বাঁচাবেন তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু আর নয়, একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে কালকে। নিজের ভাল না বুঝে ও যদি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তো যাক। চোখের সামনে ওর পতন দেখতে হবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটু স্বস্তি পেলেন। তারপরেই খারাপ লাগাটা তৈরি হল। ছোট ছেলেকে কোনদিন মারেননি তিনি। ওর বুদ্ধি কম বলেই শাসন করেননি তেমন ভাবে। আজই প্রথম গায়ে হাত তুললেন। কিন্তু ওর কি দোষ? দিদির ছায়া হয়ে থাকতে চায় ও। দিদির অন্যায়ের শাস্তি ও কেন পাবে? না, ছোট ছেলে যে পান করেনি তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কি করবেন তিনি? মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেননি। ওই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হয়নি।

টেলিফোন বাজল।

রুদ্র রায়ের গলা, 'গুডমর্নিং। কেমন আছ?'

'গুডমর্নিং!' হাসার চেষ্টা করলেন কুহেলি, 'কয়েক ঘণ্টায় খারাপ থাকব কেন?'

'তুমি মেয়ের জন্যে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলে, তাই।'

'ও। না। সব ঠিক আছে।'

'গুড। মনে হচ্ছে ঘুম ভাঙলাম!'

'না। যদিও বাড়ির সবাই ঘুমাচ্ছে। কাল কখন তোমাদের শেষ হল?'

'প্রায় তিনটে।'

'সেকি? তিনটে?'

'বারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তিনটের সময় ঘুম ভাঙলে বাড়ি গেল!'

'আশ্চর্য! ওর কি বয়স বাড়ল না?'

হা হা করে হাসলেন রুদ্র রায়।

'তাছাড়া অত রাতে তোমার ঘর থেকে ও বেরুচ্ছে—এটা তোমার পক্ষেও অস্বস্তিকর।' রুদ্রকে মনে করিয়ে দিতে চাইলেন কুহেলি।

'যেহেতু ফাইভস্টার তাই কেউ কিছু বলবে না। স্টিল এটা থাকে না হয় তা আমি দেখব। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে?'

'বল।'

'সকাল দশটায়, নতুন অফিসে। পৌঁছাতে পারবে না গাড়ি পাঠাবো?'

'পারব।'

'বাই! লাইন কেটে দিল রুদ্র রায়।

রিসিভার রেখে উঠতে যাচ্ছিলেন, পাখিকে দেখতে পেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর কথা শেষ হওয়া মাত্র ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, 'সরি মা, আর কখনও এরকম হবে না। আমি প্রমিস করছি, তোমার পারমিশন ছাড়া কোনও কাজ করব না।'

হেস্তনেস্ত করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকা মনটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে তুমি মদ খেয়েছিলে?'

'আমি জানতাম না।' বুক থেকে মুখ সরাচ্ছে না মেয়ে, 'বিশ্বাস কর, আমি অরেঞ্জ খাচ্ছিলাম। তার মধ্যে যে ভদকা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারিনি।

'বুঝতে পারনি? ন্যাকা!'

'বিশ্বাস কর। আমি তো কখনও ওসব খাইনি।'

'কে মিশিয়ে দিয়েছিল?'

'বুঝতে পারিনি।'

'তোমাকে অরেঞ্জের গ্লাস কে এনে দিয়েছিল?'

'প্রবাল।'

'প্রবাল?' অবাক হয়ে গেলেন কুহেলি। পাখির কথা যদি সত্যি হয়, যদি ওর অরেঞ্জের সঙ্গে ভদকা মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে যে ওটা সার্ভ করেছে তার জানারই কথা। হয়তো তারই নির্দেশে হোটেলের বেয়ারা কাজটা করেছে। কিন্তু পাখিকে মাতাল করে প্রবালের কি লাভ হয়েছে? প্রবাল যদি পাখিকে

ভালবাসে তাহলে ওর ক্ষতি হবে এমন কাজ কি করবে?

'ওখান থেকেই সোজা বাড়ি ফিরেছিস?'

'না।'

'তাহলে?'

'আমার শরীর খারাপ হয়েছে দেখে বাবুলালজী প্রবালকে হোটেলের একটা ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিল বিশ্রাম করার জন্যে। ওখানে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'শুদ্ধ কোথায় ছিল?'

'আমার সঙ্গে।'

'সেখানে বাবুলালজী গিয়েছিল?'

'আমি জানি না। এখন শুদ্ধ বলল বাবুলালজী গিয়েছিল। শুদ্ধকে বলেছিল বাইরে ঘুরে আসতে কিন্তু ও যায়নি। তখন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।'

'তার মানে প্রবাল বাবুলালজীকে তুষ্ট করতে তোর অরেঞ্জে ভোদকা মিশিয়েছে। ছিঃ। এরকম একটা দালালের সঙ্গে তুই বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলি!'

সশব্দে কেঁদে উঠল পাখি। মাকে জড়িয়ে ধরা শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল। আর পারলেন না কুহেলি। মেয়ের পিঠে হাত রেখে শান্ত করার চেষ্টা করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

এইসময় সুজাতা চলে এল ঘরে। পেছন ফিরে থাকায় তাকে দেখতে পায়নি পাখি। চোখেব ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করলেন কুহেলি।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হল পাখি। চোখের জল মুছল।

কুহেলি বললেন, 'যা, ভাইকে ডেকে নিয়ে আয়।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল পাখি। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন কুহেলি। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন বড় মেয়েকে মাতাল হয়ে ফিরে আসার ঘটনাটা বলবেন না। বললেন, 'দেখলি তো, অনুশোচনা হয়েছে। আর কখনও রাত করে বাড়ি ফিরবে না বলে কথা দিয়েছে।'

'দ্যাখো! কথার কথা না হয়।'

রাগ হল কুহেলির। সুজাতা সবসময় প্রত্যেকটা ব্যাপারকে বাঁকা চোখে দ্যাখে। বিশ্বাস করতে পারে না। পুরোটা ওকে না বলে ভালই করেছেন।

শুদ্ধ দরজায় এল। কুহেলি ডাকলেন, 'আয়, এখানে আয়।'

শুদ্ধ দাঁড়িয়েই থাকল। কুহেলি এগিয়ে গেলেন ছোট ছেলের কাছে। ছেলের গালে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল রে।' জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

সতেরো

ডালহৌসির অফিসে রুদ্র রায়ের সামনে বসে মাথা ঘুরতে লাগল কুহেলির। রুদ্র রায় প্রথম বছরে যে লগ্নির আশা করছেন তা তাঁর কল্পনার বাইরে। রুদ্র রায় বললেন, 'আমাদের সবার মনে রাখতে হবে এর একটি টাকাও আমাদের নয়। যাঁরা বিশ্বাস করে রাখতে দিচ্ছেন তাঁদের প্রতিটি টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।'

'এত টাকার লগ্নি হবে?' জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না কুহেলি।

'অবশ্যই। ব্যাঙ্ক যে সুদ দিচ্ছে আমরা তার অন্তত সাড়ে চারগুণ বেশি দিচ্ছি।'

'কিন্তু লোকে জানবে কি করে? আমরা কি বিজ্ঞাপন করব?'

রুদ্র রায় কুহেলির দিকে তাকালেন, 'তুমি কোন হোর্ডিং বা পোস্টারে, সিনেমায় বা কাগজে মদের বিজ্ঞাপন দেখতে পাও?'

মাথা নাড়লেন কুহেলি, 'না।'

'পাও না কারণ সরকার মদের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কিন্তু তাই বলে কি মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছে না লোকে কিনছে না? নতুন হুইস্কি বা রাম বাজারে ছাড়ার পর কোনও কোনোটা বিজ্ঞাপন ছাড়াই জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। তাই না? লোকে জানছে কি করে? উত্তর হল, নিজের গরজে। যে মদ খেতে ভালবাসে সে ভাল মদ খুঁজে নেবে। ঠিক তেমনি। মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে সবসময় যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি চায়। কানে কানে ছড়িয়ে যাবে খবরটা। তুমি চুপচাপ দ্যাখো।' রুদ্র রায় বললেন।

ইতস্তত করলেন কুহেলি। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে বাধছিল। সেটা লক্ষ করে রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে?'

'অন্য ভাবে না নিলে বলতে পারি!'

'স্বচ্ছন্দে বলতে পার।'

'যারা টাকা রাখবে তারা বিপদে পড়বে না তো!'

'কোনভাবেই নয়। এই গ্যারান্টিটুকু না দিলে কেন টাকা নেব? জনসাধারণের টাকা লোপাট করার অভ্যেস রুদ্র রায়ের নেই। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমরা প্রচুর টাকা রাখছি সিকিউরিটি হিসেবে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।' রুদ্র রায় বললেন।

ব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অফিস ভর্তি হল, যাঁদের সঙ্গে তাঁকে কাজ করতে হবে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মিস্টার বক্সী নামে এক প্রধান

ব্যাঙ্কার এসেছেন চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে। তিনি রুদ্র রায়ের সামনেই বললেন, 'কোন সমস্যা হলে আমাকে ডাকবেন ম্যাডাম। মিস্টার রায় যেভাবে চাইছেন তার ব্লুপ্রিন্ট আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি শুধু দেখে যাবেন ঠিক সময়ে ঠিক কাজটা হচ্ছে কিনা। প্রত্যেক মাসের এক তারিখে পাবলিককে ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে। কিন্তু তার ঠিক দুদিন আগে আপনি কোন্ পার্টিকে কি দেওয়া হচ্ছে তার কাগজ পেয়ে যাবেন?'

কুহেলি তাঁর চেয়ারে বসে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'না ম্যাডাম। ধন্যবাদ দেবেন না। এটা আমাদের কর্তব্য। তার জন্যে কোম্পানি মাইনে দিচ্ছে। আমাকে কি এখন কিছু বলবেন?' বক্সী উঠে দাঁড়ালেন।

'না। আপনি যেতে পারেন।'

বক্সী বেরিয়ে গেলে রুদ্র রায় বললেন, 'গুড। লোকটা ভাল তবে একটু বেশি কথা বলে। সবসময় মনে রাখবে ভাল করে না দেখে কোন কাগজে সই করবে না। একটু সন্দেহ হলেই আমাকে ফোন করবে।'

কুহেলি শেষবার তাকিয়েছিলেন, 'আমি পারব তো?'

'পারতে তোমাকে হবেই। আমার জন্যে।'

এই কদিন শুধু বিভিন্ন ফর্ম এবং অ্যাপ্লিকেশনে সই করে যেতে হল। মিস্টার বক্সী সেগুলো তৈরি করে আনছেন। বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্টাফদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সই করা হচ্ছে। কুহেলি লক্ষ করছিলেন স্টাফদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। তাঁরা বেশ উচ্চশিক্ষিত।

অফিস থেকে গাড়ি দেওয়া হয়েছে কুহেলিকে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত থাকতে হয়। প্রায়ই মিটিং হচ্ছে। সেখানে কম কথা বলেন কুহেলি। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছেন তিনি প্রাণপণে। ছুটির পরে সোজা বাড়ি। তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শোওয়ার পর একটু স্বাভাবিক। একটা জিনিস তিনি লক্ষ করছেন। ইদানিং রুদ্র রায়ের সঙ্গে যতবারই দেখা হয় কাজের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলেন না, এমন কি কখনও একা থাকলেও খুব মিষ্টি করে ডার্লিং বা সোনা বলে কাজের প্রসঙ্গে চলে যান। হোটেল ছেড়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি নামী গেস্ট হাউসে উঠেছেন এখন। সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাননি। অবশ্য তার একটা কারণ আছে। অফিসের কাজ শেষ করতে রুদ্র রায়ের রাত এগারোটা হয়ে যায় প্রায়ই। এটা যেমন সত্যি তেমনি কাজের চাপে মানুষটা তাঁর সম্পর্কে নির্মোহ হয়ে যাবে এটাও মেনে নিতে পারছেন না তিনি।

আজ দুপুরে একা পেয়ে রুদ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন কুহেলি, 'বিকেলে কাজের চাপ কেমন?'

রুদ্র রায় হাসলেন, 'সত্যি, খুব অন্যায় হচ্ছে। তোমাকে সময় দিতে পারছি

না। আসলে বল গড়াতে আরম্ভ করলে দেখবে আমরা বেশ হালকা হয়ে যাব। আমি কাল নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছি। পরশু ফিরব। যাবে আমার সঙ্গে?'

খুব খুশি হলেন কুহেলি, 'এই সময় যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'এখনও তো চারদিন বাকি আছে। পরশু তো দুপুরের মধ্যেই অফিসে ফিরে আসছি।' বেরিয়ে যাওয়ার সময় রুদ্র রায় বললেন, 'সাড়ে পাঁচটায় তৈরি থেকো। আজ তোমার ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ো। কাল সকালে তোমার বাড়িতে যেমন রিপোর্ট করে তেমনই করবে।'

হেসে ফেললেন কুহেলি। বিকেলে কাজের চাপ যে নেই সেটা বোঝালেন রুদ্র রায়।

কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলেন সুজাতাদের বললে হয়। ওরা যদি এজেন্সি নেয় তাহলে ওদের সংসারের চেহারা বদলে যাবে। আজ রুদ্র রায়ের পাশে গাড়িতে বসে মনে হল থিয়েটার রোডে গেলে হয়। কথাটা রুদ্র রায়কে বলাতে তিনি বললেন, 'নো প্রব্লেম। কিন্তু ওরা বাড়িতে থাকবে তো? একটা ফোন করে নিলে ভাল হয়।'

'না। থাকবে। অমিয়র হয়তো ফিরতে একটু দেরি হয় কিন্তু সুজাতা থাকবেই।' কুহেলি আশ্বস্ত করলেন।

দরজা খুলল অমিয়, 'আসুন।'

'আচ্ছা অমিয়, তুমি অবাক হও না?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'মানে?'

'এই যে আমি একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে খবর না দিয়ে এলাম, তুমি বিন্দুমাত্র অবাক হলে না!'

'না, মানে. মেয়ের কাছে আপনি আসবেন, এটাই স্বাভাবিক।'

'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

'ও একটু বেরিয়েছে কয়েকটা ছোটখাটো জিনিস কিনতে। অর্ণব এসেছিল।'

'অর্ণবটা কে?' তাকালেন কুহেলি।

'আমাদের পাশের ব্যাঙ্কে কাজ করে। খুব উপকারী ছেলে।'

কুহেলি রুদ্র রায়কে বসতে বললেন, 'এই হল অমিয়। তুমি সুজাতাকে দেখেছ। সুজাতার স্বামী। অমিয়, রুদ্র সম্পর্কে সুজাতা কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

মাথা নাড়ল অমিয়, একটু বোকা বোকা হেসে নমস্কার জানাল।

সোফায় বসে কুহেলি বললেন, 'মেয়ের কথা ভেবে অমিয়কে আমাদের ব্যবসা যুক্ত করা যায় না?'

রুদ্র রায় অমিয়কে লক্ষ করছিলেন। অমিয় ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটু নার্ভাস।

রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বোধহয় সরকারি চাকরি করেন, না?'

'হ্যাঁ।' অমিয় বলল, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের—!'

'তাহলে তো কিছুটা সময় পাবেন। আজ অফিসে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। সুজাতা বেরুবে বলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছি।' অমিয় বলল।

'সেটা অনুমান করেই বললাম সরকারি চাকরি করেন। খুব ভাল হল। সরকারি চাকুরেরা নিয়মিত মাইনে পান, টাকা জমানোর ইচ্ছে থাকে ওঁদের। আপনার শাশুড়িমা যখন সুপারিশ করছেন তখন আমার আপত্তির কিছু নেই।' রুদ্র রায় কথাগুলো বলে কুহেলির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—।' অমিয় অকপটে বলল।

কুহেলি বললেন, 'একটু বুঝিয়ে দাও।'

'আমরা একটি খুব বড় ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি খুলছি। সাধারণ মানুষ যাতে ভাল আয় করতে পারেন সেটাই আমাদের লক্ষ্য। তবে কোনও অবস্থাতেই একজন ব্যক্তি এক লক্ষ টাকার বেশি নিজের নামে রাখতে পারবেন না। যখনই তাঁর টাকা তুলে নেওয়ার প্রয়োজন হবে তিনি একমাসের নোটিশ দেবেন, পেয়ে যাবেন। তবে দুর্ঘটনা বা অপারেশন, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাতদিনের নোটিশেই টাকা ফেরত পাবেন। আপনার সহকর্মী বা বন্ধুরা যদি রাজি হন তাহলে তাঁদের টাকা আমরা আপনার মাধ্যমে নেব। মনে রাখবেন কোন অবস্থাতেই পাঁচ হাজারের নিচে টাকা নেওয়া হবে না। আপনি যে টাকা এজেন্ট হিসেবে এনে দেবেন তার ওপর শতকরা এক ভাগ মাসিক সুদ পাবেন! বুঝতে পেরেছেন?' রুদ্র রায় জানতে চান।

মাথা নেড়ে না বলল অমিয়, 'না। মাসে ওয়ান পার্সেন্ট হলে বছরে বারো পার্সেন্ট। একজন এজেন্ট যদি এটা পান, মানে, কোনও ব্যাঙ্ক তো মূল টাকার ওপর এই ইন্টারেস্ট দেয় না। তাহলে আপনাদের কাছে যারা টাকা রাখবে তারা কত করে সুদ পাবে?' অমিয় উদ্‌গ্রীব হল জবাব শোনার জন্যে।

'প্রতি মাসে ফোর পার্সেন্ট, বছরে আটচল্লিশ। তবে কেউ যদি প্রতিমাসে সুদ নিতে না চান তাহলে তাঁকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হবে না।' রুদ্র রায় বললেন।

'কি বলছেন? এসব সত্যি?' অমিয় উত্তেজিত।

কুহেলি হাসলেন, 'হ্যাঁ। সত্যি। আমি ওঁদের সঙ্গে জয়েন করেছি। ডালহৌসি পাড়ায় অফিস নেওয়া হয়েছে। দ্যাখো অমিয়, এই তোমার সুযোগ, যদি সবাইকে ধরে দশ লক্ষ টাকা জমা রাখতে পার তাহলে মাসে ঘরে বসে দশহাজার টাকা রোজগার করতে পারবে।'

'কিন্তু, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই তো!' অমিয় তাকাল রুদ্র রায়ের দিকে।

'একদমই না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে আমরা ব্যবসা করব। আর

সে-কারণে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের কাছ থেকে জামানত হিসেবে রেখেছে। আপনি নিশ্চিত থাকুন, সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব টাকা ফেরত নিয়ে যেতে।' রুদ্র রায় বললেন।

'কিন্তু ব্যাঙ্কগুলো কিছু বলবে না?' অমিয় সতর্ক হচ্ছিল।

'ব্যাঙ্কের বলার কি অধিকার আছে? আমরা তো আর একটা ব্যাঙ্ক তৈরি করছি না। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার ফারাক বিস্তর। আমরা যে প্রফিট আশা করছি তার ওপর ডিভিডেন্ড ঘোষণা করছি। প্রফিট যদি বেশি হয় লগ্নিকারীরা আরও বেশি টাকা পাবেন। আমরা কখনও খাতায় কলমে সুদ বলছি না।'

'যদি লস হয়, তখন—?'

হাসলেন রুদ্র রায়, 'না। লস্ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এখানে যত টাকা লাগানো হবে তত প্রফিট বাড়বে। যেখানে আমরা মাসে সেন্ট পার্সেন্ট প্রফিট করব সেখানে ফাইভ পার্সেন্ট খরচ তো অনায়াসেই করতে পারি। তাই না?'

অমিয় অঙ্কে বরাবর ভাল। বিষয়টা ওকে খুব আনন্দ দেয়। রুদ্র রায়কে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, উত্তরগুলো নোট করে নিচ্ছিল সে।

শেষপর্যন্ত রুদ্র রায় তাকে বললেন, 'আমরা সবাই জানি বাঙালি নিজে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক নয়। তারা ঝুঁকি নিতে চায় না, পরিশ্রমে আগ্রহীও নয়। যাদের কোটি টাকা আছে তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। কিন্তু যাদের পুঁজি সামান্য অথচ ব্যবসা করার বাসনা থাকলেও কি ব্যবসা করবেন জানেন না, ব্যবসায় ক্ষতি হলে কি করবেন ভেবে পিছিয়ে যান আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই। কি ভাবে? ব্যবসা বড় না হলে লাভের মুখ দেখা যায় না। সেই বড় ব্যবসার জন্যে প্রয়োজন কোটি কোটি টাকার। এক বা একাধিক বাঙালি সেই টাকা জোগাড় করবেন কি করে? আমরা তাই যোগসূত্রের মতো কাজ করতে চাই। কেউ যদি দশ হাজার টাকাও ব্যবসায় ঢালতে চান আমরা তা বিনীত ভাবে নেব। এই ভাবে হাজার হাজার বাঙালির টাকা একত্রিত হলে অনেক কোটি টাকা সংগৃহীত হবে যা দিয়ে বড় ব্যবসা করা সম্ভব। আপনি বুঝতে পেরেছেন ভাই?'

'কিন্তু ধরুন, আপনারা দশ কোটি টাকা এক হাজার লোকের কাছ থেকে পেয়েছেন। তারা যদি তিনমাস পরে টাকা ফেরত চায় তাহলে কি ভাবে ফেরত দেবেন?' অমিয় সরাসরি প্রশ্ন করল।

হাসলেন রুদ্র রায়, 'আমরা কোন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে টাকা ঢালতে চাই না। মূলত জাহাজে মালপত্র ছাড়ানো অথবা এলসি-র মাধ্যমে রপ্তানি করার জন্যে বড় ব্যবসায়ীদের সাময়িক ঋণ দিচ্ছি। ধরে নিন, ওই দশ কোটি টাকা মাসে তিনবার ঋণ দেওয়া হল এবং সুদ সমেত ফেরত নেওয়া হয়েছে। কেউ বা সবাই যদি টাকা

ফেরত চান তাহলে মাত্র একমাসের নোটিশ দিতে হবে। আমরা টাকাটা আর ব্যবসায় না খাটিয়ে ফেরত দিয়ে দেব। তবে মাসে চার পার্সেন্টের নিশ্চয়তা পাওয়া মানে পঁচিশ মাসের সুদ যা তাদের ক্যাপিটালের সমান। তাই চট করে কেউ টাকা ফেরত নেবে বলে মনে হয় না।'

'আপনি বলছেন বাঙালিদের সাহায্য করবেন। তার মানে কি অবাঙালিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হবে না?'

'অবশ্যই নেওয়া হবে। ভারতবর্ষের যে কোন নাগরিক টাকা রাখতে পারেন। আমি বাঙালির নাম করেছি কারণ মনে প্রাণে তাঁদের ভাল চাই।'

কুহেলি বললেন, 'তাহলে তুমি সব বুঝে নিলে, সামনের সোমবারে এসে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ো, কাগজপত্র নিয়ে যেয়ো।'

'সেটা সম্ভব হবে কি করে? আমি তো সরকারি চাকুরে। অন্য কোথাও কাজ করে টাকা নেওয়া আমাদের কাছে আইনবিরুদ্ধ।' অমিয় মাথা নাড়ল।

'এটা কোন সমস্যা নয়। আপনি আপনার স্ত্রীর নামে এজেন্সি নিন। কেউ কোনও আঙুল তুলতে পারবে না আপনার দিকে। হ্যাঁ, প্রথমে আপনি অনেক ভেবেচিন্তে একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলুন যাদের পক্ষে অন্তত দশ হাজার টাকা জমা রাখা সম্ভব। আমাদের অফিসে এসে আপনার স্ত্রীর নাম নথিভুক্ত করে কাগজপত্র এনে ভাল করে পড়ুন। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলে কাজ শুরু করুন। আর হ্যাঁ, আমরা চেক কোন অবস্থাতেই নেব না। ক্যাশ বা ড্রাফ্‌ট নেবেন পার্টির কাছ থেকে। আপনাকে দেখে খুবই বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ বলে মনে হয়। নিজের যত সোর্স আছে সব ব্যবহার করুন। আমি নিশ্চিত আপনি সফল হবেন।'

'আমি তো কখনও এসব করিনি। পাবলিক মানির ব্যাপার তো। তবে আপনি আছেন মা আছেন। এই ভরসা নিয়ে এগিয়ে যাব।' অমিয়র কথা শেষ হওয়ামাত্র বেল বাজল। অমিয় এগিয়ে গেল দরজা খুলতে।

সুজাতার গলা শুনতে পেলেন ওঁরা, 'কি করছিলে?'

সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, 'জবাব দেবেন না অমিয়দা, ওটা আপনার পার্সোন্যাল ব্যাপার। ঠিক কিনা।'

ততক্ষণে সুজাতা ঢুকে পড়ছে ঘরে, 'ওম্মা! তোমরা? কখন এলে?'

কুহেলি মেয়ের দিকে না তাকিয়ে ওর সঙ্গীর দিকে তাকালেন। বেশ ছিমছাম, সুদর্শনই বলা যায়, সুজাতার থেকে কয়েক বছরের বড় হবে হয়তো।

অমিয় বলল, 'এই তো কিছুক্ষণ হল এসেছেন।'

'চা দিতে বলেছ?' সুজাতা স্বামীর দিকে তাকাল।

'না, মানে, একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা, বলছি।' অমিয় ভেতরে চলে গেল।

সুজাতা বলল, 'মা, এ হল অর্ণব, অর্ণব রায়চৌধুরী। পাশের ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আসে। অর্ণব, আমার মা, ইনি মায়ের বন্ধু রুদ্র রায়।'

অর্ণব হাতজোড় করল। তারপর কুহেলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাঃ, আপনি তো মানুষের মতো, স্বাভাবিক।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন কুহেলি।

'এই কদিন এবাড়িতে এলেই আপনার এত প্রশংসা শুনেছি যে মনে হত আপনি স্বর্গের দেবীদের মতো একজন।' হাসল অর্ণব।

সুজাতা চেঁচাল, 'অ্যাই! আমার মায়ের সঙ্গে ফাজলামি করছ?'

'অসম্ভব? আমি সেটা কেন করব? আচ্ছা আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে?'

'তার আগে বলুন এমন কি শুনেছেন যে আমাকে দেবী বলে মনে হয়েছে!'

মাথায় হাত দিল অর্ণব, 'আপনার মতো সুন্দরী খুব কম দেখা যায়। সিনেমায় নামলে আপনি যে কোনও নায়িকাকে পেছনে ফেলে দিতেন। বয়স আপনার কাছে হার মেনেছে। তার সঙ্গে রয়েছে আপনার ব্যক্তিত্ব। যেটা অনেক সুন্দরীরই থাকে না। আপনার রুচি— ।'

'বাব্বা। অনেক হয়েছে। এবার চুপ করুন ভাই।'

'আমাকে "আপনি" বলছেন কেন? সুজাতা আমার চেয়ে মাত্র দু-বছরের ছোট।'

'বেশ। তুমি কোথায় থাকো?'

'পার্ক সার্কাসে। বিয়ে করিনি। বাবা মায়ের সঙ্গেই থাকি।'

হঠাৎ রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকাল ব্যাঙ্কে কাজের চাপ কম?'

'মোটেই না। আমি খুব ফাস্ট বলে তিনটের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলি। আপনারা গল্প করুন, আমি এবার কাটি।'

সুজাতা বলল, 'চা খেয়ে যাও।'

'না। এঁদের বোধহয় অসুবিধে হবে।' হাসল অর্ণব।

রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কথা মনে এল কেন?'

'তখন থেকে শুধু আমাকেই জেরা করে যাচ্ছেন, নিজেরা অন্য কথা বলছেন না। মনে হল, আমার সামনে বলতে চাইছেন না।' অর্ণব বলল।

রুদ্র রায় হো হো করে হেসে উঠলেন, 'ইন্টারেস্টিং। না ভাই, আপনি থাকলে আমাদের কথা বলতে কোন অসুবিধে হবে না। বসুন।'

কথা ঘোরালেন কুহেলি, 'শোন্ সুজাতা, অমিয়র সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি ওকে খুব ভাল প্রস্তাব দিয়েছেন। অমিয় যদি মন দিয়ে কাজটা করতে পারে তাহলে প্রতি মাসে মোটা টাকা রোজগার করবে। তবে ও যেহেতু সরকারি চাকরি করে তাই তোর নামে এজেন্সি নিতে হবে। ওকে রুদ্র বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওর কাছে জেনে নিস।'

সুজাতা রুদ্র রায়ের দিকে তাকাল, 'ব্যাপারটা কি?'

রুদ্র রায় বললেন, 'ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হবে।'

'তাহলেই হয়েছে!' মুখ ফেরাল সুজাতা।

'তার মানে?' কুহেলি বিরক্ত হলেন।

'পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরি করা লোকগুলো এগারোটার সময় অফিসে ঢুকে ভাবতে শুরু করে কখন পৌনে পাঁচটা বাজবে। এই চাকরি করেই এত ক্লান্ত হয় যে বাড়ি ফিরে একঘণ্টা শুয়ে থাকে। ও করবে ব্যবসা? অসম্ভব।' সুজাতা জানিয়ে দিল।

অমিয় ফিরে আসছিল। বলল, 'গাছের পরিচয় সবসময় পাতা, ফুল বা ফল থেকে বোঝা যায় না। শেকড় দেখেও বুঝতে হয়।'

'যেমন?' রুদ্র রায় তাকালেন।

'যেমন ধরুন আলু। কতরকমের আলু আছে। সাধারণ আলু, রাঙালু, মিষ্টি আলু। ওপরের পাতা দেখে কজন বোঝে মাটির নিচে কি আছে?' অমিয় বলল।

সঙ্গে সঙ্গে অর্ণব মাথা নাড়ল, 'কি দিলে অমিয়দা। দশে বারো। আরও আছে। যেমন কচু। শোলা কচু মান কচু। আমি তো পাতা দেখে বুঝতে পারব না।'

সুজাতা বলল, 'আঃ, অর্ণব!'

অর্ণব সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ভান করল।

চা এল। সঙ্গে মিষ্টি এবং বিস্কুট। রুদ্র রায় শুধু চা নিলেন।

সুজাতা বলল, 'তুমি কাল দুপুরে বাড়িতে থাকবে?'

'না রে। আমি তো রুদ্রর কোম্পানিতে জয়েন করেছি। সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। কেন বল্ তো?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

সুজাতা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। সে খেয়াল করল এতক্ষণে, মায়ের সাজগোজ, শাড়ি আজ একটু অন্যধরনের। কোথাও বেড়াতে গেলে মা এর চেয়ে অনেক বেশি রঙিন হয়।

অমিয় বলে ফেলল, 'আপনি চাকরি করছেন?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে বসেই ছিলাম। রুদ্র টেনে নামাল।'

রুদ্র রায় মনে করিয়ে দিলেন, 'কিন্তু তুমি কাল সকালের ফ্লাইটে বাগডোগরা যাচ্ছ। পরশু বিকেলে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

সুজাতার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'বাগডোগরা কেন?'

'নর্থ বেঙ্গলে আমরা একটা ডিস্টিলারি খুলছি। সে ব্যাপারে কিছু কাজ আছে।'

রুদ্র রায় বললেন, 'কুহেলিকে এখন কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।'

সুজাতা এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যাতে স্পষ্ট সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চা শেষ করে অর্ণব বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল তবু আমি কিন্তু ইট পেতে যাচ্ছি।'

'ইট পাতা মানে?' রুদ্র রায় বুঝতে পারলেন না।

সুজাতা বলল, 'ওর কথা বলার ধরন ওরকম। কি বলতে চাইছ খুলে বল অর্ণব।'

'ওই আর কি। আমি অবশ্য অমিয়দার মতো ছুপারুস্তম নই। মাটির ওপর-নিচ এক। কি ব্যাপার জানি না তবে মাল কামানোর সুযোগ থাকলে জান দিয়ে লড়ে যেতে পারি। ব্যাপারটা যদি এক নম্বরী হয় তাহলে আমাকে চান্স দিয়ে দেখতে পারেন।'

কুহেলি বিরক্ত হয়েই ছিলেন, এবার কথা বলার ভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ পেল, 'এই যে শুনলাম তুমি ব্যাঙ্কে চাকরি কর। ব্যাঙ্কে যারা চাকরি করে তারা তো অন্যদের চেয়ে ভাল মাইনে পায়। তুমি আবার এসব করতে চাইছ কেন?'

'ঠিক বলেছেন। আমি যদি হরিণঘাটায় চাকরি করতাম তাহলে এখন যা পাচ্ছি তার অর্ধেক পেতাম। কিন্তু আমার মন তো এতেই খুশি নয়।' হাসল অর্ণব।

'খুশি তো সবাই হয় না। ধর একটি বামন চাইল দশ ফুট উঁচু গাছের ফল লাফ দিয়ে ছিঁড়ে আনতে। পারবে না। স্বাভাবিক মানুষ তা পারবে।'

'আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না মাসিমা। না, আপনার দোষ নেই। মাঝে মাঝে নিজেকেই আমি অপছন্দ করি। আচ্ছা, চলি।'

অর্ণবের কথা বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারলেন না কুহেলি, 'আসলে তুমি অসুবিধায় পড়বে। আমাদের ব্যবসা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় ব্যবসায় খাটানো। ব্যাঙ্কও তো তাই করে। তুমি ব্যাঙ্কে চাকরি করে আমাদের সঙ্গে কাজ করলে চাকরি থাকবে? অমিয়র সেই ভয় নেই।'

'আমরা এত চুনোপুঁটি যে কেউ আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু পাবলিকের কাছ থেকে টাকা নিতে গেলে তো আপনাদের ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদ দিতে হবে। সেইসঙ্গে সিকিউরিটি!' অর্ণব বলল।

'নিশ্চয়ই।' রুদ্র রায় বললেন, 'তবে সুদ নয়। ডিভিডেন্ড। আমরা এক বছরের ডিভিডেন্ড বারোটা ইক্যুয়াল ইনস্টলমেন্টে প্রত্যেক মাসে দেব।'

'কিন্তু ডিভিডেন্ড তো ব্যালান্সশীট ফাইন্যাল করার পর ডিক্লেয়ার করা হয়। কত প্রফিট হচ্ছে না জানা গেলে ডিভিডেন্ড দেবেন কি করে?'

'আমরা এস্টিমেটেড ডিভিডেন্ড দেব। একজন লগ্নিকারী যা টাকা রাখবেন তার ফর্টি এইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড নিশ্চয়ই দিতে পারব।'

রুদ্র রায়ের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল অর্ণব, 'ফ-র্টি-এ-ই-ট! মাই গড। যদি অত প্রফিট শেষ পর্যন্ত না করতে পারেন। যদি লস হয়?'

'সব দিক দেখে শুনেই বলছি। সরকার অ্যাডভান্স ট্যাক্স নেয়। তিনটে ভাগে আগাম দিতে হয়। এপ্রিল মাসে ব্যবসা শুরু করে সেপ্টেম্বরে যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিতে হয় তাতে বছরের শেষে কত প্রফিট হবে তা হিসেব করে দেওয়া সম্ভব? তবু দিতে হয়। আমরা অবশ্য নিশ্চিত হয়েই দেব বলছি।'

'যদি কেউ টাকা তুলে নিতে চায়?'

'এক মাসের নোটিশ দিতে হবে।'

'সুপার হিট। আমি আছি। এজেন্টদের কমিশন দেবেন?'

'অন্যরা পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছে। যেহেতু অমিয়বাবুকে এক পার্সেন্ট প্রমিস করেছি আপনি তাই পাবেন।' রুদ্র রায় বললেন।

'মাসিমা আমি বড়লোক হয়ে যাব। ব্যাঙ্কে আমার যত ক্লায়েন্ট আছে চার পার্সেন্টের লোভ দেখালে এক কোটি টাকা কয়েকদিনেই পাওয়া যায়। আমি এক কোটি ব্যবস্থা করে দিলে মাসে এক লাখ পাবো? ভাবা যায়? কবে কোথায় যেতে হবে?'

রুদ্র রায় বললেন, 'কাল বিকেলে কুহেলি সুজাতাকে জানিয়ে দেবে। আপনি জেনে নেবেন।'

রুদ্র রায় উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আশা করি আমরা ভালভাবে কাজ করতে পারব। অর্ণব, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

অর্ণব বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। ছেলেরা আমাকে অপছন্দ করে না। চলি।'

সে চলে গেলে কুহেলি বললেন, 'মহা ফাজিল ছেলে! কি করে তোর সঙ্গে আলাপ হল?'

'ব্যাঙ্কে। বক্তিয়ার খিলজি তো, একবার কথা বলতে শুরু করলে থামতে চায় না।'

সুজাতার কথা ভাল লাগল না কুহেলির। অর্ণব একটা সাধারণ ছেলে। ওর সঙ্গে যদি আবেগের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তাহলে খুব ক্ষতি হবে মেয়েটার। কুহেলি নিশ্চিত যে মিস্টার পাকড়াশির সঙ্গে সুজাতার আর যাই থাক আবেগের সম্পর্ক ছিল না। কুহেলি অমিয়র দিকে তাকাল। অমিয় কিছু ভাবছে। ওর সঙ্গে কি সুজাতার আবেগের সম্পর্ক আছে? অসম্ভব। লুকিয়ে প্রেম করার সময় বা বিয়ে করার পরে কয়েক মাস হয়তো সেটা ছিল। এখন যে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

রুদ্র রায় বললেন, 'উঠতে হবে। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'পৌঁছে দিয়ে আসি মানে?' কুহেলি তাকালেন।

'তোমাকে তোমার বাড়িতে নামাতে যাব। তারপর গ্র্যান্ডে যেতে হবে। একজন ফরাসি ভদ্রলোক এসেছেন। ওঁর সঙ্গে জরুরি আলোচনা আছে।'

'এখান থেকে গ্র্যান্ড তো কাছেই। কষ্ট করে আমাকে নামাতে যাবে কেন?

আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।' অভিমান লুকানো থাকল না কুহেলির কণ্ঠস্বরে।

'দ্যাটস গুড। তাহলে আমি উঠি। কাল সকালে ফোন করব। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নেব তোমাকে।' রুদ্র রায় দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, এলাম। দেখা হবে।'

কুহেলি দেখলেন একটুও ভণিতা না করে লোকটা সটান বেরিয়ে গেল। বেশ রাগ হল। কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। সুজাতা বলল, 'যাই বল মা, রুদ্র আঙ্কল পুরোদস্তুর সাহেব মানুষ। বাঙালিদের মতো ল্যাতপেতে নয়।'

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কোথায় থাকতেন?'

'ফ্রান্সে।'

'ফরাসিদের কি সাহেব বলা যায়?'

কুহেলি উঠে দাঁড়ালেন, 'বাঙালিরা সাহেব হতে পারলে ফরাসিরা হবে না কেন?'

'তুমি এখনই চলে যাচ্ছ?'

'যাই।'

'আজ আমার এখানে থাকো না!' সুজাতা আবদার করল।

'থাকব। কোন এক শনিবারে। রবিবারে ছুটি থাকবে।'

কুহেলি দরজার দিকে এগোচ্ছিল এইসময় ফোন বাজল। অমিয় রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। হ্যাঁ। কাকে চাই? আছে।'

'তোমার ফোন।' সুজাতাকে বলল অমিয়।

'কে?'

'নাম বলেনি।'

'আশ্চর্য! জিজ্ঞাসা করবে তো?'

'ও।'

'থাক।' সুজাতা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে একটু ঝাঁঝালেন, 'হ্যালো।' ওপাশের কথা শুনে সুজাতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'তুই! আমি ভাবতে পারছি না যে তুই আমাকে ফোন করেছিস। ওঃ, কি ভাল লাগছে রে! কোথায় নম্বর পেলি?' আবার কান পেতে শুনল ওপাশের কথা। শুনতে শুনতে সুজাতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে মুখ খুলল, 'তুই নিজে গিয়ে বলছিস না কেন?' উত্তরটাও শুনল। তারপর 'আচ্ছা' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো মুখ এখন তার।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

ঠোঁট কামড়ালো সুজাতা। 'তোমার বড় ছেলে ফোন করেছিল।'

'আচ্ছা! হঠাৎ?' কুহেলি খুব অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

'কবে?'

'আগামীকাল।'

'তুই বললি না কেন, কাল আমি কলকাতায় থাকব না!'

'বলতে পারলাম না।'

'তোকে কি আগেও ফোন করেছে?'

'না। এই প্রথম। মেজর কাছ থেকে নাম্বার পেয়েছে।'

'কি ব্যাপার বল তো? আমার মুখ আর দর্শন করবে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তোদের বিয়ে সে অ্যাকসেপ্ট করবে না বলে ঘোষণা করেছিল। আজ হঠাৎ সে-সব ভুলে যোগাযোগ করছে?'

'পরিষ্কার করে কিছু বলল না। আমাকে একা যেতে বলেছে। বাকিরাও আসবে। আমি তো বলে দিলাম সরাসরি তোমাকে বলতে।' সুজাতা বলল।

'শুনে কি বলল?'

'তোমার টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করতে ওর নাকি প্রবৃত্তি হয় না।'

'চমৎকার! তাহলে বাড়িতে আসছে কেন?'

সুজাতা কিছু বলতে গিয়েও মুখ ফেরালো।

কুহেলি আর দাঁড়ালেন না। অমিয় পেছন পেছন এল। নিচে নামার পর অমিয় বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।'

কুহেলি কিছু বললেন না। অমিয় ট্যাক্সি নিয়ে এলে চুপচাপ বসে পড়লেন। অমিয় ড্রাইভারকে বলে দিল কোন্ অঞ্চলে যেতে হবে।

বড় ছেলে কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, একা নয় সদলবলে। নিশ্চয়ই সে ঝড় তুলতে চায়। কিন্তু কি নিয়ে ঝড় তুলবে তা বুঝতে পারছিলেন না কুহেলি। সেই জমিটার ব্যাপারে যা মিস্টার পাকড়াশি জানিয়েছিলেন তাই নিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি যে কিছুই বলতে পারবেন না তা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে?

সদানন্দ মারা যাওয়ার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে সংঘাত লেগেছিল বড় ছেলের। কলেজে পড়ার সময়েই নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে শুরু করেছিল সে। কোনও ব্যাপারে মায়ের অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। মাথার ওপর বাবা নেই, বড় ভাইকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল পরের দুইজন। ঠিক সেই সময়ে সুজাতা এবং অমিয়র ঘনিষ্ঠতার কথা জানাজানি হয়ে গেল। কুহেলি ব্যাপারটাকে পছন্দ করেননি কিন্তু বড় ছেলে যেভাবে রুখে দাঁড়াল তাতেও তিনি অবাক হয়েছিলেন। ওর হাতে অমিয়কে হেনস্থা হতে হয়েছে। যদিও অমিয় ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় তবু নিজের সীমা ছাড়াতে দ্বিধা করেনি। এই ব্যাপারটা মানতে পারেননি কুহেলি। ওরা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করল তখন বড়

ছেলে ঘোষণা করল ওই বাড়িতে সুজাতার আর জায়গা হবে না।

এর কিছুদিন আগে শিবানীর সঙ্গে কুহেলির পরিচয় হয়েছিল। হৈ চৈ স্বভাবের মেয়েটাকে তাঁর ভাল লেগেছিল। শিবানী যে মাঝে মাঝে পান করে তা তিনি জেনেও সম্পর্ক রেখেছিলেন। ওই রকম পান-করা অবস্থায় শিবানী এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বড় ছেলেকে দেখে আগ বাড়িয়ে দু-চারটে কথা বলেছিল। সে চলে গেলে বড় ছেলে বলেছিল শিবানীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে। তাঁর মতে একমাত্র বেশ্যারাই মদ্যপান করে। কুহেলি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোর বাবা আমাকেও তো মদ খাওয়াতে চেয়েছিল। জোর করায় একদিন খেয়েও ছিলাম। তাহলে তোর মতে আমি বেশ্যা?'

বড় ছেলে বলেছিল, 'বাবার সঙ্গে কি করেছ তা আমার অজানা, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার ওই শিবানী কিছুদিনের মধ্যেই এ-বাড়িতে মদের আসর বসাবে। আসলে তোমার চেহারা যদি সত্যি মা-মা হত তাহলে এসব প্রশ্রয় দিতে না।'

'মানে? আমি তোদের মা নই?'

'আয়নায় নিজেকে দ্যাখো না? পাড়ার বাচ্চারাও তোমাকে সুচিত্রা সেন বলে ডাকে। ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন কুহেলি। স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে যে জীবন তিনি যাপন করছিলেন তা তথাকথিত বিধবার নয় কিন্তু নিজের চারপাশে শাসনের বেড়াজাল রেখেছিলেন বিশ্বস্তভাবে। অদ্ভুত ব্যাপার। মেজ বা সেজ ছেলে দাদার কথার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি।

শেষপর্যন্ত বড় ছেলে জানাল তার এক লক্ষ টাকা দরকার। সে ব্যবসা করবে। টাকাটা দেওয়া সম্ভব ছিল না কুহেলির। সেটা জানার পর ছেলে বলে গিয়েছিল এই বাড়িতে সে জীবনে ঢুকবে না। বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির কোন অংশ তার চাই না। সে এখন থেকে নিজের মতো করে জীবন যাপন করবে।

ছেলে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম করে তার বাবার দৌলতে চাকরি পেয়েছে। বিয়ে করেছে। এসব খবর টুকরো টুকরো পেয়েছেন কুহেলি। এই সেদিনও মেজ এবং সেজ ছেলে বলেছিল বড় ছেলেকে তারা জমির কথা বলেছিল কিন্তু সে জানিয়ে দিয়েছে কোনও আগ্রহ নেই। তাহলে হঠাৎ কাল আসতে চাইছে কেন? কিন্তু আসতে চাইলেই যে তাঁকে ওরা পাবে এটা ভাবছে কি করে? সুজাতাকে জানিয়ে দিয়েছে তাকে বলতে যে আসবে। যেন তাঁর কোনও কাজ থাকতে পারে না! এই তো, কাল সকালেই তো রুদ্রর সঙ্গে বাগডোগরায় যাওয়ার কথা আছে। বিকেলে বাড়িতে এলে ওরা তাঁকে পাবে না।

তবু অস্বস্তি যাচ্ছিল না। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে খেয়াল হল কুহেলির। তিনি শিবানীর বাড়ির কাছ দিয়েই যাচ্ছেন। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এই সময়

বাড়িতে থাকার মেয়ে শিবানী নয়। একমাত্র স্বামী বাড়িতে ফিরলে ও বাইরে পা বাড়ায় না। মনটা এমন বিচ্ছিরি হয়ে ছিল যে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়ি ঘোরাতে। শিবানী না থাকুক ওর শাশুড়ির সঙ্গে খানিকটা কথা বলা যেতে পারে।

শিবানী বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে শাশুড়ি বললেন, 'ও তুমি। কেমন আছ?'

'এই তো। আপনি?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার আর থাকা। ছেলে জলে ভাসছে আর আমি ডাঙায়। আচ্ছা, শিবানীর কি হয়েছে বল তো?' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন?'

'কদিন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না। সারাদিন ধরে শুয়ে থাকছে।'

'শরীর খারাপ।'

'না না। শরীর খারাপ হলে দুবেলা ভাত খেত না।'

'ওকে প্রশ্ন করেছিলেন?'

'উত্তর পাব না যখন জানি তখন প্রশ্ন করে কি লাভ?'

'আমি দেখছি।'

কুহেলি দোতলায় উঠে এলেন। শিবানীর ঘরের দরজায় ভারী পর্দা, সেটা সরাতে দেখতে পেলেন শিবানীকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে।

কুহেলি ডাকলেন, 'কিরে!'

যেন ভূত দেখার মতো অবস্থা হল শিবানীর, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শাড়ির আঁচল তুলে গলায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে কোনরকমে হাসার চেষ্টা করল, 'ওমা, তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু কি হয়েছে? ওরকম চমকে উঠলে কেন?' কুহেলি ঘরে ঢুকলেন।

'কোথায় চমকে উঠেছি। আচমকা গলা শুনলে ওরকম হয়। বসো।' দূরের চেয়ার দেখিয়ে দিল শিবানী।

কুহেলি বললেন, 'তারপর? খবর কি? কর্তা কবে আসছে?'

'অনেক দেরি। চা খাবে?'

'নাঃ।'

'আমার কাছে একটু হুইস্কি আছে।'

'পাগল নাকি!'

'তুমি অফিসে জয়েন করেছ?'

'হ্যাঁ। দ্যাখো না, এই বুড়ো বয়সে সব শিখতে হচ্ছে।' তা বলতে বলতে শিবানীর গালের দিকে নজর যেতেই কুহেলির চোখ ছোট হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকি, গালে কিসের দাগ ওগুলো?'

হাত চাপা দিল শিবানী, 'আর বোলো না, অ্যাসিড পোকা!'

'অ্যাসিড পোকা?'

'এক ধরনের ছোট্ট পোকা, চামড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে পুড়ে ঘা হয়ে যায়।'

'সর্বনাশ। ডাক্তার দেখিয়েছ?' উদ্বিগ্ন হলেন কুহেলি।

'মলম লাগাচ্ছি, কমে এসেছে।' শিবানী খাটের ওপর উঠে বসল।

'কয়েকদিন দেখা নেই তাই ভাবলাম—।'

'আমি যেতাম। এগুলো মিলিয়ে গেলেই যেতাম।'

'এগুলো মানে? অনেক জায়গায় হয়েছে নাকি?'

'ওই আর কি!' শিবানী খুব অস্বস্তিতে।

কুহেলি উঠে এলেন কাছে। শিবানী আঁচল সরাতে চাইছিল না। কিন্তু কুহেলির কাছে হার মানতে হল। কুহেলি চমকে উঠলেন। শিবানীর গলা, বুকের ওপরে অনেকগুলো ক্ষত। যদিও সেগুলো শুকিয়ে এসেছে কিন্তু সেগুলো পোকার দাগ বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। প্রতিটি ক্ষতের মাঝখানের জায়গাটা একটু গভীর।

তিনি সন্দেহে তাকাতেই গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল শিবানী।

'হাসছ যে!'

'ছেড়ে দাও তো!'

'আর কোথাও হয়েছে?'

'হুঁ। বুকে, পিঠে।'

'অ্যাসিড পোকা?'

'আশ্চর্য! বুঝতে পারছ যখন তখন প্রশ্ন করছ কেন?' শিবানী হাসল।

'এ তো পাশবিক ব্যাপার!' কুহেলি হতভম্ব।

মাথা নাড়ল শিবানী, 'একেবারে রাক্ষস।'

'লোকটা কে?'

'কোন্ লোকটা?'

'যে এই কাণ্ড করেছে।'

'কি হবে নাম জেনে? আমি যদি তাকে অ্যালাউ না করতাম তাহলে কি তার পক্ষে এরকম করা সম্ভব হত?' শিবানী মুখ ফেরালো।

'তুমি লোকটাকে এসব করতে অ্যালাউ করেছ?' আঁতকে উঠলেন কুহেলি।

'তুমি জানো না কুহেলিদি। আমি তো কচিখুকি নই। পতিদেবতাটি তো কম কিছু করেননি। কিন্তু এই ঘটনার পর মনে হচ্ছে সেসব এলেবেলে ছিল। হ্যাঁ, প্রথমদিকে যন্ত্রণা হয়েছে, চিৎকার করেছি। কিন্তু যন্ত্রণা থেকেও যে একটা দারুণ আনন্দের জন্ম হয় তা আগে জানতাম না। এসব না করলে ওরও শান্তি হয় না। পরে অবশ্য অনেকবার ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আই ওয়াজ ইন হেভেন।' চোখ বন্ধ হয়ে গেল শিবানীর, যেন স্মৃতিতে ভাসতে চাইল।

'তোমার লজ্জা লাগল না?' সরে গেলেন কুহেলি।

'কেন?'

'যাকে ভালবাসো না, যার সঙ্গে কখনও সম্পর্ক হবে না তার সঙ্গে এসব করার আগে নিজের সম্মান নিয়ে একটুও ভাবলে না?' কুহেলি প্রশ্ন করলেন।

'এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। তাছাড়া ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগে। কুহেলিদি, একটা কথা বলি। আমি জানি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে কয়েকটা সন্তান ছাড়া আর কিছুই পাওনি। সেগুলোতে তোমার কোনও ভূমিকা ছিল না। স্বামী মারা যাওয়ার পর যে কোনও যুবতীর চেয়ে তুমি বেশি যুবতী হয়ে আছ। তোমার কোনও চাহিদা নেই? বুকে হাত দিয়ে বলতে পার কথাটা? শোভনদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি নিরামিষ ছিল? আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।'. মাথা নাড়ল শিবানী।

'কেন?'

'কারণ আমি শোভন দাশগুপ্তকে চিনি। তাহলে তুমি কেন জড়ালে শোভনদার সঙ্গে? শোভনদার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক তৈরি হত না, দুদিনের আলাপে এমন ভালবাসা তৈরি হতে পারে না, অন্তত তোমার স্বভাবে সেটা নেই। তাহলে? কুহেলিদি, ওটা আচমকা হয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক অপূর্ণতা আছে। বেশির ভাগ মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে সেগুলো ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। এটা তো তুমিও জানো।' এক নাগাড়ে কথা বলে গেল শিবানী। এখন তার শাড়ির আঁচলের আড়াল তার গলায় নেই। যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উপত্যকার মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা।

বড় করে শ্বাস ফেললেন কুহেলি। 'লোকটা কি অবিবাহিত?'

'কেন?' হাসল শিবানী, 'আমার পক্ষে তো বিয়ে করা সম্ভব নয়। আর যদি সম্ভবও হত তাহলে একমাসেই মরে যেতাম। একসঙ্গে থাকলে সর্বনাশ হত।'

'লোকটা বাঙালি?'

'নিশ্চয়ই। এর বেশি প্রশ্ন কোরো না।'

'উত্তর দিতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

'বুঝতেই পারছ।'

'আচ্ছা, আমি যাই।'

'আরে! এই তো এলে। বসো।'

'নাঃ। ভাল লাগছে না।'

দরজা অবধি এগিয়ে দিল শিবানী, 'নিচে নামব না, বুড়ির চোখ শকুনকে হার মানায়। দাগগুলো মিলিয়ে গেলে তোমার কাছে যাব।'

কুহেলি নিচে নেমে এলেন। তাঁকে দেখে নিচের ঘর থেকে শিবানীর শাশুড়ি

বেরিয়ে এলেন। 'যাচ্ছ? কি দেখলে?'

কুহেলি তাকালেন। তারপর বললেন, 'চিন্তা করবেন না। ঠিকই আছে।'

'আমার তো ওপরে ওঠা সম্ভব নয়, পায়ের জন্যে। বলছ যখন তখন ভাল হলেই ভাল।' বৃদ্ধা বললেন।

ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও শিবানীর মুখে যে তৃপ্তির ছবি ফুটে উঠেছিল সেটা ভুলতে পারছিলেন না কুহেলি।

এখন রাত দশটা। একটু আগে পাখি আর শুদ্ধ ফিরেছে স্যুটিং থেকে। তিনতলায় ওঠার আগে পাখি কয়েক মিনিটের জন্যে এই ঘরে আসে। শুদ্ধ দরজায় দাঁড়ায়। শুদ্ধ আজ খুব জমকালো পোশাক পরেছে। এ-ব্যাপারে পাখি যে ভাইকে উদার হাতে দিচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পাখি খুব খুশি। এই কয়েক মাসে মেয়ের চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। খুব দ্রুত যুবতী হয়ে উঠছে ও। এত দ্রুত যে কুহেলির অস্বস্তি হয় ওর দিকে তাকালে। আজ পাখি খুব ভাল মুডে ছিল। সে উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে। আজই পরিচালক ওর সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত করেছেন।

হঠাৎ পাখি বলল, 'মা, তোমার কি টাকা লাগবে?'

'মানে?' কুহেলি তাকালেন।

'আমি তো এখন ভাল রোজগার করছি!'

'আমিও তো চাকরি করছি। এখন যা পাবে ব্যাঙ্কে রেখে দাও।'

'তুমি চাকরি করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?' পাখি খুব অবাক।

'রুদ্র আঙ্কল একটা বিশাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি খুলছেন, সেখানে।'

'ইনভেস্ট কোম্পানি মানে?'

'পাবলিক টাকা রাখলে বছরে ফর্টি এইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড পাবে।'

'ওরে ব্বাবা! কোত্থেকে দেবেন উনি?'

'ওই টাকা নিয়ে যে ব্যবসা করবেন তাতে অনেক বেশি লাভ হবে।'

'বাঃ। তাহলে আমিও টাকা রাখব।'

'রেখো। যাও এখন জামাকাপড় ছাড়ো। কাল কি স্যুটিং আছে?'

'হ্যাঁ। দেরিতে।' পাখি চলে গেল।

আবার শুয়ে পড়লেন কুহেলি। না। পাখিকে নিয়ে আর চিন্তা করার কোনও যুক্তি নেই। চোখ বন্ধ করে তাই শিবানীর মুখ ভেসে উঠল। লোকটা কে? শিবানী কিছুতেই নাম বলল না। অবিবাহিত কিনা তাও স্পষ্ট বলেনি। লোকটাকে ওর

ভাল লাগে। কিন্তু শিবানীর যদি উপায় থাকত তাহলে ওকে বিয়ে করত না ওই রাক্ষুসে স্বভাবের জন্যে। নিশ্চয়ই বেশ বড়সড় চেহারা। হাজার প্রশ্ন করেও নাম জানতে পারা যায়নি। শিবানী শেষ পর্যন্ত বলেছে প্রশ্ন না করতে। তার উত্তর দিতে অসুবিধে হবে বলে জানিয়েছে। কেন? যাকে তিনি চেনেন না তার নাম বলতে ওর কি অসুবিধে হয়েছিল?

আচমকা নড়ে উঠলেন কুহেলি? না, এটা সম্ভব নয়। যদিও কুহেলি একা হোটেলে রুদ্রর সঙ্গে ছিল কিন্তু রুদ্র কখনই ওই চরিত্রের মানুষ নয়। তাহলে শিবানী নামটা বলতে পারল না কেন?

কুহেলি উঠলেন। নাম্বার ঘোরালেন। শ্বাস নিলেন। রিঙ হচ্ছে ওপাশে।

'হ্যালো!' শিবানীর গলা।

'কুহেলি বলছি।'

'ও, বলো, কুহেলিদি!'

'লোকটার নাম কি রুদ্র রায়?' সরাসরি প্রশ্ন করলেন কুহেলি।

'কোন্ লোকটা? ও। কি আশ্চর্য? রাখছি!' লাইন কেটে দিল শিবানী।

এর মানে কি? এ কি অস্বীকার না মেনে নেওয়া! এসব হতে পারে তার সঙ্গে রুদ্র রায় খুব সতর্কভাবে পা ফেলছে। কোনভাবেই তাঁকে বিরক্ত করতে চায় না সে। অর্থাৎ তার সমস্ত ব্যাপারটাই মেকি। শিবানীর ক্ষেত্রে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। সেখানে হয়তো মুখোশ সরিয়ে রেখে নিজের মুখ দেখিয়েছে।

সমস্ত শরীরে জ্বলুনি শুরু হল। অস্বস্তি প্রবল। কিন্তু প্রমাণ কই? কিছুই নেই। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে অভিযোগের আঙুল তোলা যায় না। আবার এই তো ঠিক, এই কয়েকদিনে শিবানীর জীবনে রুদ্র রায় নিশ্চয়ই ঢেউ তুলেছে। আর কোনও পুরুষ যদি ওর জীবনে আসত তাহলে তার কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে দেরি করত না শিবানী।

হঠাৎ পৃথিবীটা সাদা হয়ে গেল। এত সাদা যে মন নিংড়ে যায়। রুদ্র রায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চালিয়ে শিবানীর সঙ্গে পাশবিক আনন্দ ভোগ করছে? অত ক্ষত শরীরে নিয়েও শিবানী কিরকম উল্লসিত! তিনি মনে মনে সব কটি ঘটনার বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর রুদ্র রায়ের প্রতিটি আচরণ, কথাবার্তা, এমন কি বিশেষ মুহূর্তে ওর বিনীত সৌজন্যের ভঙ্গিগুলোও তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। কোথাও কখনও একটি নরপশুর পাশবিক আচরণের ইঙ্গিত তিনি পাননি।

রুদ্র রায়কে সরাসরি প্রশ্নটা করা যায়? না। যায় না। করলে লোকটা স্বীকার করবে না, বা করলে খুব অবাক হবে, অপমানিত বোধ করবে। তাই একটু অপেক্ষা করলে এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হবে। শিবানী যে শারীরিক-আনন্দ পেয়েছে

তার স্থায়িত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিরোধ অনিবার্যভাবেই হবে। তখন মুখ খুলবে শিবানী। তদ্দিন একটু দূরত্ব না রেখে চলা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

টেলিফোন করলেন কুহেলি। রুদ্রর গলা কানে এল। ঘরে আরও অনেক কণ্ঠ বাজছে।

'রুদ্র, আই অ্যাম সরি। কাল আমি যেতে পারছি না।' কুহেলি বললেন।

'সেকি! কেন?'

'বাড়িতে একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কি সমস্যা?'

'বেশ জটিল। দেখা হলে বলব।' কুহেলি ফোন ছাড়তে চাইলেন।

'কতটা জটিল হতে পারে? তুমি যে কারণে নর্থ বেঙ্গলে যাবে সেটা তোমার অফিস মনে করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! তোমার খারাপ লাগতে পারে শুনতে, কিন্তু অফিসের ব্যাপারে আমি কখনই ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিই না। আশা করি দ্বিতীয়বার এ ধরনের কথা শুনব না।' ফোন রেখে দিলেন রুদ্র রায়।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কুহেলি।

রুদ্র রায় যে তাঁর সঙ্গে ওই গলায় এমন শক্ত কথা বলতে পারেন তা তাঁর ভাবনায় ছিল না। আপাদমস্তক ভদ্রলোক বলে যাকে মনে হয়েছে সে তাঁকে এইভাবে অপমান করল? হ্যাঁ, তাঁকে খুব ভাল টাকা দেওয়া হবে প্রতি মাসে কিন্তু তাই বলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই তিনি বিক্রি করে দেননি। তাছাড়া তাঁর কাজ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি দেখাশোনা করা। নর্থ বেঙ্গলের ডিস্টিলারি কোম্পানির সঙ্গে তাঁর তো কোনও সম্পর্ক নেই? তাহলে তাঁকে সেখানে যেতে হবে কেন?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিজের কোনও যোগ্যতা ছিল না। রুদ্র রায় তাঁকে অনুগ্রহ করেছিলেন। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন প্রায় হাউসওয়াইফকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বড় চেয়ারে বসিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু যে তার ইচ্ছেমতো চলতে পারে না একথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। সেটা ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে। আগামীকাল অফিসে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্রটি রেখে আসবেন তিনি। অল্পবয়সে স্বামীর হুকুম মানতে বাধ্য ছিলেন। আর কাউকে সেই সুযোগ দেবেন না।

আঠারো

দুই কর্তার কেউ আজ অফিসে আসেনি। কিন্তু যাবতীয় কাজকর্ম যেন কুহেলির জন্যে ওৎ পেতে ছিল। সকালে লিখে ফেলা পদত্যাগ-পত্রটি কুহেলি ব্যাগ থেকে বের করার সুযোগ পেলেন না। এখন প্রচুর মানুষের ভিড় অফিসে। তারা এজেন্সির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এসেছে, ফর্ম দেওয়া হচ্ছে তাদের। প্রত্যেককে যেন ঠিকঠাক অ্যাটেন্ড করা হয় নির্দেশ দেওয়া ছিল, তবু কুহেলি ঘুরে ঘুরে তদারকি করছিলেন। এত মানুষ কোনও বিজ্ঞাপন না দেখে এই ঠিকানায় পৌঁছে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। রুদ্র রায়ের ক্যালকুলেশন যে সঠিক তা প্রমাণিত হতে চলেছে।

আজ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন তিনি।

স্নান সেরে সবে এক কাপ চা নিয়ে বসেছেন ঠিক তখনই ওরা এল। বড় মেজ সেজ। তিনজনেই গম্ভীর মুখে সামনের সোফায় বসে পড়ল। বহুদিন বাদে বড় ছেলেকে দেখতে পেলেন তিনি। বেশ বড়সড় পুরুষমানুষ বলে মনে হচ্ছে।

কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা দিতে বলব?'

মেজ ছেলে বলল, 'না। দরকার নেই। কাজের কথায় এসো।'

'আমি কিন্তু জানি না কেন তোমরা দল বেঁধে এসেছ? আমার মুখ দেখতে যার ঘেন্না করে তাকে কি প্রয়োজনে এখানে আসতে হচ্ছে!' কুহেলি বললেন।

'কারণ অন্য কোনও উপায় নেই। আমরা তো আইনের ঊর্ধ্বে নই। সুজাতা আসেনি?'

সেজছেলে বলল, 'দিদিকে একটু আগে ফোন করেছিলাম। বলল কোন বক্তব্য নেই।'

বড় ছেলে বলল, 'বাঃ। তাহলে ধরে নেব যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাতে ওর সায় আছে।'

মেজ ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রথমে আমরা জানতে চাই, বাবার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির কোনও তালিকা তোমার কাছে আছে কিনা!'

একমুহূর্ত ভাবলেন কুহেলি। ইচ্ছে করলে ওদের প্রশ্নের জবাব তিনি নাও দিতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সব পরিষ্কার হয়ে যাক আজই।

বললেন, 'তিনি কোন লিস্ট রেখে যাননি। এই বাড়ির বাইরে স্থাবর সম্পত্তি আছে কিনা আমি জানতাম না। মিস্টার পাকড়াশির কথা শুনে জেনেছি ওঁর কেনা জমি আছে। কিন্তু সেটা ওঁর মুখ থেকে শোনার আগেই তিনি চলে গেলেন। মেজ

ছেলের দিকে তাকালেন তিনি, 'তুমি কি মিস্টার পাকড়াশির বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'ওঁরা কিছু জানেন না। খোঁজ নিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছি।' মেজ ছেলে গম্ভীর গলায় বলল।

'তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই বাড়িটি বাবার একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি। বাবা ব্যাঙ্কে কি রেখে গেছেন, অন্য কোথা থেকে বাবার জন্যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে কিনা এটা এখন জানা দরকার। বড় ছেলে বলল।

'কেন? জানা দরকার কেন?' কুহেলি তাকালেন।

'কারণ ওই টাকাপয়সাতেও আমাদের অংশ আছে।'

'তোমাদের বাবার মৃত্যুর পর এতগুলো বছর সংসার কি করে চলল তা নিয়ে যখন কেউ মাথা ঘামাওনি তখন ও ব্যাপারে আমি কিছুই জানাতে বাধ্য নই। শুধু মনে রেখো তোমাদের বাবা লক্ষ লক্ষ টাকা কোনও ব্যাঙ্কে রেখে যাননি।'

'রাখলেও এতদিন পরে যে সত্যি কথা শুনব সেই আশা করি না।'

'তাহলে এখানে এসেছ কেন?'

মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বড় ছেলে বলল, 'এইটের জন্যে। এই বাড়ি। বাবা এই বাড়ি তৈরি করেননি। তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুর্দার কাছ থেকে। অতএব কাউকে উইল করে বাড়িটা দিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। দেরি করে তো কোনও লাভ নেই। আমরা বাড়িটা থেকে যে যা পাব এখনই নিয়ে নিতে চাই।'

'বাড়ি থেকে নেবে মানে?' কুহেলির মস্তিষ্ক কাজ করল না।

মেজছেলে হাসল, 'নিশ্চয়ই ইঁট কাঠ খুলে ভাগ করার কথা দাদা বলছে না। চেষ্টা করতে হবে যতটা ভাল দাম পাওয়া যায়, তাতে কয়েক মাস লাগতে পারে, তারপর বিক্রি করে টাকাটা ভাগ করে নিতে হবে।'

কুহেলি শ্বাস ফেললেন, 'তোমরা চাইছ এই বাড়ি বিক্রি করে দিতে?'

সেজছেলে বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের সবার অংশ আছে কিন্তু শুধু তোমরা ভোগ করছ এটা কি ঠিক। তাছাড়া এই বাড়ি সম্পর্কে আমাদের কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা তিনজনই তো নও, আমি ছাড়া আরও তিনজন আছে। তাদের কি মত সেটা আমাকে জানতে হবে। তারা যদি না চায় তাহলে বিক্রি হবে না।'

সেজছেলে বলল, 'দিদি বলেছে আমাদের মতই ওর মত।'

'সেটা আমি ওর নিজের মুখে শুনব।'

বড় ছেলে বলল, 'ভালই তো। কেউ যদি বিক্রি না করতে চায় তাহলে সে

দায়িত্ব নিক। বাড়ির যে হায়েস্ট প্রাইস পাওয়া যাবে তাই সাতভাগ করে তিনভাগ আমাদের দিয়ে দিক। সে বাড়ি নিয়ে কি করছে দেখতে যাব না।'

'অদ্ভুত কথা। ওদের কারও পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নাকি!'

'জানি না। বাজারে তো এখন পাখি সেনের খুব নাম। অনেক ছবির নায়িকা হচ্ছে। নায়িকারা তো শুধু ছবিতে কাজ করার জন্যে টাকা পায় না, অন্য অনেক কারণেই পায়। ওর যেসব ছবি কাগজে ছাপায় তা থেকে ওটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওকে আমার বোন বলতে সঙ্কোচ হয়। জিজ্ঞাসা কোরো ওকে, হয়তো দেখবে এটা ওর হাতের ময়লা।' বড় ছেলের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি চলকে উঠল।

সেজছেলে বলল, 'খোঁজ নিতে হবে, এ বাড়ি বিক্রি করলে কত পাওয়া যাবে!'

মেজছেলে বলল, 'দালালরা বলতে পারবে।'

'কোথাও খোঁজ নিতে হবে না। হারাধন জ্যেঠুর বাড়িটা চিনতিস? ওপাশে গলির ভেতর। আমাদের মতো তেতলা বাড়ি। আঠারো লাখে বিক্রি হয়েছে। গলির ভেতর যদি ওরা আঠারো পেয়ে থাকে তাহলে আমরা অনেক বেশি পাবো!' বড় ছেলে বলল।

মেজ ছেলে বলল, 'তাহলে—!'

'ওই তো, ফিল্মস্টার যদি বলে তাহলে একুশ লাখেই সেট্‌ল করব। সাতভাগ হলে তিন লাখ করে পাবো। আমাদের তিনজনের ন'লাখ দিয়ে দিলে সমস্যা মিটে যাবে। নাহলে মাস দুয়েকের মধ্যে খদ্দের দেখে কাগজপত্র তৈরি করে বিক্রিবাটা শেষ করতে হবে। আচ্ছা চলি।' বড় ছেলে উঠে দাঁড়াতে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল।

দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়ে বড় ছেলে বলল, 'ওরা কি চায় তা তিনদিনের মধ্যে জেনে নিলে সবার পক্ষে সুবিধে হবে।'

ওরা চলে গেল।

ঘর, আসবাব, দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে কুহেলির আজ মনে হল ওরা যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কত বছর হয়ে গেল এখানে! বিয়ের পর প্রথম কয়েকটা বছর এই বাড়িটাকে জেলখানা বলে মনে হত। একটুও ভালবাসা তৈরি হয়নি বাড়িটার জন্যে। আজও কি তৈরি হয়েছে? হয়তো না। কিন্তু, তবু এই ঘরে এলে নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুই করতে পারেন না তিনি। শ্বশুরের বানানো বাড়িতে তাঁর অধিকার সাত ভাগের এক ভাগ। ছয় জন যদি একত্রিত হয় তাহলে তাঁর কিছুই করার থাকবে না।

হাসলেন কুহেলি। এমনিতেই কি তাঁর কিছু করার ক্ষমতা আছে? এখন তো পাখিকেও তিনি সংঘাত এড়ানো কথা বলেন! না বললেই তো ঝামেলা বেড়ে যাবে।

সুজাতা আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি বলেছি একথা? ওরা কি ভেবেছে? যা ইচ্ছে বানিয়ে আমার মুখে বসাবে?'

'তাহলে তোর আপত্তি আছে বিক্রির ব্যাপারে?'

একটু যেন ভাবল সুজাতা, 'তুমি কি বলছ?'

'আমি বুঝতে পারছি না। বিক্রি করে না দিলে ওদের টাকা দিতে হবে।'

'ও বাব্বা! মা, ছেড়ে দাও। ঝামেলায় জড়িয়ে কোন লাভ নেই। তুমি যদি টাকা না দাও তাহলে নিশ্চয়ই ওরা কোর্টে যাবে।'

'তাই তো মনে হয়।'

'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। কিন্তু ওদের টাকা দেবে কি করে? তার চেয়ে ওই বাড়ি বিক্রি করে একটা ভাল ফ্ল্যাট কিনে চলে এসো এদিকে।'

'ফ্ল্যাট।'

'তোমাদের তিনজনের টাকায় বিশাল ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। তার পরেও বাঁচবে টাকা।'

'তুই কি করে ভাবছিস পাখি চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে?'

'তা অবশ্য। বিয়ের পর ও তো বরের সঙ্গে থাকবে। তবে শুদ্ধ— ।'

'সে-ও যে দাদাদের পথ ধরবে না তার কোনও গ্যারান্টি আছে?'

'তা ধরবে না। তবে পাখি যা বলবে তাই করবে ও।'

'আমি এসব ভাবছি না।' কুহেলি বললেন।

'মা, একটা কথা বলব?'

কুহেলি কথা না বলে অপেক্ষা করলেন।

'তুমি রুদ্র আঙ্কলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করো।'

'পাগল। ওকে বলব আমার ছেলেরা বাড়িটাকে খুবলে খুবলে নিতে চাইছে। কি করা যায় বুঝতে পারছি না!' হাসলেন কুহেলি।

'তা অবশ্য—।'

'এখন রাখছি।'

পাখি এল সাড়ে দশটায়। সঙ্গে শুদ্ধ, ওর ব্যাগ হাতে।

দোতলায় ওঠার আগে নিয়মরক্ষা করার জন্যে মায়ের ঘরে ঢুকল। পাখিকে ছেলেদের অভিলাষ জানালেন কুহেলি।

পাখির মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'দারুণ ব্যাপার মা।'

'তার মানে?' কুহেলি অবাক।

'এই বাড়িটা একে পুরোনো, তার ওপর কোনও সিস্টেম নেই। কাউকে বাড়িতে ডাকা যায় না। দাদারা যদি বিক্রি করতে বলে তুমি আপত্তি করবে না। আমাদের শেয়ার দিয়ে সাউথে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট কিনে নেব আমরা।'

'দুটো ফ্ল্যাট?'

'একটা তোমার আর একটা আমাদের। প্রাইভেসিও থাকবে আবার একসঙ্গে থাকাও হবে। উঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে মা, তোমাকে বোঝাতে পারব না। কালই একজন প্রোডিউসার বলছিলেন যে উনি গল্‌ফ ক্লাব রোডে চারতলা বাড়ি বানাচ্ছেন। আমি আমল দিইনি। এখন মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে জানানো দরকার। দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট নেব। আমি নিলে নিশ্চয়ই কিছুটা সস্তায় দেবেন। কিরে শুদ্ধ?'

শুদ্ধ বলল, 'দেবেই।'

গুনগুনিয়ে ওপরে চলে গেল পাখি। পেছনে ওর জিনিস নিয়ে শুদ্ধ। হঠাৎ খুব কান্না পেল কুহেলির। কিন্তু কান্নাটাকে তিনি প্রাণপণ চেষ্টার পর গিলে ফেললেন।

অফিসে কাজেব চাপ এত প্রবল যে হিমসিম খাওয়ার অবস্থা কুহেলির। ঢেউ-এর মত লোক আসছে। হাজার হাজার টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিচ্ছে, সার্টিফিকেট নিয়ে যাচ্ছে। সেই টাকা অফিস ছুটির পর চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্কে বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী।

অমিয় এসেছিল ফর্ম নিতে। সঙ্গে ব্যাঙ্কের ছেলেটিও ছিল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে সে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। সুজাতা ফোন করে বলেছে, অমিয়র অফিসের সহকর্মীরা কেউ পাঁচ, কেউ দশহাজার টাকা ওকে দিয়েছে। আরও অনেকে দিতে চাইছে। কারণ প্রতিমাসে ফোর পার্সেন্ট সুদের কথা কেউ কল্পনাও করেনি। কারও কারও মনে যে সন্দেহ আসছে না তা নয়। তারা অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে কি হয় তা দেখার জন্যে।

আজ বিকেলে যখন কাজ শেষ হল তখন তাঁর ঘরে এলেন রুদ্র রায়। এ-কদিন দেখা হয়েছে কিন্তু কাজের কথার বাইরে অন্য কোনও কথা হয়নি।

চেয়ার টেনে বসে রুদ্র রায় বললেন, 'অভিনন্দন।'

'তার মানে?'

'তুমি এত এফিসিয়েন্টলি সব কিছু ট্যাক্‌ল করবে ভাবতে পারিনি।'

'ধন্যবাদ।'

'খুব রেগে আছ?'

'তার কি কোনও কারণ আছে?' কুহেলি তাকালেন।

'আসলে সেদিন—! নাঃ, কোনও কৈফিয়ত দেব না। পরে আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'কিসের ভয়?'

'তুমি হয়তো রেজিগনেশন দিতে পার।'

ব্যাগ খুলে হাতে লেখা রেজিগনেশন লেটারটা এগিয়ে দিলেন কুহেলি। সেটায় চোখ বেখে সোজা হয়ে বসলেন রুদ্র রায়, 'মাই গড!'

'যেহেতু সেদিন তোমরা কেউ ছিলে না, তাই দিতে পারিনি।'

কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন রুদ্র রায়।

'ছিঁড়লে যে!' কুহেলি বললেন।

তাকালেন রুদ্র রায, 'কুহেলি আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না?'

'কিভাবে?'

'বিবাহিত হয়ে।'

মুহূর্তেই পায়ের তলা অসাড় হয়ে গেল কুহেলির। না, ছেলেদের কাছে জবাবদিহির দায় আর তাঁর নেই। পাখি তো বলেই দিয়েছে তাঁর জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট নেবে। তাঁকে একা করে দিতে কারও যখন কোনও আপত্তি নেই তখন বাকি জীবনটা তিনি কেন নিজের মতো বাঁচবেন না?

'না, তোমাকে এখনই কোনও মতামত দিতে হবে না।'

হঠাৎ মনে পড়ল শিবানীর কথা। ইতস্তত করেও জিজ্ঞাসা করলেন কুহেলি। 'তোমার সঙ্গে শিবানীর দেখা হয়েছে?'

'শিবানী? না তো? কেন? কিছু হয়েছে?'

'তেমন কিছু নয়।'

রুদ্র রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি কি এখনই বাড়ি ফিরে যাবে?'

'তাই তো যাই।'

'আজকের সন্ধেটা কি আমরা একসঙ্গে কাটাতে পারি না।' রুদ্র রায় তাকালেন, তারপর হেসে ফেললেন।

মুখ তুললেন কুহেলি।

আজ এক তারিখ। বুদ্ধপূর্ণিমার সুবাদে সরকারি অফিস ছুটি। কিন্তু সুজাতাদের ফোন সকাল থেকেই বেজে চলেছে। উত্তর দিতে দিতে অমিয় জেরবার। ঠিক দশটায় স্নান সেরে সে বেরিয়ে গেল ডালহৌসির উদ্দেশে। তারপর থেকে সুজাতাকেই রিসিভার তুলতে হচ্ছে। উত্তরটা সবক্ষেত্রেই মোটামুটি একই রকমের। 'হ্যালো। হ্যাঁ। না, উনি বাড়িতে নেই। হ্যাঁ। বলে গেছেন বিকেল

পাঁচটার মধ্যে পেমেন্ট নিয়ে ফিরে আসবেন।'

একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ শীত করতে লাগল সুজাতার। যদি অমিয় খালি হাতে ফিরে আসে! যদি বলে আজ টাকা পাওয়া গেল না, কবে পাওয়া যাবে তাও বলতে পারেনি। ওই লোকগুলো যারা অমিয়কে বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছিল তারা খবরটা শুনে কি করবে? রিসিভার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বসে পড়ল সুজাতা।

মিস্টার কৃষ্ণানের ঘরে যাওয়ার জন্যে যখন ডাক এল তখন ঘড়িতে বারোটা বাজে। কুহেলি টেবিলে রাখা ফাইলে চোখ বোলাচ্ছিলেন। ডিভিডেন্ড এবং কমিশন বাবদ আজ কুড়ি লক্ষ টাকা পার্টিদের দিতে হবে। সকাল থেকে মিস্টার কৃষ্ণান অফিসে ছিলেন না। বারংবার তাঁর কাছে প্রশ্ন আসছে, কখন থেকে পেমেন্ট করা শুরু হবে? উত্তর দিতে পারেননি। শেষপর্যন্ত রুদ্রকে যখন ফোনে ধরতে পারলেন তখন জানলেন, লাঞ্চের পরে। রুদ্রও অফিসে এসেই বেরিয়ে গিয়েছে। অনুমোদন পেয়ে কুহেলি লিস্ট অনুযায়ী টোকেন দিতে বললেন এজেন্টদের। সেটা শুরু হলে বাইরের চেঁচামেচি শান্ত হয়ে গেল।

মিস্টার কৃষ্ণানের ঘরের দরজা ঠেলতেই তিনি বললেন, 'গুড মর্নিং। ওয়েল-কাম বসুন। আপনাকে নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম।'

'সেকি! কোনও ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই।'

কুহেলির বলার ধরন শুনে হেসে উঠলেন রুদ্র রায়। বললেন, 'কৃষ্ণান বলছে তুমি খুব লাকি মানুষ। প্রথম মাসেই এতটা রেসপন্স নাকি তোমার জন্যে পাওয়া গেছে।'

'মোটেই না। আমার ভাগ্য কি রকম তা আমি জানি। একটু বেশি টাকা যেখানে পাওয়া যাবে মানুষ সেখানেই ছুটে যাবে। এটাই নিয়ম।' কুহেলি বললেন।

কৃষ্ণান একটা কাগজ টেনে নিলেন, 'আচ্ছা, আমি অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করছি। গত মাসের এক তারিখ এবং দু'তারিখেও যে টাকা পাওয়া গেছে তার ডিভিডেন্ড আজ আমরা পে করব। আমরা পেয়েছি চার কোটি টাকা। এই টাকা বিনিয়োগ করে লাভ হয়েছে চল্লিশ লক্ষ টাকা। আমাদের আজ ডিভিডেন্ড দিতে হবে কুড়ি লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কমিশনও আছে। সুতরাং প্রথম মাসেই আমরা কুড়ি লক্ষ টাকা প্রফিট করছি। এটা গ্রস প্রফিট। আমি টাকার অংশটাকে ভেঙে বললাম না।'

কৃষ্ণান হাসিমুখে তাকালেন।

কুহেলি বললেন, 'এই মিটিং-এ আমাকে ডাকলেন কেন? এটা তো কোম্পানির নিজস্ব ব্যাপার। একজন কর্মচারীর কি এসব জানা ঠিক?'

কৃষ্ণান মাথা নাড়লেন, 'কারেক্ট। কোম্পানির গোপন তথ্য বাইরের লোকের কাছে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনাকে আমরা আর একজন কর্মচারী হিসেবে দেখতে রাজি নই। আপনাকে বোর্ডের মেম্বার হিসেবে পেতে চাইছি।'

'আমি?' হাঁ হয়ে গেলেন কুহেলি।

'হ্যাঁ। আপনার সার্ভিস দেখে মিস্টার রায় আর আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি আপনার সহযোগিতা পাব।' কৃষ্ণান কথা শেষ করলেন।

রাত আটটা বেজে গেল সবাইকে ঠিকঠাক পে করতে। ততক্ষণ বেশ একটা উত্তেজনায় কাটছিল সময়টা। শেষ হতেই ক্লান্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ি ফেরার জন্যে বেরিয়েও মন বদলালেন। অমিয় নিশ্চয়ই এসেছিল। ওরা যেখানে ছিল সেখানে তিনি যাননি। তাই অমিয়র পক্ষে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না। রাত পৌনে নটায় মেয়ের বাড়িতে এলেন কুহেলি।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। অনেকের গলা বাইরে আসছে। কুহেলি দরজায় দাঁড়াতেই দৌড়ে এল সুজাতা, 'মা! তুমি? ভাবতেই পারিনি। এসো এসো।'

হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল সুজাতা। ঘরে তখন জনা পাঁচেক ভদ্রলোক বসে আছেন। সুজাতা বলল, 'ইনি আমার মা। মা-ই ওকে সুযোগ করে দিয়েছেন এজেন্সি পাওয়ার ব্যাপারে। মা ওই ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে আছেন। আর মা, এঁরা ওর অফিস-কলিগ। ওর মাধ্যমে টাকা রেখেছে। আজ ইন্টারেস্ট নিতে এসেছেন।'

কুহেলি বললেন, 'আমরা কিন্তু ইন্টারেস্ট বলি না, বলি ডিভিডেন্ড।'

এক ভদ্রলোক বললেন, 'অমিয়র কাছে শুনেছি আপনার কথা। শুনে ভরসা পেয়েছি। এত বেশি ইন্টারেস্ট বা ডিভিডেন্ড তো কেউই দেয় না। তাই ভয় হয়েছিল। যদি শোনেন কোন গোলমালের সম্ভাবনা আছে তাহলে প্লীজ আগেভাগে অমিয়কে জানিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই। তবে গোলমাল হবে না। এই একমাসে আপনারা যে ডিভিডেন্ড পেয়েছেন তার অনেক অনেক বেশি কোম্পানি প্রফিট করেছে। আচ্ছা।'

ভেতরের ঘরে চলে এলেন কুহেলি।

ভদ্রলোকদের বিদায় করে সুজাতা বেডরুমে ঢুকে দেখল কুহেলি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপরে। পাশে বসল সে, 'শরীর খারাপ লাগছে, না? খুব পরিশ্রম হচ্ছে?'

'ওই আর কি! একটু চিনি আর লেবু দিয়ে শরবৎ খাওয়াবি?'

'এখনই দিচ্ছি।'

মিনিট তিনেকের মধ্যে শরবৎ আনল সুজাতা। কুহেলি উঠে বসে চুমুক

দিলেন। ঠাণ্ডাটায় শরীর জুড়োল।

সুজাতা বলল, 'অমিয় দুহাজার আর আমি দুহাজার পেয়েছি। আর আমাদের কোন অভাব থাকবে না।'

'তুই দুহাজার কেন?'

'বারে। আমি পঞ্চাশ হাজার রেখেছি।'

'ওমা! কোথায় পেলি অত টাকা?'

'উঃ। তুমি সব ভুলে গেছ। আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে, মনে নেই?'

'ও।' মিস্টার পাকড়াশির মুখ মনে পড়ল কুহেলির।

সরবৎ শেষ করে কুহেলি বললেন, 'এবার চলি।'

'একটু থাকো।'

'কেন?'

'আজ রাত্রে আমার এখানে খেয়ে যাও। কোনদিন খাওনি তুমি!'

হেসে ফেললেন কুহেলি, 'কি রান্না করেছিস?'

'যাই করি, একসঙ্গে খেলে খুব ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে। আমাকে একটা শাড়ি দে।'

'শাড়ি কেন, নাইটি দিচ্ছি।'

'নাইটি? কেন?'

'খেয়ে দেয়ে আজ রাত্রে এখানে ঘুমাবে।'

'পাগল! ছেলেমেয়ে দুটো একা থাকবে?'

'ওরা যথেষ্ট বড় হয় গিয়েছে। তাছাড়া আমি ফোন করে দিচ্ছি। তুমি ওদের জন্যে চিন্তা কোরো না।' সুজাতা ছুটল।

উনিশ

ইনভেস্ট কোম্পানি দারুণ চলছে। বাজার থেকে যে পরিমাণ অর্থ ওঁরা ধার হিসেবে নেবেন বলে স্থির করেছিলেন তার থেকেও বেশি জমা পড়ে গেছে। কাজের চাপ আরও বেড়ে গেছে কুহেলির। এতদিনে তিনি তাঁর করণীয় ব্যাপারগুলো চমৎকার বুঝে নিতে পেয়েছেন। রুদ্র বেশিরভাগ সময় থাকছেন উত্তর বাংলায়। ডিস্টিলারির কাজ প্রায় শেষ। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ওই ডিস্টিলারির টাকার অর্ধেকাংশ নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ হিসেবে। কৃষ্ণান হেসে বলেছে, 'ব্যাঙ্ক নিচ্ছে বছরে আঠারো পার্সেন্ট। গায়ে লাগছে না।

কুহেলি বলেছিলেন, 'তাহলে তো ব্যাঙ্ক থেকে লোন কাউকে অনেক বেশি সুদে ধার দেওয়া যায়। অন্যের পয়সায় ভাল লাভ হবে।'

কৃষ্ণান বুঝিয়েছিল, 'ব্যাঙ্ক হাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে লোন দেয় না। তারা জামিন চায় ডিস্টিলারির জমি, বাড়ি। আধুনিক মেশিনগুলো ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখার পর ওরা ধার দিয়েছে ম্যাডাম। আপনাকে বলতে হবে কেন কি করতে ধার চাইছেন। তাছাড়া আপনি যাকে ধার দেবেন সে যদি ডোবায় তাহলে চোখে সরষের ফুল দেখতে হবে। আমরা যেটা করছি সেটাই সবচেয়ে ভাল ব্যবসা।'

প্রতি শুক্রবার কলকাতায় চলে আসে রুদ্র রায়। দুটো দিন এমনভাবে কাটায় যে কেউ মনে করবে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। মাঝে মাঝে এমন বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে খুব অস্বস্তিতে পড়েন কুহেলি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত, রুদ্রকে তাঁর তিন ছেলেমেয়ে গ্রহণ করেছে। এমন কি অমিয়ও। শাশুড়ির বন্ধু রুদ্র রায়। শাশুড়ি একা থাকবেন কিছুদিনের মধ্যে। রুদ্র রায় যদি শাশুড়িকে বিয়ে করেন তাহলে ভদ্রমহিলা আনন্দে থাকবেন। ওর ব্যবহারে এইরকম একটা ইচ্ছে যেন ফুটে ওঠে। সুজাতা তো পরিষ্কার বলেই ফেলল, 'মা, তুমি সারাজীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করেছ, এখন রুদ্র আঙ্কলের সঙ্গে যদি তুমি সুখে থাকতে পার তাহলে তার চেয়ে ভাল আর কি হবে!'

কুহেলি সত্যি লজ্জা পেয়েছিলেন, 'এই বুড়ো বয়সে ওসব করলে লোকে কি বলবে।'

'লোকে কে কি বলছে তাতে একদম মাথা ঘামাবে না। কষ্টের দিনে কে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল? আর বয়স? তোমাকে বুড়ো বলে মোটেই মনে হয় না। যতদিন মনের বয়স না বাড়ে ততদিন মানুষ তরতাজা থাকে। রুদ্র আঙ্কলকে দ্যাখো, কিরকম হৈ চৈ করেন, রাত এগারোটায় সবাইকে টেনে নিয়ে

যান গ্র্যান্ডে। তখন তো ওঁকে অমিয়র থেকেও ছোটো দেখায়।' সুজাতা বলেছিল।

ব্যাপারটা যে পাখিকেও প্রীত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। একরাতে স্যুটিং থেকে ফিরে বলল, 'মা, কেয়াতলায় একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি হচ্ছে। প্রোমোটার আমাদের প্রোডিউসার। এখনই বুক করলে অনেক সস্তায় হয়ে যাবে। আমাদের এই বাড়ি বিক্রির পর টাকা পেতে তো দেরি আছে। তুমি রুদ্র আঙ্কলকে বল ফ্ল্যাটের অ্যাডভান্সের টাকাটা দিয়ে দিতে। বেশি নয়, এক লক্ষ।

'রুদ্র দেবে কেন?' মুখ ফিরিয়েছিলেন কুহেলি।

'তুমি বললে নিশ্চয়ই দেবে। ফ্ল্যাটের নকশা দেখলে তোমাদের পছন্দ হবেই।' পাখি উঠে গিয়েছিল তিনতলায়।

'তোমাদের পছন্দ হবেই।' হাসলেন কুহেলি। অর্থাৎ পাখিও ধরে নিয়েছে তিনি আর রুদ্র একসঙ্গে বাকি জীবনটা থাকবেন। শুক্রবার রুদ্রর গেস্ট হাউসের সোফায় বসে কথাটা বললেন কুহেলি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র বললেন, 'ভাল প্রস্তাব। আমি কৃষ্ণানকে বলে দিচ্ছি, ও শনিবারে তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে।'

'ফ্ল্যাট কিন্তু তোমার নামে বুক করা হবে।' কুহেলি বললেন।

'না ম্যাডাম। ওটা আপনার নামেই হবে। আমি বিদেশি, পাসপোর্ট অনুসারে তো নিশ্চয়ই। খামোখা কম্প্লিকেশন বাড়িয়ে কি লাভ!'

সোমবার এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে নিজেই বলে এলন রুদ্র রায়। তখন অফিসে যেতে হবে বলে তাড়াহুড়ো করছিলেন কুহেলি। মেয়ে তার ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে স্যুটিং-এ। ফাঁকা বাড়িতে একা পেয়ে কুহেলিকে জড়িয়ে ধরলেন রুদ্র রায়।

কুহেলি চিৎকার করে উঠলেন। রুদ্রর দুটো হাত তাঁকে চুরমার করে দিত আর একটু সময় পেলে। চিৎকার কানে যেতেই চট করে হাত সরিয়ে নিল রুদ্র, যন্ত্রণায় দুচোখে জল চলে এল, মনে হল বুকের হাড়গুলো ভেঙে গেছে।

'সরি, ডার্লিং, ঠিক বুঝতে পারিনি!' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল রুদ্র রায়।

জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে সোফায় বসলেন কুহেলি। টনটন করছে উর্ধ্বাঙ্গের যাবতীয় হাড়। কোনরকমে বললন, 'আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলে!

'সরি। ক্ষমা চাইছি। আসলে তোমার দিকে তাকিয়ে আচমকা এত উত্তেজিত হয়ে গেলাম! আর হবে না।' রুদ্র আলতো করে হাত ধরলেন, 'এখনও শরীর খারাপ করছে?'

'ঠিক আছি।' চোখ বন্ধ করলেন কুহেলি।

'আসলে আজ আমাদের ফ্ল্যাট বুক করতে যাবে, মানে কলকাতায় আমাদের এক্সক্লুসিভ থাকার জায়গা হবে, ভাবতেই কি রকম রোমাঞ্চ লাগছিল। তারপর

সকালে টাকাটাও পেয়ে গেলাম। কৃষ্ণানকে বলার দরকার নেই, এই নাও, এক লাখ আছে।' একটা প্যাকেট টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রুদ্র, 'আমাকে এখনই এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে, দেরি হয়ে গিয়েছে।' ঝুঁকে কুহেলির কপালে চুমু খেলেন রুদ্র সন্তর্পণে। তারপর 'বাই' বলে বেরিয়ে গেলেন।

অফিসে আসার পথে গল্পটা মনে এল। ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভীমের মতো শক্তিমানও লোহার ভীম তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই লোহার ভীমকেও আলিঙ্গন করার সময় চূর্ণ করেছিলেন। রুদ্র রায় তাঁকে ওইভাবে আলিঙ্গন করবে জানলে—। এখনও শরীরে ব্যথা কিন্তু হঠাৎ চিন্তাটা চলকে উঠল। নিজের অজান্তে রুদ্র কি তাঁর আসল চেহারা প্রকাশ করে ফেলল? মেয়েদের আদর করার সময় দুমড়ে মুচড়ে যন্ত্রণা দিয়ে ও কি আনন্দ পায়? সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে শিবানীর মুখ এবং উর্ধ্বাঙ্গের কালসিটে, ক্ষতগুলো ভেসে উঠল। আজ যদি সময় থাকত এবং কুহেলি যদি ইচ্ছুক হতেন তাহলে তাঁর চেহারাও কি শিবানীর মতো হয়ে যেত? শিউরে উঠলেন কুহেলি।

তারপরেই মনে হল, ভুল করছেন। নিশ্চয়ই ভুল। সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সময় থেকে কয়েকবার রুদ্র এবং তিনি শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। কখনও রুদ্র সৌজন্য বা ভদ্রতাবোধ হারাননি। বরং মাঝে মাঝে ওঁকে একটু বেশি স্তিমিত বলে মনে হয়েছে। যন্ত্রণা দিয়ে, শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে যে আনন্দিত হয় সে কিভাবে ওইরকম শিষ্ট থাকবে? থাকতে পারে না। তার আসল চেহারা প্রকাশ পেতই। আজ নিশ্চয়ই আবেগের বাহুল্যে রুদ্র তাঁকে বেশি জোরে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ওর মতো শক্ত সবল পেশীবহুল পুরুষ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে তিনি সহ্য করবেন কি করে! তার জন্যে তো রুদ্র বেশ কয়েকবার ক্ষমা চেয়েছে। এভাবে ভাবার পর মন বেশ হালকা হয়ে গেল কুহেলির।

বেলা দেড়টায় ফোন এল পাখির। অফিসের নাম্বারটা নিজে থেকেই ওকে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে। পাখি জিজ্ঞাসা করল, 'মা, রুদ্র আঙ্কলের সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'ও হ্যাঁ। খুব ভাল করেছিস ফোন করে। টাকাটা কোথায় জমা দেব?'

'টাকা রেডি আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো স্টুডিও থেকে বেরুতে পারব না। তুমি প্রোমোটারের অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিতে পারবে?' পাখি জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তো ওদের চিনি না। তাছাড়া নিশ্চয়ই কাগজপত্র তৈরি করতে হবে ওদের।'

'ঠিক আছে, আমি কথা বলছি। ওদের বলি রাত আটটা নাগাদ বাড়িতে আসতে। তখন তুমি থেকো।' পাখি টেলিফোন ছেড়ে দিল।

একটু অন্যমনস্ক হলেন কুহেলি। পাখি যেন বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর বাবার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরেও মাস তিনেক নিশ্চয়ই থাকা যাবে। উনি চেষ্টা করবেন আরও বেশি সময় নিতে। বড় ছেলে ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলে দাম ঠিক করে ফেলেছে। তারা কর্পোরেশনে খোঁজখবর নিচ্ছে। সেখানে গোলমাল না পেলে প্রত্যেকের নামে আলাদা দলিল তৈরি হবে। এসব শেষ হতে আরও একমাস লেগে যাবে। যাতে আরও তাড়াতাড়ি হয় তা দেখার জন্যে রয়েছে বড় মেজ সেজ। কুহেলি ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না।

বিকেলে কৃষ্ণান এল ঘরে, 'তিনদিন নতুন অ্যাকাউন্ট আমরা খুলব না।'

'কেন?'

'অলরেডি টার্গেটের অনেক বেশি কালেকশন হয়ে গেছে। এ সপ্তাহে কিছু ঝামেলা হওয়ায় কলকাতায় কোনও জাহাজ ঢুকছে না। সামনের সপ্তাহ পর্যন্ত প্রচুর টাকা ব্লক হয়ে থাকবে। তাই নতুন পার্টিদের কাছে টাকা নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।' কথা বলার সময় কৃষ্ণানকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল কুহেলির। যদি এক সপ্তাহের বদলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্দর বন্ধ থাকে, কেউ যদি তাঁদের কাছে ধার না চায় তাহলে মাসের এক তারিখে সুদ দেওয়া হবে কি করে?

ভয়ের কথাটা কৃষ্ণানকে বললেন তিনি। কৃষ্ণান হাত নেড়ে এড়িয়ে দিল সেকথা। 'আমাদের রিজার্ভ ফান্ড যা আছে তাতে কয়েকমাস ধরে দিতে পারব। কন্ডিশন খুব খারাপ হলে জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

'কিন্তু কেন নতুন অ্যাকাউন্ট নেওয়া হচ্ছে না তার কি উত্তর দেব?'

'টেকনিক্যাল প্রব্লেম। ব্যাস।'

'লোকে আবার ভুল না বোঝে!'

'সেরকম হলে যাদের মনে সন্দেহ ঢুকবে তারা টাকা ফেরত নিয়ে যাবে। আমরা কাউকেই ঠকাতে ব্যবসা করতে আসিনি। কৃষ্ণান উঠলেন।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরেই সুজাতাকে ফোন করলেন কুহেলি। 'হ্যাঁ রে, অমিয় এখন পর্যন্ত কত টাকা আমাদের কোম্পানিতে রেখেছে জানিস?'

'না মা। আমাকে কিছু বলে না। তবে কাকে ফোনে বলছিল এই মাসে নাকি দশ হাজার টাকা রোজগার করছে।' সুজাতা হাসল, 'কেন জিজ্ঞাসা করছ?'

'এমনি। কোনও কারণ নেই।'

'মা, ভয়ের কিছু নেই। তেমন হলে আমিই জানিয়ে দেব। রাখছি।'

স্নান সেরে চায়ের কাপ নিয়ে বসতেই পাখি বাড়ি এল। সঙ্গে দুই ভদ্রলোক। তাঁরা প্ল্যান বের করে অনেক কিছু বোঝালেন।· পনেরো শো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটের দাম ওই জায়গায় ছয়লাখ টাকার কম হবে না, কুহেলির অনুরোধে ওরা এক লাখ কমিয়ে দিচ্ছেন। কুহেলি তাতেও সম্মতি না জানানোয় চার লাখ পঁচাত্তরের নিচে আর নামতে রাজি হলেন না।

এক লক্ষ টাকা নিয়ে ওঁরা দুটো রসিদ দিলেন।

রসিদ দেখে অবাক হলেন কুহেলি।

পাখি বলল, 'মা আপাতত আমরা পঞ্চাশ করে দিচ্ছি। একমাস পরে আরও দুই দিতে হবে। পাঁচ মাসেই ওরা ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার করবে। চুক্তিতে তাই লেখা আছে।'

কাগজপত্র সই করিয়ে এবং এক কপি কুহেলিকে দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। পাখি দোতলায় যাওয়ার আগে বলে গেল, 'তোমার কাছ থেকে আজ পঞ্চাশ ধার করলাম। এ বাড়ি বিক্রির টাকা পেলেই শোধ করে দেব।'

হঠাৎ নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হল কুহেলির। যে লোকদুটো এসে বাড়ির প্ল্যান দেখাল, টাকা নিয়ে রসিদ দিল তাদের তিনি জিজ্ঞাসাও করেননি ফ্ল্যাটটা দক্ষিণমুখো কিনা! যদিও একটা কাগজ ওরা দিয়ে গেছে কিন্তু সেটা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল না। পাখি বলেছিল তাঁকে অগ্রিম বাবদ এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু পঞ্চাশ দিলেই যে আপাতত কাজ মিটে যেত তা বলেনি। বললে তিনি রুদ্র রায়ের কাছে টাকা চাইতেন না। এই কয় মাসে যা মাইনে হিসেবে পেয়েছেন এবং যা সঞ্চয় আছে তাতেই টাকাটার ব্যবস্থা হয়ে যেত। ওইটুকুনি মেয়ে যে নিজের ফ্ল্যাটের অগ্রিমও তাঁর জোগাড় করা টাকায় দেবে বলে ভেবে রেখেছিল এটা তিনি অনুমানই করতে পারেননি। কুহেলি ঠিক করলেন রুদ্র রায় ফিরলে ওকে পঞ্চাশ হাজার ফেরত দিয়ে বলবেন অর্ধেক টাকায় কাজ হয়ে গিয়েছে। পাখি তো বলেছে বাড়ি বিক্রির টাকা পেলেই ফেরত দেবে। কিন্তু ও যদি আগে বলত তাহলে কি তিনি আপত্তি করতেন।

টেলিফোন বাজল। শিবানীর গলা, 'কেমন আছ?'

'আর কেমন আছি। হঠাৎ সমুদ্রে নেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'কেন?'

'চাকরি করছি না? এই বুড়ো বয়সে এত ধকল কি করে সহ্য করছি তা আমি জানি। কিন্তু তোমার খবর কি?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার আর খবর। সামনের রবিবার থেকে আবার বন্দীদশা শুরু হচ্ছে।'

'মানে?'

'জাহাজবাবু জল ছেড়ে স্থলে আসছেন।'

'ও তাই বল। বন্দীদশা কেন? আনন্দের সময় আসছে। কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?'

'দাগগুলো মিলিয়ে গেছে তো?'

শব্দ করে হাসল শিবানী, 'এতকাল থাকে নাকি! কবে মিলিয়ে গেছে। জানো, আবার ডাক এসেছিল, আমি রাজি হইনি। রবিবার আসছে, ঠিক ধরা পড়ে যেতাম। শোনো, যে জন্যে ফোন করছি, ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ও বলেছে টাকা যদি মার না যায় তাহলে দুলাখ টাকা তোমাদের কোম্পানিতে রাখতে পারে। আমি বলেছি মিস্টার রায় আছেন, তুমি আছ, মার যাওয়ার কোন চান্স নেই। কিন্তু একজন ভাল এজেন্ট চাই যে প্রতিমাসে টাকা দিয়ে যাবে।'

'এত টাকা রাখবে?'

'কেন? অসুবিধে আছে?'

'না, তা নয়। মাসে আট হাজার পাবে। আমি অমিয়কে বলে দিচ্ছি। অমিয় আমার জামাই, মনে আছে তো ওকে! ও যোগাযোগ করবে।'

'সোমবারের পর ফোন করতে বলবে।'

'শিবানী—!'

'বল!'

'ওরকম বীভৎস ব্যাপার যে করে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কি লাভ?'

'মাঝে মাঝে সেটা ভাবি। তবে যে ঝাল খেয়েছে একবার তার কি আর আলুনি ভাল লাগে? আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষ আমাকে ওর মতো জড়িয়ে ধরেনি।' হাসল শিবানী।

'মানে?'

'তুমি ভাবতে পারবে না, ও যখন জড়িয়ে ধরেছিল তখন আমার জ্ঞান ছিল না!'

'কেন?'

'উঃ। মনে হয়েছিল আমার বুকের, হাতের সব হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই আমাকে ছেড়ে দিল ও। তিনদিন ব্যথাটা ছিল। তবু বলছি, পুরুষ মানুষের শক্তির স্বাদ আমি প্রথম পেয়েছিলাম সেদিন, সম্বিত আসতে ও যা যা করেছিল তা মেনে নিতে একটুও আপত্তি করিনি, বরং ভাল লেগেছিল।'

'এসব বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

একটু থমকাল শিবানী, 'তোমার কাছে করছে না। সারাজীবন আলুসেদ্ধ মার্কা সম্পর্ক দেখে এলাম। এই প্রথম বুঝতে পারলাম মাছ মাংস ডিমের স্বাদ কি? এই যে আমার স্বামী দেবতাটি আসছেন, প্রতিদিন প্রবল উৎসাহে আমাকে

টানবেন আর আমি কিছু বোঝার আগেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন। ঘেন্না লাগে!'

বুকের ভেতর পৃথিবীর সমস্ত বাতাস যেন থম হয়ে আছে। কোনমতে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটি কে?'

'কোন্ লোকটি?' শিবানী হাসল।

'যার বীরত্বের কথা এতক্ষণ বলছিলে!'

'আবার এক প্রশ্ন করছ। ছাড়ো না।'

'না শিবানী, তোমাকে বলতেই হবে।' কুহেলি চেঁচিয়ে বললেন।

'এ আমার একান্ত গোপন ব্যাপার। বলা যাবে না। যাক গে, তুমি তোমার জামাইকে বলো ফোন করতে।' লাইনটা কেটে দিল শিবানী।

থ হয়ে বসে থাকলেন কুহেলি। মিনিট দশেক। মাথা কোনও কাজ করছে না। শেষপর্যন্ত উঠে মুখে জল দিলেন। তাঁর সন্দেহ কি সত্যি? শিবানী যেভাবে বর্ণনা দিলে তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তবে কি রুদ্র রায় ওকে ওই অভিজ্ঞতা দিয়েছে আর তাঁর সঙ্গে ভাণ করছে? একটা মানুষের দুটো চেহারার কথা তিনি জানেন কিন্তু বিছানাতেও দুরকম আচরণ করার কথা কখনও শোনেননি। হঠাৎ কেঁদে ফেললেন কুহেলি। যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তাতে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন?

ফোন বাজল। বাজতে বাজতে থেমে গেল। ধরতে ইচ্ছে করল না তাঁর। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, রুদ্রকে তিনি ভুল বুঝছেন না তো! সরাসরি ওকে প্রশ্ন করাও যায় না। রুদ্র তাঁর সঙ্গে বিছানায় একেবারে নেতানো মানুষ। সেই মানুষটার সঙ্গে শিবানীর বর্ণনা মেলে না। কিন্তু সেদিন আচমকা যখন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন ওর আচরণের সঙ্গে শিবানীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। দুটো মানুষের আচরণ কি এক হতে পারে না।

ফোন বাজল আবার। এবার রিসিভার তুললেন কুহেলি, 'হ্যালো।'

'কেমন আছ ডার্লিং? আমি তোমাকে খুব মিস করছি।' রুদ্র রায়ের গলা।

একটু চুপ করে থাকলেন কুহেলি। গলায় কি যেন আটকে যাচ্ছে।

'ডার্লিং! তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি। তুমি কবে আসবে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'একটু সমস্যা হয়েছে এখানে। যে কোনও দিন চলে যাব।

'এসো।'

'তুমি আজ এত ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছ! কি ব্যাপার?' রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'কোথায়? আমি ঠিক আছি।' ফোন রেখে দিলেন কুহেলি।'

কুড়ি

বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। সাতভাগে বিক্রির টাকা, সাদা কালোয় মেশানো, সাতজনকে দিয়ে দিল ক্রেতা যে ওখানে মাল্টিস্টোরিড বাড়ি বানাবে। বড় মেজ সেজ ছেলের মুখ দেখে মনে হল তারা তাদের প্রাপ্য-টাকা পাচ্ছে। অতিরিক্ত কিছু নয়। তাদের বাবা কত টাকা ব্যাঙ্কে বা পোস্টঅফিসে রেখে গিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন আবার তুলেছিল মেজ ছেলে। কিন্তু কুহেলি উত্তর দিতে চাননি। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'তোমাদের বাবা মারা যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত এ বাড়ির খরচ চালাতে একটা টাকাও যখন তোমরা কেউ দাওনি তখন টাকার হিসেব চাইবার কোনও অধিকার তোমাদের নেই।' বড় ছেলে উদাসীন গলায় মেজভাইকে বলেছিল ওসব নিয়ে কথা না বলতে। যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে।

ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কাজ ভাল চলছে। প্রতিদিন সেখানে মানুষের ভিড় বাড়ছে। এই কলকাতা এবং তার আশেপাশের মানুষেরা হঠাৎ আয় বাড়াবার রাস্তা খুঁজে পেয়ে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। প্রায় বছর খানেক স্বচ্ছন্দে চলছে বলে মানুষের মনে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ভয় ছিল তা প্রায় দূর হয়ে গিয়েছে। যে মানুষটি সারাজীবন চাকরি করে অবসর নেওয়ার পর যা অফিস থেকে পেয়েছিলেন তা এখানে জমা রাখার পর পরের মাসে ডিভিডেন্ড হিসেবে যা হাতে পাচ্ছেন তা তাঁর চাকরির শেষ পর্যায়ের মাইনের থেকে অনেক বেশি। এর মধ্যে সরকারি অর্থ দপ্তর থেকে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল, কি ভাবে এত চড়া হারে সুদ দেওয়া হচ্ছে? কৃষ্ণান সুদ শব্দটা মানতে রাজি হননি। কিন্তু ব্যালান্সশিট সামনে ফেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন বেশি লাভ না করে তাঁরা কিভাবে জনসাধারণের উপকার করতে চান। এ ব্যাপারে তখনও আইন অস্বচ্ছ থাকায় এবং কারচুপি খুঁজে না পাওয়ায় সরকার আর মুখ খোলেননি। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলো তীব্র আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছে।

নতুন ফ্ল্যাটের জন্যে বাড়ি বিক্রির টাকা পেয়ে দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট দিয়েছেন কুহেলি। কিন্তু পাখি পড়েছে সমস্যায়। সে হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। আরও টাকা এবং ভারতজোড়া নামের বাসনা পূর্ণ করতে হলে তাকে বোম্বাইতে গিয়ে থাকতে হবে। এরকম সুযোগ পেয়ে সে এতই পুলকিত যে কলকাতায় থাকার কথা আর চিন্তা করছে না। আর বোম্বাইতে যদি পাকাপাকি থাকতে হয় তাহলে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে সে কি করবে! প্রমোটার ঘনিষ্ঠ বলে তার নামে অগ্রিম দেওয়া টাকাটা সে মায়ের নামে ট্রান্সফার করিয়ে দিয়েছে। বাড়ি

প্রায় শেষ। আগামী মাসের এক তারিখে ফ্ল্যাটের অধিকার পাবেন কুহেলি। মাঝে মাঝেই এখনও কাজ-চলা সেই ফ্ল্যাটে যান কুহেলি। টুকিটাকি পরিবর্তন করা হচ্ছে তাঁর ইচ্ছে অনুসারে।

রুদ্র রায়কে টাকাটা ফেরত দিতে চেয়েছিলেন কুহেলি বাড়ি বিক্রির টাকার অংশ পেয়ে। কিন্তু রুদ্র রাজি হননি। উলটে অভিমান করেছিলেন। কুহেলিকে তিনি ভালবাসেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা বিবাহিত হবেন। তখন ওই ফ্ল্যাট তো তাঁদের দুজনের হবে। এক্ষত্রে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ভাবছে কি করে কুহেলি? কুহেলি এই মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারেন না। শিবানীর কথায় যে সন্দেহ মনে ছোবল মেরেছিল তা রুদ্রর ব্যবহারে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে। রুদ্র তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে মেশেন, কথা বলেন। এমন কি আদর করার সময়েও বোধ হারান না।

অমিয় এখন তার অফিসে খুব জনপ্রিয়। প্রতিমাসের এক তারিখের বিকেলে তার টেবিলের সামনে লাইন পড়ে। লাইন বেড়েই চলেছে। প্রত্যেকে গদগদ হয়ে টাকা গুনে নেয়। অমিয়র কল্যাণে যে তাদের সংসারের চেহারা খানিকটা ফিরেছে এটা বলতে সঙ্কোচ করছে না। বাড়িতেও অমিয় এখন যেন কিছুটা সম্ভ্রম পাচ্ছে সুজাতার কাছ থেকে। মায়ের দেওয়া সুযোগ যে এভাবে কাজে লাগাতে পারবে অমিয়, কল্পনা করেনি সুজাতা। শিবানী মাসির দুলক্ষ টাকা জমা পড়া মানে অমিয়র রোজগার প্রতিমাসে আরও দুহাজার বেড়ে যাওয়া। আর এরকম সময়ে অমিয় নিচু গলায় প্রস্তাবটা রাখল।

বয়স বাড়ছে, বিয়েও হয়ে গেছে অনেককাল, এখন অবস্থা ভাল হয়েছে, এখন ছেলে বা মেয়ে হলে মানুষ করে যাওয়ার সময় পাওয়া যাবে। অনেক ঘুরিয়ে, কিন্তু কিন্তু করে কথাগুলো বলেছিল অমিয়। সুজাতা হতভম্ব। এতসব কাণ্ডের পরেও অমিয় এই কথা বলতে পারে সে ভাবতেও পারছিল না। কিন্তু সেইপ্রসঙ্গে না গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'অসম্ভব, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। বাচ্চা হলে ছেলেদের তো কোনও অসুবিধে হয় না, যা ঝক্কি সব মেয়েদের পোয়াতে হয়। আমি পারব না।' অমিয় আর কথা বাড়ায়নি।

রাত্রে ফোন করেছিল সুজাতা। মেয়ের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন কুহেলি। তারপর বললেন, 'একটা ছেলে বা মেয়ে থাকা তো দরকার!'

'সেটা যদি বিয়ের দুবছরের মধ্যে হত, আপত্তি করতাম না।' সুজাতা বলেছিল, 'তখন ওর রোজগার এত কম যে দুজনেরই চলত না, বাচ্চার কথা ভাবতেই পারিনি। তখন থেকে অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। আড়াই বছর পরে বিছানা আলাদা হয়েছিল।'

'সেকি! এসব কথা আমাকে বলিসনি তো।'

'প্রেম করে তোমাদের অমতে বিয়ে করেছিলাম। কোন্ মুখে গিয়ে বলব যে আমাদের অশান্তি হচ্ছে। কিল খেয়ে হজম করেছি।' সুজাতার গলার স্বর করুণ।

'তা এখন তো আর্থিক অবস্থা আর আগের মতো নয়।'

'না। কিন্তু তুমি আমাদের ভাল করতে গিয়ে কতখানি খারাপ করেছ তা নিজেই জান না।'

'মানে?'

'আচ্ছা মা, মিস্টার পাকড়াশি আমাদের জন্যে এত করলেন, এঁদো গলি থেকে তুলে থিয়েটার রোডের বড় ফ্ল্যাটের মালিকানা দিলেন, তোমার কি ধারণা ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেবের মতো সংসারে থাকা সন্ন্যাসী ছিলেন! স্বামী থাকা সত্ত্বেও আর একজন পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এই কথাটা আমার পক্ষে কোনদিন ভুলে যাওয়া সম্ভব? সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে নিজেকে বিধবা বলে মনে হয়, অমিয় থাকা সত্ত্বেও। এখন ও চাইল আর আমি নাচতে নাচতে মা হতে রাজি হয়ে গেলাম, এ অসম্ভব!' একটানা কথাগুলো বলে গেল সুজাতা।

'মিস্টার পাকড়াশির ব্যাপারে অমিয়র কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না?' বহুদিন ধরে এই প্রশ্নটা মনে ছিল, উচ্চারণ করতে সৌজন্যে লাগত। আজ কথা ওঠায় জিজ্ঞাসা করে ফেললেন।

'আমি জানি না। একটা লোক সাহায্য করছে, যখন আসছে তখন এ বাড়ির জমিদারের মতো ব্যবহার করছে, তাঁর ইচ্ছেমত সংসার চলছে অথচ অমিয়কে দেখে মনে হত পেয়িং গেস্ট হয়ে আছে। সকালে উঠে অফিসে যাওয়ার জন্যে ছটফট করত। টিউশুনি করে যখন রাত্রে বাড়ি ফিরত তখন খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে যেন বেঁচে যেত। খুব মুশকিলে পড়ত ছুটির দিনে। সকালে একগাদা কাগজ নিয়ে ডুবে থাকত, দুপুরে খেয়ে বেরিয়ে যেত আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। লোকটা মারা যাওয়ার পরেও এই রুটিন বদলায়নি ও। তুমি ওকে কাজটা পাইয়ে দেওয়ার পর দেখলাম কথাবার্তা ব্যবহার চালচলনের পরিবর্তন হয়েছে। মাঝখানের সময়টাকে ও এখন পুরোপুরি মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।' ফোন রেখে দিল সুজাতা। শেষ সংলাপ বলার সময় ওর গলা ধরে এসেছিল।

শেষ পর্যন্ত নতুন ফ্ল্যাটের চাবি হাতে আসায় কুহেলি প্রমোটারকে জানিয়ে দিলেন তিনি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। পাখি ইতিমধ্যে একবার বোম্বে ঘুরে এসেছে শুদ্ধকে নিয়ে। এসে সে উচ্ছ্বসিত। তার মনে হয়েছে বোম্বের সিনেমা জগতের লোকজন অনেক বেশি প্রফেশনাল। একটি ছবিতে সে সই করেছে এবং আরও দু-তিনটির সঙ্গে কথা হয়েছে। অতএব পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিতে তার কোন

আপত্তি নেই। কলকাতায় থাকতে হলে সে মায়ের সঙ্গে থাকতে পারে। নতুন বাড়িতে যা নিয়ে যাওয়া যায় তাছাড়া বাকি আসবাবপত্র বিক্রি করে দেওয়া হল। কুহেলির একটুও কষ্ট হচ্ছিল না এই বাড়ি ছেড়ে যেতে। বরং মুক্তির আনন্দ পাচ্ছিলেন তিনি। এই বাড়ির সঙ্গে সংস্রব না থাকা মানে অতীতটাকে মুছে ফেলা। যে অতীতের কথা তিনি আর মনে রাখতে চান না।

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এলেন কুহেলি ছেলেমেয়েকে নিয়ে। প্রথম থেকেই পাখি এমন ভাব করছিল যেন সে এবাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে। ভাগ্যিস রুদ্র রায় একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিল ওবাড়ি থেকে জিনিসপত্র যেগুলো এসেছে তা প্যাক করে নিয়ে আসার। তারাই এ-বাড়িটাকে মোটামুটি সাজিয়ে দিয়ে গেল। বেশি খরচ হল বটে কিন্তু ঝামেলা পোয়াতে হল না। নইলে অফিস সামলে কুহেলিকে ওসব করতে হলে চোখে সরষের ফুল দেখতে হত।

ইদানিং রুদ্র রায় বেশির ভাগ সময় উত্তর বাংলায় থাকছে। তার ডিস্টিলারির কাজ বেশ চলছিল। হঠাৎ স্থানীয় মানুষরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। তাদের ধারণা ওখানে মদের কারখানা হলে অশান্তি হবে, ছেলেমেয়েরা প্রলোভিত হবে। ওদের প্রচারে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। রুদ্রর বক্তব্য, এতদিন ধরে ডিস্টিলারির কথা চলছে, অনুমতি পাওয়ার পর কাজ শুরু হল, সবাই জেনেও চুপ করে রইল। এখন কাজ প্রায় শেষ, উৎপাদন শুরু হওয়ার মুখে সবাই গেল গেল করে ডেকে উঠল। তাছাড়া রুদ্র রায় তো ভাটিখানা বা বাংলা মদের কারখানা তৈরি করছে না। ওখানে পুরো স্কচ হুইস্কির ফর্মুলায় যা তৈরি হবে তা কোনভাবেই দূষণ ছড়াবে না। রুদ্রর ধারণা হল, স্থানীয় লোকগুলোর পেছনে বড় রাজনৈতিক দলের মদত আছে।

অফিসের কাজ শেষ করে উঠব উঠব করছিলেন কুহেলি, সন্ধে সাতটা বাজে। আজ রাত নটার ফ্লাইটে পাখি বোম্বে যাবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরলে দেখা হবে। এইসময় রুদ্র রায় তাঁর ঘরে ঢুকল।

অবাক হলেন কুহেলি, 'তুমি? এই সময়ে?'

'আর কি বলব। ফ্লাইট দুঘণ্টা দেরিতে এল। আর একটু দেরি হলে আজ রাত্রে শিলিগুড়িতেই থাকতে হত। বাগডোগরায় সন্ধে নামলে প্লেন ছাড়ে না।' রুদ্র রায় চেয়ার টেনে বসল।

'চা খাবে?'

'নো। সন্ধের পর চা?'

'বুঝলাম। ডিস্টিলারির সমস্যা মিটল?'

'না। নোবডি ইজ কো-অপারেটিং। আভাসে বুঝতে পারছি অনেক টাকা ছাড়তে হবে। কিন্তু সেটা যে কত তা কেউ স্পষ্ট করে বলছে না। বাড়ি যাবে?'

'হ্যাঁ। আজ পাখি বোম্বে যাচ্ছে, সাড়ে সাতটায় বেরুবে বলছিল।'

ঘড়ি দেখল রুদ্র রায়, 'দেরি নেই, উঠে পড়।'

লিফটে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের সামনে যেতেই কুহেলি দেখলেন দরজা খোলা। শুদ্ধ দুটো স্যুটকেস দুহাতে নিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে। পাখি এগিয়ে এল, 'ও, তুমি এসে গেছ। আমি যাচ্ছি। কবে আসব ফোনে জানিয়ে দেব।'

'তুই বোম্বেতে গিয়ে কোথায় উঠছিস, ফোন নাম্বার কি?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কিছুই জানি না। ওরা ঠিক করে রেখেছে। গিয়ে জানতে পারব।' তারপর রুদ্র রায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল পাখি, 'আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম।'

'হ্যাঁ। একটু বেশি সময় নর্থ বেঙ্গলে থাকতে হচ্ছে।'

'এই ফ্ল্যাটে পাকাপাকিভাবে কবে আসছেন?' পাখি তাকাল।

রুদ্র রায় অবাক হয়ে কুহেলিকে দেখলেন। কুহেলি বললেন, 'আয়, তোদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট অনেকদূরে।'

পাখি যাওয়ার আগে বলে গেল, 'জলদি জলদি চলে আসুন। বাই। বাই মা।' ওদের নিয়ে লিফট নেমে গেল।

কুহেলি দ্রুত ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলেন। পাখি যে তাঁর সামনে রুদ্রকে ওই কথা বলতে পারে তাঁর কল্পনায় ছিল না। ও নিজেকে ভাবছেটা কি? খুব বড় হয়ে গিয়েছে? রুদ্র কি ভাবল? মেয়ে মায়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে? অথচ একসময় তার আশংকা ছিল ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ওরা কি ভাববে তাঁকে? এখন কি সহজে পরিস্থিতিটা বদলে গেছে।

রুদ্র রায় ঘরে এল, 'সত্যি কথা। এই ফ্ল্যাটে তোমার একা থাকা ঠিক নয়।'

'আমি তো একাই।' মুখ নিচু করে বললেন কুহেলি।

সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুহাতে কুহেলির মুখ ধরল রুদ্র, 'এখনও একা?'

'ভরসা হয় না।'

'কি করলে সেটা হবে?'

'জানি না।'

মুখ ওপরে তুলে আলতো চুমু খেল রুদ্র। কুহেলির চোখ বন্ধ।

'আই লাভ ইউ।' ফিসফিস করে বলল রুদ্র।

'ঠিক?'

'ঠিক।'

আর পারলেন না কুহেলি, দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রুদ্রকে। রুদ্রর হাতের মাসল শক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু খুব দ্রুত হাত দুটো কুহেলির স্পর্শ এড়াল। এবার

কুহেলি যতটা গৃহীত হতে চান ঠিক ততটাই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে রুদ্র রায়।

থমকে গিয়ে মুখ তোলেন কুহেলি, 'কি হয়েছে তোমার?'

'তেমন কিছু না। যা চাপ যাচ্ছে, শরীরটা ঠিক জুতে নেই।'

'কিরকম লাগছে!'

'তেমন কিছু না। বিশ্রাম পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার বলছে, প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। ওদিকে যা অবস্থা তাতে না বাড়ার তো কোনও কারণ নেই।'

'তুমি কদিন বাড়ির বাইরে যাবে না। একেবারে বেড-রেস্ট।'

হাসল রুদ্র, 'হ্যাঁ। কদিন বিশ্রাম নিতে হবে। তবে তার আগে কাল আর একবার নর্থবেঙ্গলে যেতে হবে। ব্যাপারটা কোর্টে নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

অনেকদিন বাদে আজ রান্না করলেন কুহেলি। সামান্য দুটো পদ। কাজের লোকটাকে ছুটি দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে কি ভালই না লাগছিল তাঁর। রুদ্র রায় শুয়ে আছে তাঁর খাটে। এই ফ্ল্যাটে তাঁরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। হঠাৎ যেন নিজস্ব সংসারের আবহাওয়া পেয়ে গেছেন কুহেলি। মাঝে একবার গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি, ডাক্তার ডাকব?'

'না না। ঠিক আছি!' হাসল রুদ্র।

'আজ ড্রিঙ্ক করবে না?'

'না। ভাল লাগছে না।'

খুব ভাল লেগেছিল কুহেলির। মদ ছাড়া কোন রাত্রে রুদ্রকে দ্যাখেননি তিনি। আজ দেখবেন।

রাতের খাবার তৈরি করে খেতে ডেকেছিলেন রুদ্রকে। চুপচাপ এসে খেতে বসে গেল রুদ্র। খেতে খেতে বলল, 'আজ অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে।'

'কি রকম?' খাওয়া শুরু করলেন কুহেলি।

'এতকাল তো হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসেছি। আজ মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে খাচ্ছি।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি। এই তরকারিটা আর একটু নেব। দারুণ হয়েছে।'

'দূর! কতদিন পরে রাঁধলাম। নিজের জন্যে রাঁধতে ইচ্ছে করে না।' তরকারি তুলে দিলেন কুহেলি রুদ্রর প্লেটে।

'ফিরে এসে বিয়ের নোটিশটা দেব। ঠিক আছে?'

'হু।' কুহেলি আবিষ্কার করলেন তার লোমকূপগুলো হঠাৎ পুলকিত হল।

'তুমি খুব ভাল, কুহেলি।'

'তুমি খারাপ?'

'হয়তো ছিলাম। তুমি এসে আমায় ভাল করে দিলে।'

সারারাত শিশুর মতো ঘুমালেন রুদ্র। লোকটা যে খুব ক্লান্ত তা বুঝতে অসুবিধে হল না কুহেলির। পাশে শুয়ে তিনি অনেকরাত পর্যন্ত ঘুমন্ত রুদ্রকে দেখে গেলেন। তাঁর যে নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে তা এই লোকটাকে ঘিরে। এই বয়সে বাঙালি মেয়েরা বিয়ে করে না! যাঁর সাত-সাতটা বড় বড় ছেলেমেয়ে তাঁর তো এই বয়সে শীর্ণ শরীর নিয়ে অম্বলে ভোগার কথা। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁর ক্ষেত্রে অন্য বিধান দেন তাহলে তিনি কি করবেন। পঞ্চাশ হাতছানি দিচ্ছে কিন্তু এখনও তিনি যুবতী। তাঁর বয়সী মহিলারা যখন ঈশ্বরচিন্তা করার কথা ভাবছে তখন তিনি নতুন সংসার শুরু করার আনন্দে মৌত হয়ে থাকতে পছন্দ করছেন। কে যেন বলেছিল, পঁয়ষট্টি পেরিয়েও রবীন্দ্রনাথের মনের রোমান্টিজম একটুও কমেনি। অথচ বাঙালি পঁয়ষট্টিতে বৃদ্ধ হয়ে যায়।

সকালে রুদ্র একটু চাঙ্গা। ব্রেকফাস্টের পর কাগজপত্র নিয়ে বসল। কুহেলির তখন অফিস যাওয়ার তাড়া। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরুলে রুদ্র অবাক হয়ে তাকাল, 'তুমি সত্যি অনিন্দ্যসুন্দরী উর্বশী।'

'ধ্যেৎ।'

'আমাকে একটা চুমু খাও।'

'না। একদম দুষ্টুমি নয়।'

'প্লীজ।'

কুহেলি এগিয়ে গিয়ে আলতো চুমু খেলেন রুদ্রর গালে।

রুদ্র বললেন, 'এবার এই কাগজগুলোতে সই করে দাও।'

'কি এগুলো?'

'পড়ে দ্যাখো।'

'ও বাব্বা। পাতার পর পাতা পড়ার সময় আমার নেই।'

'ওই ডিস্টিলারির দুজন পার্টনার। একজন রুদ্র রায় আর অন্যজন কুহেলি সেন।'

'ওমা। আমাকে কখনও বলনি তো!'

'ভেবেছিলাম ওপেনিং-এর দিন সারপ্রাইজ দেব। এর আগে ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কাগজের সঙ্গে পার্টনারশিপ-ডিডে তুমি সই করেছিলে।'

'তুমি দেখছি ডেঞ্জারাস লোক। না বলে সই করিয়েছ।' কপট রাগ দেখালেন কুহেলি।

হাসল রুদ্র, তারপর কলম এগিয়ে দিল। সই করলেন কুহেলি।

একুশ

দিন সাতেকের মধ্যে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রুদ্র রায় নর্থ বেঙ্গলে চলে গেল। পাখি এবং শুদ্ধ বোম্বাইতে। ওখানে একটা গেস্ট হাউসে ওদের রেখেছে ছবির প্রযোজক। এই ফ্ল্যাটে এখন কুহেলি একা। সারাদিন অফিসে এত কাজের চাপ যে খাওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না। সন্ধের পর ফ্ল্যাটে এসে অদ্ভুত একাকীত্ব। রুদ্রর ফিরে আসার দিন গোনেন কুহেলি। তৃতীয় রাতে শিবানীকে ফোন করলেন। কথা বললে মনে হবে কেউ আছে। শিবানীর শাশুড়ি ফোন ধরলেন, 'ও তুমি। শিবানীকে খুঁজছ?'

'হ্যাঁ।'

'সে এখন স্বামী সোহাগিনী হয়েছে। পেটের ছেলে মাকে ভুলে বউকে নিয়ে মেতেছে। ছয়মাসের জন্যে জাহাজে নিয়ে গেছে বউকে। মা কিভাবে বেঁচে থাকবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। টাকা দিয়েই খালাস।' বুড়ি মনের জ্বালা ব্যক্ত করলেন।

'শিবানী ছয়মাসের জন্যে জাহাজে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তোমার জামাই তো জানে। প্রতিমাসে ওর টাকার সুদ ব্যাঙ্কে জমা করে সে।'

'আচ্ছা?'

'অ্যাদ্দিন ও জলে থাকতে পারবে?'

'বেশ পারবে। দিনরাত মদ গিলবে।'

রিসিভার রেখে দিলেন কুহেলি। অমিয় তাঁকে ব্যাপারটা জানাল না কেন? কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করল না কৈফিয়ত চাইতে। তারপরেই মনে হল, কৈফিয়ত চাইবার তো কোন কারণ নেই। অমিয়র ব্যবসা-সম্পর্কিত ব্যাপার তাঁকে জানাতে হবেই এমন কোনও চুক্তি নেই।

পরদিন দুপুরে মিস্টার কৃষ্ণান কুহেলির ঘরে এল। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। বললেন, 'কাল থেকে চেষ্টা করছি রায়কে টেলিফোনে ধরতে, লাইন পাচ্ছি না।'

'কেন?' কুহেলি তাকালেন।

'মাসের চব্বিশ তারিখের পর কাউকে ধার দিতে চাই না আমি, রায়ের রিকোয়েস্টে দিতে হয়েছে। কিন্তু কালকের মধ্যে ওরা ক্যাপিট্যাল উইদ ইন্টারেস্ট ফেরত দেবে বলে চুক্তি ছিল। আজ ফাইন্যালি জানিয়েছে আরও তিনদিন সময়

লাগবে। অর্থাৎ দু তারিখের আগে ওদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছি না। এই অবস্থায় এক তারিখে সবাইকে ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হবে না।'

'সেকি?' চমকে উঠলেন কুহেলি।

'আমার কথা শুনলে এটা হত না।'

'কত টাকা লোন দিয়েছেন ওই পার্টিকে?'

'রায়ের কথায় পাঁচ কোটি দিতে হয়েছে।'

'তাহলে কি হবে?'

'সেইজন্যে রায়কে চাইছি। আমি গতকালই আশংকা করেছিলাম এটা হতে পারে। তাই গতকাল থেকে রায়কে খুঁজছি। একমাত্র ও-ই পারে পার্টিকে বলে অন্তত এক কোটি ফেরত নিয়ে আসতে।' কৃষ্ণান বলল।

'রায় পারেন?'

'হ্যাঁ। এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'আপনি বলুন। আমি কাউকে বলব না।'

'ম্যাডাম, রায় জানলে প্রব্লেম হবে।'

'জানবে না। কথা দিচ্ছি।'

'ওই ইম্পোর্ট কোম্পানিতে বেনামে রায়ের মেজর শেয়ার আছে।'

'ও।'

'যদি রায় আপনাকে ফোন করে তাহলে বলবেন আমাকে ফোন করতে। বুঝতেই পারছেন।'

'নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু যদি ওর সঙ্গে যোগাযোগ না হয়?'

'আমি চীফ অ্যাকাউনটেন্টকে বলেছি একটা লিস্ট করতে। এক তারিখে কিছু লোককে টাকা দেব, বাকিটা চার তারিখে। চিৎকার চেঁচামেচি হবে। আজই অফিসের নোটিশবোর্ডে জানিয়ে দেব, একদিনে সবাইকে টাকা দিতে এত প্রেসার পড়ছে যে এখন থেকে দুদিনে পেমেন্ট করা হবে। দুই তিন শনি রবিবার। লোকে মেনেও নিতে পারে। হ্যাঁ, আপনার জামাই-এর পেমেন্টগুলো এক তারিখেই থাকবে।' কৃষ্ণান বলে গেল।

হঠাৎ কেমন শীত করতে লাগল কুহেলির। রুদ্র রায় বেনামে ব্যবসা করছে এবং সেই ব্যবসার জন্যে এই কোম্পানি থেকে টাকা ধার করেছে কৃষ্ণানের মতের বিরুদ্ধে, এসব তিনি জানতেন না। রুদ্র রায়ও বলেনি। এরকম না-বলা কত কথা আছে যা তিনি জানেন না? সত্যি তো, মানুষটার অতীত তাঁর কাছে অন্ধকারে। বর্তমানের যেটুকু জানা তা ওর মুখ থেকে। তাঁদের সম্পর্ক যে ভাবে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তাতে পরে আফসোসে পড়তে হবে না তো!

রাত্রে সুজাতাকে ফোন করলেন কুহেলি, 'অমিয় আছে? ওকে দে?'

'কেন?'

'ওকেই বলছি, ওর কাছ থেকে শুনে নিস।'

অমিয়র গলা কানে এল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'অমিয়, এ মাসে সবাই এক তারিখে ডিভিডেন্ড পাচ্ছে না। তোমাকে দেওয়া হবে।'

'কেন? সবাই পাচ্ছে না কেন?'

'একদিনে অত লোককে আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

'ও। তা ঠিক।'

'কিন্তু আমার মনে হয় তুমি কালই নোটিশ দাও যাতে একমাসের মাথায় তোমার ক্লায়েন্টদের দেওয়া টাকা ফেরত পেতে পারো।'

'সেকি!' চমকে উঠল অমিয়, 'কি বলছেন আপনি?'

'যা বললাম তা তো শুনলে।'

'কেন? কোন বিপদ হবে বলে খবর পেয়েছেন?'

'না না। কোন খবর পাইনি। আমার মনে হচ্ছে ফেরত নিয়ে নেওয়া উচিত।'

'কিন্তু ফেরত নিলে সবাই খুব অসুবিধেতে পড়বে।'

'কেন?'

'এই ডিভিডেন্ডের ওপর নির্ভর করে সবাই নানারকম প্ল্যান করে চলছে। ডিভিডেন্ড বন্ধ হয়ে গেলে বিপদে পড়বে সবাই।' অমিয় বলল, 'আমারও আয় একদম কমে যাবে।'

'জানি।'

'আপনি কি ভেতরের কোনও গোলমালের আভাস পেয়েছেন?'

'না। সত্যি বলছি পাইনি। কিন্তু গোলমাল হলে আর সময় পাবে না। আচ্ছা রাখছি।' ফোন রেখে দিলেন কুহেলি।

মিনিট দশেক বাদে সুজাতা ফোন করল, 'সব শুনলাম। আমি আমার টাকাটা তুলে নিতে চাই। এই কয়মাসে অনেক পেয়েছি, আর দরকার নেই।'

'কালই অ্যাপ্লিকেশনটা অমিয়কে দিয়ে পাঠিয়ে দিস।'

'ও নিতে চাইছে না। বলছে আমি তুলছি জানলে অন্য ক্লায়েন্টরা ওকে উপহাস করবে। তাই আমি নিজেই অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যাব।'

'তুই অমিয়র সঙ্গে একমত হচ্ছিস না কেন?'

'মা, আমি তোমাকে চিনি।'

হাসল কুহেলি, 'তাহলে কাল এগারোটায় আসিস।'

ঠিক এগারোটা কুড়ি মিনিটে চীফ অ্যাকাউন্টটেন্টের ফোন এল, 'ম্যাডাম, আপনার মেয়ে সুজাতা দেবী এসেছেন। তিনি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন ডিপোজিট উইড্রয়ালের জন্যে।'

'কত টাকা?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'দু লাখ।'

'এ ব্যাপারে আমাদের আইন কি বলছে?'

'একমাস আগে নোটিশ দেওয়ার নিয়ম। উনি সেটাই বলছেন।'

'তাহলে অসুবিধে কোথায় হচ্ছে?'

'না, আমি বলছি, আপনার মেয়ে যদি টাকা তুলে নেয় তাহলে পাবলিক তো নার্ভাস হয়ে যেতে পারে।' চীফ অ্যাকাউন্টটেন্ট বললেন।

'দেখুন, টাকাটা ওর, আমার নয়। অ্যাপ্লিকেশনে কোনও কারণ দেখিয়েছে?'

'হ্যাঁ। জমি কিনবেন, বাড়ি বানাবার জন্যে।'

'আপনি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য। আর কারেন্ট মাসের ডিভিডেন্ড যোগ করে চেকটা এক তারিখে দিয়ে দেবেন। আমি কৃষ্ণানের সঙ্গে কথা বলে নেব।'

মিনিট আষ্টেক পরে বেয়ারা এসে বলল, 'ম্যাডাম, সুজাতা দেবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

মাথা নাড়লেন কুহেলি, 'না। বল, আমি এখন খুব ব্যস্ত। অফিসে দেখা হবে না।'

সুজাতা খুব চটে যাবে। অপমানিত বোধ করবে। কিন্তু অফিসের চেম্বারে বসে ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে রাজি নন কুহেলি।

কৃষ্ণানের ফোন এল আধঘণ্টা পরে, 'কি ব্যাপার ম্যাডাম? আপনার মেয়ে টাকা তুলতে চেয়েছে। জমি কেনা ব্যাপারটা কি ঠিক?'

'মিথ্যে লিখবে কেন?'

'কিন্তু এক তারিখেই আপনি ডিপোজিট ফেরত দিতে বলেছেন, ওটা দিতে তো অসুবিধে আছে তা আপনি জানেন।' কৃষ্ণান বললেন।

'কেন? ইমার্জেন্সি চেকে একমাসের শর্ত ভাঙা হবে বলে কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু ডিভিডেন্ড দিতেই তো টাকা শেষ হয়ে যাবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না এত টানাটানি চলছে কেন? গত কয়েকমাসে তো প্রচুর প্রফিট করেছে কোম্পানি। যে কোন মুহূর্তে কোম্পানি দশ কোটি টাকা বের করতে পারে।'

'সব যদি আদায় হয়ে যেত তাহলে পারত। মিস্টার রায় ফিরে আসুন, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব। ও হ্যাঁ, রায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'না।'

'ওয়েল, আপনার মেয়েকে ডিপোজিট ফিরিয়ে দিতে অফিসকে বলছি।'

এক তারিখে যতটা ঝামেলার আশংকা করা হয়েছিল তার কিছুই হল না। মানুষ প্রথমদিকে ধৈর্য হারাতে চায় না। ঠিক আছে, এখন থেকে এক আর চার তারিখে ডিভিডেন্ড নিতে আসবে সবাই। তবে এমাসে যারা চার তারিখে নিচ্ছে তারা সামনের মাসে এক তারিখে নেবে। চীফ অ্যাকাউন্টটেন্ট দাবি মেনে নিতে সবাই খুশি।

অফিস ফেরত মেয়ের বাড়িতে গেলেন কুহেলি। বাইরের ঘরে তখন অমিয়র ক্লায়েন্টদের ভিড়। সবাই ডিভিডেন্ড নিচ্ছে। প্রত্যেকেই খুশি। কুহেলিকে দেখে সবাই নমস্কার জানাতে লাগলেন।

কুহেলি হাসলেন, 'এই কয়মাসে তো আপনারা ভাল ডিভিডেন্ড পেয়েছেন। ব্যাঙ্কে রাখলে এত টাকা সারা বছরে পেতেন না। এখন ডিপোজিট তুলে নিলে নাকি অসুবিধায় পড়বেন, অমিয় বলছিল। তাই কি?'

এক ভদ্রলোক বললেন, 'না না। কোম্পানি কখনও কথার খেলাপ করছে না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, আমাদের টাকায় কোম্পানি খুব ভাল ব্যবসা করছে। দুবছর যাক। টাকাটা প্রায় ডাবল হয়ে গেলে ডিপোজিট তুলে নেব।'

কুহেলি হাসলেন। ভেতরের ঘরে গিয়ে মেয়ের হাসি মুখ দেখলেন, 'দ্যাখো, ডিভিডেন্ড ক্যাশে দিয়েছে আর ডিপোজিট চেকে। তোমার জন্যে তাড়াতাড়ি পেলাম।'

'তুই আমার ওপর রাগ করিসনি?'

'করেছিলাম। এখন আর রাগ নেই।'

'কালই চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দে।'

'কিন্তু জানো মা, চেকের গায়ে অ্যাকাউন্ট পেয়ি কথাটা লেখা নেই।'

'সেকি! দেখি!'

কুহেলি দেখলেন। তাড়াহুড়োয় অ্যাকাউন্ট পেয়ি স্ট্যাম্পটা মারতে ভুলে গিয়েছে কেরানিটি। কৃষ্ণান এবং চীফ অ্যাকাউটেন্ট সেটা না দেখে সই করে দিয়েছেন।

'তাহলে এক কাজ কর। সকালে ব্যাঙ্ক খুললেই চেকটা কাউন্টারে জমা দিবি। এত টাকা ক্যাশ দিতে ওরা হয়তো আপত্তি করতে পারে, বলতে পারে আগে নোটিশ দিতে হয়, তুই ইনসিস্ট করবি।' কুহেলি বললেন।

'ঠিক আছে।' সুজাতা বলল।

বাইশ

শনিবার বলে অফিস ছুটি। বেলা সাড়ে এগারোটায় সুজাতা ফোন করল, 'মা, পুরো টাকা পেয়ে গেছি। ওরা অনেক আপত্তি করছিল, কিন্তু শেষে দিয়ে দিল। তবে মা, এই অ্যাকাউন্টে বেশি টাকা নেই। আমি নেওয়ার পর হাজার কুড়ি আছে।'

'একটা তো অ্যাকাউন্ট নয়। যাক, টাকা পেয়ে গেছিস যখন তখন এনিয়ে চিন্তা করিস না। তোর নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দে।'

'মাথা খারাপ। তুমি ভুলে গেছ, এটা ব্ল্যাক টাকা। এদিকে বারোটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ, লকার খোলা পাব না। সোমবার পর্যন্ত বাড়িতেই রাখতে হবে।' সুজাতা বলল।

সন্ধেবেলায় রুদ্র রায় ফিরল নর্থ বেঙ্গল থেকে। চেয়ারে বসে জল খেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'অফিসের খবর কি?'

'কৃষ্ণান তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছে।'

'কেন?'

'ডিভিডেন্ড দেওয়ার টাকা নেই।'

'হোয়াই?'

'জানি না। কিছু লোককে দেওয়া হয়েছে গতকাল। বাকিদের আগামী সোমবার আসতে বলা হয়েছে। তুমি যে কোম্পানিকে মাসের শেষে লোন দিতে সুপারিশ করেছিলে তারা ফেরত দেয়নি বলেই নাকি এই সমস্যা।'

'বুলশীট। আমাদের এই কয়েক মাসের প্রফিট কি কম? সব ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। কৃষ্ণানটা একটা হাড় কিপটে। কথা বলছি ওর সঙ্গে।' রুদ্র রায় বলল।

বাথরুম থেকে তাজা হয়ে বেরিয়ে রুদ্র রায় হুইস্কির বোতল খুলল, 'কি? একটু খাবে নাকি? কোম্পানি দাও প্লীজ।'

আপত্তি জানাতে গিয়েও পারলেন না কুহেলি। খাটের ওপর বসে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডিস্টিলারির খবর কি?'

'মামলা হচ্ছে। সব কাগজপত্র জমা দিয়ে এসেছি।'

'কোনভাবে ম্যানেজ করা গেল না?'

'ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল প্রায় কিন্তু হঠাৎ যে টাকা চেয়ে বসল তা দেওয়া সম্ভব নয়। ওরা ভাবতেই পারেনি একজন মহিলা মালিক কেস করতে পারে।'

'মহিলা মালিক?'

'তোমার কথা বলছি।'

'সে কি! আমি আবার মালিক হলাম কখন?'

'কাগজপত্রে তুমিই তো মালিক।'

'তুমি বেনামে?'

হাসল রুদ্র রায়, 'এখন তো আমাদের আলাদা ভাবা ঠিক নয়।'

'আচ্ছা, আর কি কি ব্যবসা তুমি বেনামে করছ বল তো?'

'তার মানে?' এবার একটু বেশি হুইস্কি গ্লাসে ঢালল রুদ্র রায়।

'আমার অনুমান তুমি আরও ব্যবসার অংশীদার, তবে বেনামে।'

'অনুমানের কারণ?'

'একটাই। হঠাৎ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির ব্যবসা কৃষ্ণানের ওপর ছেড়ে দিয়ে নর্থ বেঙ্গল নিয়ে পড়ে আছ। এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছ না। তার মানে অন্য জায়গায় তোমার নিশ্চয়ই বেশি ইন্টারেস্ট আছে।' কুহেলি বললেন।

এক হাত বাড়িয়ে কুহেলিকে কাছে টানল রুদ্র, 'তোমার সঙ্গে মনে হচ্ছে, কৃষ্ণানের বেশ ভাব হয়েছে।'

'মানে?'

'কৃষ্ণান কিছু বলেছে?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার ব্যাপারে?'

'আমাকে বলতে যাবে কেন?'

'ঠিক! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস না খাওয়াই ভাল।'

হাত ছাড়িয়ে কিচেনে যাওয়ার নাম করে উঠলেন কুহেলি। কৃষ্ণানকে কথা দিয়েছিলেন তাই ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও কথাটা বলতে পারলেন না তিনি। নিজের বেনামী কোম্পানিকে জোর করে ধার দিতে বলেছেন বলেই আজ ডিভিডেন্ড দিতে সঙ্কটে পড়তে হয়েছে কোম্পানিকে।

ঘরে ফিরে এসে দেখলেন আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে রুদ্র রায়। হাত কাঁপছে। মুখ লাল।

কুহেলি বললেন, 'আর খেয়ো না। তাহলে ডিনার করতে পারবে না।'

এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে রুদ্র বলল, 'বেশ। খাবো না। তুমি একটা চুমু খাও।'

'আশ্চর্য শর্ত তো!'

'ইয়েস। তুমি আমাকে মদের বদলে চুমু খাও। এফেক্ট উইল বি সেম।' দুহাত বাড়াল রুদ্র রায়। অগত্যা এগিয়ে গেলেন কুহেলি। আলতো চুমু খেলেন রুদ্রর ঠোঁটে। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র রায় তাঁকে জড়িয়ে ধরল। ধরামাত্র কুহেলির মনে হল তাঁর হাতের হাড় বুকের পাঁজর ভেঙে যাবে একটু চাপ পড়লে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন তিনি। চিৎকার করলেন কোনমতে, 'একি! ছাড়, ছাড় আমাকে।'

'না। ছাড়ব না। আজ আমি তোমাকে খাব। রোজ রোজ আলুনি, আজ ছাড়ছি না।' গলার স্বর জড়ানো, নিজের বুকে যেন পিষে ফেলতে চাইল কুহেলিকে।

কুহেলির স্বাস্থ্য ভাল, শরীরও লম্বা। কিন্তু ওই শক্তির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ঝিমঝিম করছে মাথা। হাত আলগা করে ব্লাউজের বোতাম খোলার চেষ্টা করে না পেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর কুহেলিকে বিছানায় নামিয়ে মুখ নিয়ে এল বুকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। ধারালো দাঁত তাঁর বুকে, কাঁধে বসছে। যেন হাঙর তার সব হিংস্র দাঁত দিয়ে দিয়েছে রুদ্র রায়কে। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড চড় খেলেন তিনি। আঘাতে মাথা ঘুরে গেল। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতেও বুঝতে পারলেন তাঁর শরীর দাঁত দিয়ে কাটা হচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এবং অচেতন কুহেলির শরীরের দিকে তাকিয়ে হাসল রুদ্র। শুধু ঊর্ধ্বাঙ্গ নয়, শরীরের মধ্যভাগ এবং নিতম্বেও এখন ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্ত চামড়ার ওপর স্পষ্ট। তার কিছুটা লেগে রয়েছে রুদ্র রায়ের ঠোঁটে। এতদিন সে কুহেলির সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, বেশ কয়েকবার সহবাসের নামে নির্লিপ্ত খেলা খেলেছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সুখ পায়নি। কিন্তু আজ সে একটু একটু করে সুখ পাচ্ছে। আর এই পদ্ধতি যে সব মেয়ের কাছে যন্ত্রণাদায়ক তা তো নয়। কোনও কোনও মেয়ে বলেছে, খুব কষ্ট হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত যে মহাসুখ হয় তা তাদের স্বামীরা দিতে পারেনি কখনও। কুহেলির স্বামী নেই। অতগুলো ছেলে-মেয়ের মা। আর কিছুদিন বাদেই প্রাকৃতিক নিয়মে ওর সুখী হওয়ার উপায় থাকবে না। ওকে সুখী করা আজ তার কর্তব্য। নিতম্বে দাঁত বসালো রুদ্র। এই বয়সের শরীরও যে এমন আবেদনময়ী হয় তা প্যারিসেও দ্যাখেনি রুদ্র। আবার মদ খেল সে। তারপর কুহেলির গোঙানি শুনতে পেল। আঃ কি আরাম। ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। দুজনের খেলায় একজন যদি নিঃসাড়ে পড়ে থাকে তাহলে খেলে আনন্দ হয় না। রুদ্র মদ গিলতে গিলতে বলল, 'কাম অন বেবি। লেটস প্লে।'

মুখ তুললেন কুহেলি। ঝাপসা দেখলেন রুদ্রকে। তাতেই তাঁর ঠোঁট নড়ল, 'তুমি তুমি শয়তান। উঃ, মাগো।'

'শয়তান একজন সৎ ব্যক্তি যার কখনও ভুল হয় না।' দুহাতের শক্তিতে কুহেলিকে উপুড় করে দিল রুদ্র রায়। আর তারপরেই বীভৎস চিৎকারে ঘরের দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল। অজ্ঞান হয়ে গেল কুহেলি।

রাত তখন দুটো। পোশাক পরে চেয়ারে বসে খাটে নিথর হয়ে পড়ে থাকা কুহেলিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ রুদ্র রায়ের মনে হল, মরে যায়নি তো! দ্রুত উঠে কানের পাশে আঙুল রেখে বুঝলেন, মরেনি। না। মরতে দেওয়া কিছুতেই চলবে

না। কুহেলির বেঁচে থাকা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বাড়িতে আসতে একটা বড়-সড় নার্সিংহোম কয়েকবার চোখে পড়েছে তার। নামটা মনে পড়তেই টেলিফোনের গাইড বই খুলল। নাম্বারটা পাওয়া যেতে ডায়াল করল। অনুরোধ করল এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিতে, খুব সিরিয়াস কেস। পনেরো মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। এই সময়ে রুদ্র চেষ্টা করেছে কুহেলির শরীর একটি নাইটিতে বন্দী করতে। কিন্তু শরীর সাড়া না দিলে সেটা করা যে কত কঠিন তা বুঝে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা বড় চাদরে ঢেকে রাখল কুহেলিকে। তারপর ব্রিফকেস খুলে ছটা একশ টাকার বান্ডিল পকেটে রেখে দিল।

স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সের লোক যখন কুহেলিকে নিয়ে নিচে নামল তখন রুদ্র রায় দরজা বন্ধ করে চাবি পকেটে ফেলে সঙ্গী হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নার্সিংহোমে পৌঁছে গেল অ্যাম্বুলেন্স। রুদ্র রায় যখন রিসেপশনে প্রাথমিক অফিসিয়াল কাজ শেষ করেছে তখন তার ডাক পড়ল। ডাক্তার বললেন, 'এটা পুলিশ কেস। পেশেন্ট আপনার কে হয়?'

'আত্মীয়।'

'কি ভাবে হল?'

'আমি জানি না। কেউ করেছে।'

'এখনই একটা অপারেশন করতে হবে। পেশেন্টের রেক্টাম ছিঁড়ে গেছে ভয়ঙ্করভাবে। প্রচুর রক্ত পড়েছে। যে ওর সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর সেক্স করেছে তার ফাঁসি হওয়া উচিত। আমি অপারেশন থিয়েটার রেডি করতে বলেছি।'

'ডক্টর!' রুদ্র রায় মৃদুস্বরে বললেন।

ডাক্তার তাকালেন। রুদ্র বললেন, 'পুলিশ মানেই প্রচার। আপনি তো জানেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ অপরাধীকে ধরতে পারে না কিন্তু—। কুহেলি মুখ দেখাতে পারবে না। ওর একটা স্ট্যাটাস আছে। দু-দুটো বড় কোম্পানির এম.ডি. ও।' পকেট থেকে তিনটে একশ টাকার বান্ডিল বের করে ডাক্তারের হাতে দিল রুদ্র, 'এটা আপনার জন্যে।'

'কিন্তু পুলিশ জানতে পারলে—।'

'পারবে না। অপারেশন করুন।'

'দেখুন। অপারেশন সাকসেসফুল না হলে আমি পুলিশকে জানাতে বাধ্য হব। আপনি রিসেপশনে কুড়ি হাজার জমা দিন অপারেশনের জন্যে।'

'সিওর।'

অ্যাপ্রনের পকেটে বান্ডিলগুলো রেখে ডাক্তার চলে গেলেন।

কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়ে রুদ্র রায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি একটা ফোন করতে পারি?'

লোকটি দূরে ঝুলিয়ে রাখা ফোন দেখিয়ে দিল।

'আমার কাছে কয়েন নেই।'

লোকটি কয়েন দিলে রুদ্র এগিয়ে গেল। স্মৃতিতে যে নাম্বার আছে তো যেন ভুল না হয়। দ্বিতীয়বার মনে করে ডায়াল করল রুদ্র। রিঙ হচ্ছে। রাত পৌনে তিনটেতে কেউ চট করে রিসিভার ধরে না। বেজে বেজে থেমে গেল রিঙ। কয়েন বেরিয়ে এলে আবার ওটা গর্তে ফেলে ডায়াল করল রুদ্র। এবার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো।' পুরুষকণ্ঠ।

'অমিয়বাবু?'

'হ্যাঁ। ইয়েস!'

'আমি রুদ্র রায়।'

'অ্যাঁ? ও। ওহো। বলুন স্যার।' গলার স্বর থেকে ঘুম উধাও।

'আপনি ব্লেসিং নার্সিং হোমে এখনই চলে আসুন।'

'কেন স্যার?'

'আপনার শাশুড়ি খুব অসুস্থ। অপারেশন হচ্ছে। তাই।'

ভোর হতে যখন সামান্য বাকি তখন অমিয় সুজাতাকে নিয়ে নার্সিংহোমের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। দ্রুত ভেতরে চলে এল ওরা। রুদ্র রায়কে দেখতে না পেয়ে তারা রিসেপশানে চলে এল। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, মিসেস কুহেলি সেন কি এখানে ভর্তি হয়েছেন?'

'আপনারা?'

'আমি ওর মেয়ে।'

'হ্যাঁ। একটু আগে ওঁর অপারেশন শেষ হয়েছে।'

'মিস্টার রুদ্র রায়—?'

'উনি তো একটা ফোন করে এখান থেকে চলে গিয়েছেন।'

'মা কেমন আছে? কি অপারেশন হয়েছে?'

'দাঁড়ান।' ইন্টারকমে কথা বলে নিয়ে রিসেপশনিস্ট বলল, 'সোজা চলে যান। বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা ঠেলে ভেতরে যাবেন। ডাক্তার ওখানে আছেন।'

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার রায় কখন আসবেন কিছু বলেছেন?'

'না। উনি কুড়ি হাজার টাকা অন অ্যাকাউন্ট ডিপোজিট করে গেছেন।'

ওরা দ্বিতীয় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কফি খাচ্ছেন।

'ডাক্তারবাবু!' সুজাতা বলল।

'হ্যাঁ। বসুন। আপনি ওঁর মেয়ে?'

'হ্যাঁ। ইনি আমার হাজব্যান্ড। কি হয়েছিল মায়ের?'

'শী ওয়াজ ব্রুটালি টর্চার্ড। সমস্ত শরীরে। আপনি ওঁর মেয়ে। আপনাকে ইন ডিটেলস বলতে আমার অসুবিধে হচ্ছে।' ডাক্তার বললেন।

'না, আপনি বলুন।' সুজাতার মুখ শক্ত।

একটু ইতস্তত করে ডাক্তার বললেন, 'ওঁর সমস্ত শরীর কেউ দাঁত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। এরকম যন্ত্রণা উনি কিভাবে সহ্য করেছেন জানি না। মোর ওভার লোকটা ওঁর রেক্টাম ইউজ করেছে আল্টিমেট প্লেজারের জন্যে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। লোকটা মারাত্মক স্যাডিস্ট। যাহোক, আমাকে অনেকটা সময় অপারেশনে দিতে হয়েছে। আশা করি দিন পনেরোর মধ্যে ওঁর রেক্টাম নর্মাল হয়ে যাবে।'

'লোকটা কে?' অমিয় জিজ্ঞাসা করল।

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার, 'আমি জানি না।'

'আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন?' সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

'জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যে ভদ্রলোক ওঁকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি রিকোয়েস্ট করলেন না জানতে। আপনার মা নাকি বড় দুটো কোম্পানির এম.ডি.। পুলিশকে জানালে খবরের কাগজে ছাপা হবে। উনি স্ক্যান্ডাল এড়াতে চাইছিলেন।' ডাক্তার বললেন।

'আশ্চর্য! এরকম একটা জঘন্য ক্রাইম করে একটা অপরাধী বেঁচে যাবে?' সুজাতা অমিয়র দিকে তাকাল।

অমিয় মুখ নিচু করল, 'তা ঠিক। তবে তোমার মায়ের কথা ভাবো। ওঁর সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে।'

'আমি তা মনে করি না। মা নিশ্চয়ই চাইবে অপরাধী ধরা পড়ুক।'

ডাক্তার বললেন, 'ঘটনাটা ঘটেছে অনেকক্ষণ ধরে। বিটুইন রাত দশটা এবং একটার মধ্যে। ওঁকে আনা হয়েছে ওঁর ফ্ল্যাট থেকে। তার মানে যে করেছে তাকে উনি চিনতেন তাই সে ফ্ল্যাটে ছিল। আর যিনি এনেছেন তাঁকে ওইসময় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি কি করে তিনি ব্যাপারটা জানতে পারলেন। ওঁকে আপনারা চেনেন?'

অমিয় মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। উনি ওঁর ব্যবসার পার্টনার। খুব ভদ্র মানুষ।'

'কোথায় থাকেন?'

'বিদেশে থাকতেন।' সুজাতা বলল, 'এমন হতে পারে মা কোনমতে ওকে ফোন করে জানিয়েছিলেন বলে উনি অত রাত্রে ওখানে গিয়েছিলেন।'

'সেটা সম্ভব ছিল কিনা জানি না।' ডাক্তার বললেন।

'তাহলে আমরা থানায় যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল সুজাতা।

'আমি বলি কি, তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে গেলে হয় না?'

ডাক্তার বললেন, 'আমি আশা করি সকাল আটটার মধ্যে ওঁর সেন্স এসে যাবে।'

সুজাতার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাধ্য হল যখন ডাক্তারও অমিয়র সঙ্গে একমত হলেন।

আটটার সময় নার্স ওদের কেবিনে নিয়ে গেল। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, রক্ত এবং স্যালাইন চলছে। নার্স কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার মেয়ে এসেছে।'

চোখ ঘুরল কুহেলির। ব্যাস, ওইটুকু।

'খুব কষ্ট হচ্ছে মা?' পাশে বসল সুজাতা।

চোখের পাতা বন্ধ হল।

'মা, আমি থানায় যেতে চাই। যে লোকটা এর জন্যে দায়ী তাকে শাস্তি পেতে হবে। তোমার আপত্তি আছে?' সুজাতা আবেদনের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল।

একটু স্থির হয়ে রইলেন কুহেলি। তারপর মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

কুড়ি মিনিট পরে থানায় পৌঁছে গেল ওরা। ইতিমধ্যে নার্সিংহোম থেকে ফোন করে ঘটনাটার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সব শোনার পর ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি কাউকে সন্দেহ করেন? অনুমান করতে পারছেন?'

'না।'

ডায়েরি লেখা হল। একটা কপি সুজাতাকে দিয়ে ওসি বললেন, 'মিসেস সেনকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। একমাত্র উনি বলতে পারেন কে কালপ্রিট। বিকেলের আগে উনি কথা বলতে পারবেন না। আপনারা চিন্তা করবেন না। উনি নিশ্চয়ই বলবেন কে কালপ্রিট। লোকটাকে ধরতে অসুবিধে হবে না।'

'মিস্টার রুদ্র রায় হয়তো জানতে পারেন।' সুজাতা বলল।

'কে রুদ্র রায়?'

'যিনি মাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন। ওখানে কুড়ি হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গিয়েছেন। মায়ের ব্যবসার পার্টনার।' সুজাতা বলল।

'কোথায় থাকেন উনি?' ওসি জিজ্ঞাসা করলেন।

সুজাতা তাকাল অমিয়র দিকে।

অমিয় মাথা নাড়ল, 'আমি ঠিক জানি না। দশটায় অফিস খুললে পাওয়া যাবে ওঁকে।'

ওসি অফিসের ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার নিলেন। নার্সিংহোমে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, রুদ্র রায় এলেই যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

উঠে আসার সময় অমিয়র খেয়াল হল। আজ শনিবার। অফিস বন্ধ। সেকথা জানাতে ওসি বললেন, 'আপনাদের এত পরিচিত, চেষ্টা করুন ভদ্রলোককে বের করতে। এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কালপ্রিট নন। হলে ভিক্টিম্‌কে নার্সিংহোমে ভর্তি করতেন না, কুড়ি হাজার টাকাও জমা দিতেন না। কিন্তু এখনই ওঁকে পেলে ভাল হত।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অমিয়র মনে পড়ল মিস্টার কৃষ্ণানের কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ি বা টেলিফোন নাম্বার তো জানা নেই।

সুজাতা বলল, 'পেয়েছি। শিবানী মাসির কাছে চল।'

'কেন?'

'রুদ্র রায় তো শিবানী মাসিরও বন্ধু ছিলেন।'

কিন্তু গিয়ে হতাশ হতে হল। শিবানীর শাশুড়ি জানালেন যে ছুটি কাটাতে এসে হঠাৎ একটা বড় অফার পাওয়ায় শিবানীর বর ফিরে গেছে জাহাজে। যাওয়ার সময় শিবানীকেও নিয়ে গেছে। রুদ্র রায়ের নাম ভদ্রমহিলা শোনেননি।

ওরা এল কুহেলির ফ্ল্যাটে। দরজা বন্ধ। কেয়ার টেকার বলল, 'ভোরবেলায় ওই বাবু ফিরে এসেছিলেন ফ্ল্যাটে। আধঘণ্টা পরে স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন তাকে চাবি দিয়ে। সে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলেছেন এয়ারপোর্টে যেতে।

চাবি নিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। বিছানায় রক্তের দাগ। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কোনও কাগজ পাওয়া গেল না যেখানে রুদ্র রায়ের ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'এয়ারপোর্ট চল।'

'কেন?' অমিয় অবাক।

'মায়ের এই অবস্থার জন্যে রুদ্র রায় দায়ী।'

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ। মা অন্য কোন লোককে এই ফ্ল্যাটে অত রাত্রে ঢুকতে দেবে না। একমাত্র রুদ্র রায়কে সেই অধিকার দিতে পারে। মা মনে মনে বিয়ের জন্যে তৈরি ছিল। লোকটা এইসব কাণ্ড করে হয়তো কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে। চল, দেরি করো না।'

ট্যাক্সি নিয়ে অর্ধেকটা পথ যাওয়ার পর সুজাতা বলল, 'আমরা কি বোকা!'

'কেন?'

'তখনই ফ্ল্যাট থেকে যদি ওসিকে জানাতাম তাহলে উনি এয়ারপোর্ট থানাকে জানিয়ে দিতেন রুদ্র রায়কে ধরার জন্যে। অনর্থক সময় নষ্ট হল।'

'কিন্তু সুজাতা, আর একবার ভাব। রুদ্র রায়ের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। রুদ্র রায়কে চাই। ও নিজে কিছু না করুক কিন্তু ওইসময় ও মায়ের ফ্ল্যাটে ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' সুজাতা বলল।

এয়ারপোর্টে এসে ওরা বুঝল এভাবে কাউকে খুঁজে বের করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। শেষপর্যন্ত এয়ারপোর্ট পুলিশের কাছে পৌঁছাল ওরা। অফিসার ইন চার্জকে ডায়েরির কপি দেখিয়ে সুজাতা বলল, 'যে ভদ্রলোক আমার মাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন তিনি আজ ভোরে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছেন বলে খবর পেয়েছি। আপনারা ওঁকে খুঁজে বের করুন, প্লীজ।'

অফিসার বললেন, 'আপনারা যেখানে ডায়েরি করেছেন সেখানেই কথাটা বললেন না কেন?'

'পরে জেনেছি।'

'কখন এসেছেন উনি?'

'ভোর বেলায়।'

'এখন দশটা বেজে গেছে। কোন্ ফ্লাইটে ওঁর যাওয়ার কথা?'

'আমরা কিছুই জানি না।'

'মুশকিল। একগাদা ডোমেস্টিক ফ্লাইট এর মধ্যে উড়ে গেছে। দুটো ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্লাইটও। অপেক্ষা করুন, দেখছি।'

আজ সকাল থেকে যতগুলো ফ্লাইট ছেড়েছে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এবং যতগুলো ওড়ার জন্যে তৈরি হয়েছে তাদের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখার পর অফিসার জানালেন মিস্টার রুদ্র রায় সকাল সাতটার ফ্লাইটে দুবাই চলে গিয়েছেন।

'সেকি!' অমিয় বিড়বিড় করল।

'চলে গেছে!' ভেঙে পড়ল সুজাতা।

'এতক্ষণে বোধহয় দুবাইতে নেমেও পড়েছে প্লেন।' অফিসার বললেন।

'যদি না নামে?' সোজা হল সুজাতা, 'দুবাই এয়ারপোর্টে খবর পাঠিয়ে ওকে আটকানো যায় না? আমার আর কোনও সন্দেহ নেই, রুদ্র রায়ই ক্রিমিন্যাল।'

'আমার ক্ষমতা নেই খবর পাঠানোর। বড় কর্তাদের অনুমতি লাগবে। আপনারা আইজি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'ততক্ষণে তো—!' সুজাতা অসহায় চোখে তাকাল।

'আমি খুবই দুঃখিত। এটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে।' অফিসার বললেন।

তেইশ

আশা করা গিয়েছিল বিকেলে কুহেলির জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু তা হল না। উলটে রক্তচাপ বেড়ে গেল। ডাক্তাররা আশংকা করছিলেন খারাপ কিছু না হয়ে যায়। অপারেশনের ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, রবিবারের বিকেলে চোখ মেললেন কুহেলি। সুজাতাকে চিনতে পারলেন। পারা মাত্র তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে সুজাতা বলল, 'কেঁদো না মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নার্স চলে গেল পুলিশ অফিসারকে খবর দিতে। ভদ্রলোক এসে টুল টেনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

শ্বাস ফেললেন কুহেলি, কথা বললেন না।

'আপনার সঙ্গে কথা না বললে আমরা তদন্তে এগোতে পারছি না। যে লোকটি আপনার এই অবস্থা করেছে সে কি একা ছিল?'

কুহেলি ঘাড় নাড়লেন, একাই ছিল।

'লোকটিকে আপনি চেনেন?'

মাথা নাড়লেন কুহেলি।

'কি নাম?'

'রুদ্র রায়।'

'আপনি একা থাকেন ফ্ল্যাটে, ওকে ঢুকতে দিলেন কেন?'

উত্তরটা সুজাতা দিল, 'ওঁরা পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেন।'

'ও। তা হঠাৎ এরকম ভয়ঙ্কর অত্যাচার কেন করল লোকটা?'

'জানি না।'

'আপনার সঙ্গে ওর শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল?'

'ওঁরা বন্ধুর মতো ছিলেন। লোকটার ব্যবহার খুব ভদ্র ছিল। উনি মাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। মায়ের প্রথম দিকে সংকোচ ছিল, পরে রাজি হয়েছিলেন। আমরাও মেনে নিয়েছিলাম।'

'অদ্ভুত ব্যাপার!' অফিসার হাসল।

'কেন?'

'আপনি গড়গড় করে মেয়ে হয়ে মায়ের বিয়ের গল্প বলে যাচ্ছেন? ওঁর বয়সের মহিলারা কি এদেশে বিয়ে করে, যখন আপনার মতো এত বড় এবং বিবাহিতা মেয়ে আছে। আর কোনও মেয়ে কি সেটাকে সমর্থন করে? ব্যাপারটা অ্যাবনর্মাল না?'

'অফিসার, আপনার যেটা অস্বাভাবিক লাগছে সেটা যে সবার কাছে অস্বাভাবিক তা ভাবছেন কেন? আর কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করুন।'

'করে কি লাভ! আপনিই তো সব জবাব দিয়ে দিচ্ছেন।' অফিসার কুহেলির দিকে তাকালেন, 'এর আগে লোকটা কখনও আপনার সঙ্গে এরকম করেনি?'

মাথা নেড়ে 'না' বললেন কুহেলি।

'এবার কেন করল?'

'জানি না।' এবার শব্দটি উচ্চারণ করতেই নার্স বলল, 'অনেক হয়েছে। এবার ওঁকে ছেড়ে দিন আপনারা। এখনই ঘুমের ইঞ্জেকশন দিতে হবে।'

অফিসার বললেন, 'আপাতত এইটুকু। পরে আবার কথা বলতে আসব। আচ্ছা, রুদ্র রায়ের ঠিকানাটা কি? কোথায় থাকেন?' প্রশ্ন দুটো সুজাতাকে।

'আমি জানি না। তবে তিনি কাল সকালে ভারত ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কোথায়?'

'দুবাই।'

'তার মানে পাশপোর্ট ভিসা সব তৈরি ছিল!'

'উনি ফ্রেঞ্চ পাসপোর্টের অধিকারী। ফরাসি দেশে থাকতেন।'

'যাচ্চলে। এসব কথা আগে বলেননি কেন? এখন তো বিশ বাঁও জলে চলে গেল।' অফিসার হতাশ গলায় বললেন।

গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পর থেকে অমিয়র কথা বন্ধ হয়ে গেছে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকছে ও। সুজাতা কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেও কারণ জানতে পারেনি। আজ নার্সিংহোম থেকে ফিরে ওই অবস্থায় ওকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠল সুজাতা, 'দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকেও কেউ মায়ের অবস্থা করে দিয়েছে।'

ঝট করে উঠে বসল অমিয়, 'দেয়নি। দেবে। সামনের মাস থেকে।'

'মানে?'

'রুদ্র রায় পালিয়ে গেল। যদি কৃষ্ণান অফিস বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে ভাবতে পারছ? সামনের মাসের এক তারিখে সুদ না পেলে পাবলিক আমাকে ছিঁড়ে খাবে। ডিপোজিট ফেরত দিতে বলবে? তখন আমি কি করব? ওঃ।' প্রায় কেঁদে ফেলল অমিয়।

'তুমি একটু বেশি ভাবছ!' সুজাতা বলল।

'তুমি তো একথা বলবেই।' খেঁকিয়ে উঠল অমিয়, 'নিজের সব টাকা দিব্যি তুলে নিয়েছ। হঠাৎ এমন মাতৃভক্ত হয়ে গেলে যে তিনি বললেন আর টাকা তুলে নিলে।'

'মা তো তোমাকেও টাকা তুলে নিতে বলেছিল!'

'মিনমিন করে বলেছিলেন। ভেতরে ভেতরে যে ওঁর সঙ্গে রুদ্র রায়ের ঝামেলা চলছে তা একবারও বলেননি। তাছাড়া আমি টাকা ফেরত চাইলে তো একমাস সময় নিত। তোমাকে যেমন দিনে দিনে দিয়েছে আমাকে তা দিত না।' চিৎকার করছিল অমিয়।

'মায়ের সঙ্গে রুদ্র রায়ের ঝামেলা চলছিল তা কে বলল তোমাকে?'

'আলবৎ চলছিল। সেটা চলছিল বলে রুদ্র রায় ওঁর ওপর ওই অত্যাচার করেছে।'

'তুমি অনুমান করছ।'

'আর কি কারণ থাকতে পারে! দ্যাখো সুজাতা, ভদ্রমহিলা তোমার মা বলে আমি মুখ খুলি না। নইলে—।' চুপ করে গেল অমিয়।

'খোলো মুখ। শুনি কি বলতে চাও?'

'আচ্ছা, তোমার বা তোমার ভাইদের কারও ভাল লাগছিল? মা একটা অজানা লোকের সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রেম করছে, একসঙ্গে থাকছে, ঘুরছে, এতে খুশি হতে? ওই বয়সে বাঙালি মহিলারা নাতি-নাতনি, ঠাকুর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তোমার মা আরও যুবতী সাজার চেষ্টা করতেন। মানছি, চেহারাটা খুব ভাল ছিল। কিন্তু নিজের বয়স কত তা তো তিনি জানতেন! ছিঃ।' মুখ বিকৃত করল অমিয়।

ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। মাকে সমর্থন করে যা বলার বলে গেল সুজাতা। একজন ভদ্রমহিলা স্বামীর কাছে সম্মান পাননি, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেও নয়, তিনি যদি পরিণত বয়সে ভদ্র শিক্ষিত সঙ্গী পান তাহলে আপত্তি করার কিছু দেখছে না সে। এখন মায়ের পাশে কেউ নেই। যে যার মত জীবন শুরু করেছে। মা একা। এইসময় যদি মা জীবনসঙ্গী পেয়ে যায় তাহলে শেষসময়ে একাকীত্বে ভুগতে হবে না। অমিয়র যুক্তি, এটা বিদেশ নয়। এখানকার মেয়েরা শেষসময়ে একাকীত্বের কারণে সঙ্গী খোঁজে না, ঈশ্বরমুখী হয়। দীক্ষা নিয়ে ঠাকুর-দেবতার পুজো করতে পারতেন মহিলা। অতগুলো ছেলেমেয়ের মায়ের পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক কাজ।

রবিবার রাত্রে কুহেলির অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হল। রক্ত এবং স্যালাইনের নল খুলে ওঁকে কেবিনে দেওয়া হল। সুজাতা বসেছিল অনেকক্ষণ মায়ের পাশে। কোনও ভাইদের খবর দেয়নি সে। পাখিকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তার বোম্বের টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা তার জানা নেই।

ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তবু সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'পাখির টেলিফোন নাম্বার জানো? খবর দিইনি বলে ও রাগ করতে পারে।'

'থাক না। শুধু শুধু ভেবে মরবে। আমি তো কদিন বাদে ভাল হয়ে যাব।'

কুহেলি নিস্তেজ গলায় বললেন, 'হ্যাঁরে, রুদ্র কি এখন কলকাতায়?'

'নাঃ। নেই। কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় বলল সুজাতা।

'পালিয়ে গেছে?' চোখ বড় হয়ে উঠল কুহেলির। মাথাটা বালিশ ছেড়ে উঁচুতে উঠল দুহাতে ভর রেখে, 'কি বলছিস তুই? এখান থেকে চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। যা করেছে তাতে তো ওর ফাঁসি হওয়া উচিত। আমরা বুঝবার আগেই ও প্লেনে চেপে দুবাই চলে গিয়েছে। তার মানে দুবাইতে যাওয়ার ভিসা ওর আগেই করা ছিল।' বলতে বলতে কুহেলি আচমকা লক্ষ্য করল কুহেলির সমস্ত শরীর কাঁপছে। কথা থামিয়ে সে দুহাতে ওঁকে জড়িয়ে ধরে বালিশের ওপর মাথাটা নামিয়ে বলল, 'এমন করছ কেন? শান্ত হও মা—!'

'তুই বুঝতে পারছিস না কি সর্বনাশ হয়ে যাবে! এত মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা, ও না থাকলে কেউ ফেরত পাবে না। কত সংসার ভেঙে যাবে! ওঃ, মাগো। পুলিশকে বল, ওকে দুবাই থেকে ধরে আনুক। ওকে নিয়ে আসতেই হবে।' দ্রুত উত্তেজিত গলায় বলে গেলেন কুহেলি।

'তুমি শান্ত হও। পুলিশ জানে লোকটা দুবাই-তে গিয়েছে। তাছাড়া এখানে মিস্টার কৃষ্ণান আছেন, তুমি আছ। নিশ্চয়ই সবাই টাকা ফেরত পাবে।' সুজাতা কথা শেষ করা মাত্র নার্স এগিয়ে এল, 'উনি এত এক্সাইটেড হয়েছেন কেন? আর কথা বলবেন না। ম্যাডাম, আপনি শান্ত হোন। চুপ করে শুয়ে থাকুন।' বলতে বলতে একটা ইনজেকশন রেডি করছিল নার্স, ইশারায় সুজাতাকে বলল বেরিয়ে যেতে।

সকাল দশটার একটু আগে অফিস খুলেছিল কেয়ারটেকার। কর্মীরা এসে গেলেন। সেইসঙ্গে একটু একটু করে এজেন্টদের ভিড় জমতে শুরু করল। চীফ অ্যাকাউটেন্ট কাজ শুরু করতে পারছেন না কারণ লকার-রুমের চাবি থাকে মিস্টার কৃষ্ণানের কাছে। তিনি আসেননি।

কিন্তু কৃষ্ণান আসার আগেই হাওয়ায় খবর বয়ে আনল। আলোর বা শব্দের চেয়ে গুজবের এবং সেটা যদি খারাপ হয় তাহলে তার গতি অনেক বেশি। রুদ্র রায় দেশ ছেড়ে গিয়েছেন কুহেলি সেনকে বীভৎসভাবে রেপ করে, কুহেলি সেন নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, খবরটা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

অফিসে ঢোকামাত্র অমিয়কে ঘিরে ধরল সহকর্মীরা 'খবরটা সত্যি কিনা!'

অমিয় জানাল, হ্যাঁ, সত্যি। তবে তার জন্যে ওঁরা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এই মাসের ডিভিডেন্ড তো সবাই পেয়ে গেছেন। একমাস পরে আবার ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। তদ্দিনে মিসেস সেন সুস্থ হয়ে উঠবেন আর মিস্টার কৃষ্ণান তো আছেনই। একটু স্বস্তি পেল সবাই। কিন্তু জানিয়ে দিল আর ঝুঁকি নিতে চায় না

কেউ, আজই অমিয় নোটিশ দিয়ে দিক ডিপোজিট রাখা টাকা ফেরত পাওয়ার জন্যে। দরখাস্ত লেখা হল। প্রত্যেকে আলাদা সই করে অমিয়কে দিল। অমিয় সেগুলো নিয়ে ডালহৌসির অফিসে পৌঁছাল বেলা একটায়।

দূর থেকেই ভিড়, চিৎকার, আকাশে মুঠো ছোঁড়া এবং কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল অমিয়। অফিস ঘিরে রেখেছে পুলিশ। কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। রুদ্র রায় এবং কুহেলির ঘটনাটা আরও রঙিন হয়েছে মুখে মুখে। সেইসঙ্গে অমিয় জানতে পারল কৃষ্ণান আসেনি অফিসে। পুলিশের বড় কর্তারা অফিসের স্টাফদের জেরা করছেন। রুদ্র রায়, কৃষ্ণান এবং কুহেলি সেনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পুলিশের উকিল কোর্টের কাছে আবেদন রেখেছেন।

ধীরে ধীরে সরে এল অমিয়। সে যে কুহেলি সেনের জামাই একথা জানলে পাবলিক তার হাড় ভেঙে ফেলবে। লালদিঘির পাশে এসে সে দরখাস্তগুলো দেখল। এখন কি হবে? যাদের পাশে বসে রোজ অফিস করতে হবে তারা কি ছেড়ে কথা বলবে? এই কয়েক লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। অমিয়র মাথা ঘুরছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কেন পড়াতে গিয়ে অল্পবয়সী ছাত্রীর প্রেমে পড়ে সে বিয়ে করেছিল। সুজাতাকে বিয়ে না করলে আজ তাকে এই সমস্যায় পড়তে হত না।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যখন পুলিশ নার্সিংহোমে পৌঁছালো তখন কুহেলি আই সি ইউ-তে। কয়েক ঘণ্টা আগে বড়সড় হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তার। কোন জ্ঞান নেই। এই অবস্থায় রোগীর পক্ষে পালানো অসম্ভব ব্যাপার। পুলিশ ফিরে গেল। ভিজিটার্স রুমে পাথর হয়ে বসেছিল সুজাতা। কুহেলি বাঁচবেন কিনা তা ডাক্তার বাহাত্তর ঘণ্টা পরে বলতে পারবেন। সে শুধু জানিয়েছে যা টাকা লাগবে দেবে, চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়।

চব্বিশ

একমাস দশদিন পরে কুহেলিকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সুজাতা কিন্তু কুহেলি রাজি হলেন না। তিনি তাঁর নতুন ফ্ল্যাটে যেতে চান। সেখানে একা কুহেলির অসুবিধে হবে, দেখবার কেউ নেই। ডাক্তার ধীরে ধীরে ওঁকে হাঁটতে বলেছেন কিন্তু তার বেশি পরিশ্রম করা চলবে না। থিয়েটার রোডে গেলে সবসময় সুজাতার চোখের সামনে থাকতেন।

গত মাসটায় যে ধকল গেছে তা কোনদিন ভুলতে পারবে না সুজাতা। বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেলেও বুকে যন্ত্রণা থেকে গিয়েছিল। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করার পর ডাক্তাররা আবিষ্কার করলেন কুহেলিকে এখনই বাইপাশ অপারেশন করা দরকার। বাইপাশ করা হল। সাতদিনের মাথায় ধরা পড়ল ওঁর রক্তে সুগারের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে। সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে ইনসুলিন প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় রইল না। এখন ওঁকে সারাজীবন ইনসুলিনের সঙ্গে সহবাস করতে হবে।

ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লেখার পর ডাক্তার বললেন, 'একটা অনুরোধ করছি, উনি যে ঘরে থাকবেন সেখানে যেন কোনও আয়না না থাকে, টয়লেটেও না। বুঝতেই পারছেন আপনার মায়ের মনে খুব কষ্ট হবে।'

সুজাতা সেটা জানে। একটা সুন্দর শরীর একটু একটু করে এই কয়েকদিনে কিভাবে চুপসে যেতে পারে তা না দেখলে সে বিশ্বাস করতে পারত না। চুলগুলোর বেশিরভাগ সাদা হয়ে গিয়েছে, শীর্ণা বৃদ্ধার শরীর দেখে বোঝার উপায় নেই দেড়মাস আগে তাঁকে দেখে যে কোন যুবতী ঈর্ষায় জ্বলতো। নিজের হাত, আঙুল, শরীরের বাকি অংশ নিশ্চয়ই কুহেলি দেখতে পাচ্ছেন। মুখ দেখতে না পেলেও সেগুলো দেখে বুঝতে পারছেন সব। কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। নার্সকে আলাদা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনেছে সুজাতা, তাকেও কিছু বলেনি মা।

অতএব মায়ের ফ্ল্যাটে আসতেই হল। নতুন তালাচাবি লাগিয়ে গিয়েছিল সুজাতা। তবু দীর্ঘদিন বাদে মনে হল সেই রাত্রের গন্ধ এখনও ফ্ল্যাটে পাক খাচ্ছে। ট্যাক্সিতে এটুকু পথ এবং লিফটে ওপরে উঠে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন কুহেলি। সুজাতা দ্রুত বিছানা ঠিক করে তাঁকে শুইয়ে দিল। তারপর লেগে গেল ঘরটায় শ্রী ফেরাতে। নার্সিংহোমেই ঠিক হয়েছে দুজন আয়া বারো ঘণ্টা করে কুহেলির পাশে থাকবে। তারাই সব কিছু দেখাশোনা করবে। প্রথম কয়েকদিন কুহেলির দুবেলার খাবার সুজাতাই পৌঁছে দেবে। তদ্দিনে একটা হোল-টাইমার মহিলাকে চাই যে রান্না থেকে সব কাজ করে দেবে।

'সুজাতা!' কুহেলি নিস্তেজ গলায় ডাকলেন।

'বল।'

'এখানে একটু বস।' হাত দিয়ে বিছানার পাশটা দেখিয়ে দিলেন কুহেলি।

সুজাতা বসল, 'বল।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কুহেলি?

'কি দেখছ?'

'একি চেহারা হয়েছে তোর?'

'ছাড়ো তো—!'

'ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

'এদিকে তুমি ওদিকে তোমার জামাই, দুজনকে সামলাতে গিয়ে সময় পাইনি।'

'অমিয়, অমিয়র কি হয়েছে?'

'হার্টের গণ্ডগোল, অফিসে যেতে পারছে না। ছুটি নিয়ে বসে আছে।'

'কেন?'

'দুবেলা যারা বাড়িতে এসে হামলা করছে টাকার জন্যে তারা অফিসে ঢুকলে ছেড়ে দেবে? তবে ভাগ্য ভাল কেউ ওর নামে পুলিশের কাছে ডায়েরি করেনি।'

'সব আমার জন্যে, আমার দোষে।' চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে এল কুহেলির।

'তোমার কি দোষ? কয়েকমাস তো সবাই ঠিকঠাক সুদ পেয়েছিল। তুমি যখন সতর্ক করলে তখন তাই কেউ কান দেয়নি। আমি টাকাটা তুলে নিতে পারলাম, ওরা চেষ্টা করলে কিছুটা নিশ্চয়ই পেত। আরও সুদ পাওয়ার লোভে চেষ্টাই করল না। এই কথাটা ওদের মনে করিয়ে দেওয়ার পর সবাই খানিকটা থিতিয়ে গিয়েছে।' সুজাতা বলল।

'তুই এত খরচ কোত্থেকে করছিস?'

'তোমার জন্যে যে টাকা ফেরত পেয়েছিলাম সেই টাকা থেকে।'

'এভাবে নিজের টাকা নষ্ট করছিস!'

'নিজের টাকা নয় মা। মিস্টার পাকড়াশির টাকা। তাও যদি সেদিন অমিয়র কথা শুনে না তুলতাম তাহলে হাতে আসত না কোনদিন!'

'ওদের কারও খবর জানিস?'

'চীফ অ্যাকাউনটেন্টকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যেসব কোম্পানিকে তোমরা ধার দিয়েছিলে সেগুলো ফেরত দেবার জন্যে। কাগজে বেরিয়েছে যে টাকা পাবলিক ডিপোজিট রেখেছিল তার ষাটভাগ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। হওয়ার পর প্রত্যেককে ষাটভাগ টাকা ফেরত দেওয়া হবে।'

'কৃষ্ণান?'

'সে তার ছেলেমেয়ে বউকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। তার বাড়িতে সার্চ করে একটা টাকাও পাওয়া যায়নি। রুদ্র রায় দুবাইতে নেই। কোথায় আছে কেউ জানে না। বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট টাকা রুদ্র রায় আর কৃষ্ণান হাতিয়েছে। লোকটাকে পেলে আমি মেরে ফেলতাম মা।' সুজাতা উঠল।

পাখি এসেছিল বোম্বে থেকে ভাইকে নিয়ে। কুহেলির তখন বাইপাস হয়ে গেছে। হোটেলে উঠেছিল। তিনদিন দুবেলা নার্সিংহোমে গিয়েছিল। কুহেলি তখন ঘোরের মধ্যে ছিলেন। দিদিকে বলেছিল, 'মা মানুষ চিনতে ভুল করেছিল। ওরকম স্যাডিস্ট যে সে নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে আগেও কিছু না কিছু করেছিল। মা সেটা টলারেট করল কেন? যাক গে, তোদের অবস্থা তো এখন খুব খারাপ। আমি হাজার বিশেক দিতে পারি।'

সুজাতা বলেছিল, 'এখন থাক, লাগলে নেব।'

'বোম্বেতে এই কেসটা নিয়ে খুব রসালো আলোচনা হয়। আমি কাউকে বলিনি ওই ভদ্রমহিলা আমার মা। বলা যায়? বল্!'

ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে চলে গিয়েছিল পাখি। সেটা ব্যবহার করার ইচ্ছে হয়নি সুজাতার। কথাগুলো জানায়নি কুহেলিকে। শুধু বলেছে, পাখি এসে দেখে গেছে।

তদন্তকারী পুলিশের দল গিয়েছিল নার্সিংহোমে যখন কুহেলি কথা বলার মতো অবস্থায় পৌঁছেছেন। তিনদিন ধরে জেরা করেছে ওরা একটু একটু করে। তারপর সুজাতাকে বলেছে কোনও ভাল উকিলকে দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করতে। উকিল আদালতের কাছে জামিন চাইলে তারা আপত্তি করবে না। করেওনি। শরীরের কারণে আদালত কুহেলির জামিন মঞ্জুর করেছেন।

দুবেলার আয়া এসে গেল। তারা কাজ বুঝে নিল। একজন রাত আটটায় যাবে। আর একজন তার আগে আসবে। তার ছুটি হবে সকাল আটটায়। সুজাতার মনে হল এই দুজন মানুষ হিসেবে ভাল। রাত্রের খাবার রেঁধে খাইয়ে সুজাতা বাড়ি ফিরে গেল।

বেল দিতে কাজের লোক দরজা খুলল। সুজাতা শুনল দাদাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। বলেছে, রাত্রে কিছু খাবে না। অমিয়র ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। শিশুর মতো কুঁকড়ে ঘুমাচ্ছে লোকটা। দেখে খুব মায়া হল। কেন যে তাদের প্রেম হয়েছিল। না হলে ভাল থাকত অমিয়।

কৃষ্ণানকে ধরতে পারল না পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দিল্লির একটা গেস্ট হাউসে তারা হানা দিয়েছিল। দরজা ভেঙে ঢোকার আগেই কৃষ্ণান বিষ

খেয়েছিল। সম্ভবত পালানোর পরেই সে বিষ যোগাড় করে রেখেছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও পুলিশ তাকে বাঁচাতে পারেনি। রুদ্র রায় পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। তার কোন হদিস নেই। ফরাসি পুলিশ কোনও তথ্য জানাতে পারেনি।

পুলিশ চার্জশিট দেওয়ার পর কুহেলির উকিল জানালেন তাঁর মক্কেল গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার হাঁটাচলা করতে নিষেধ করেছেন। এ অবস্থায় তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক কারণ তাতে তাঁর প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির একজন কর্মচারী, অভিযুক্তের তালিকায় তাঁর নাম পুলিশ অন্যায়ভাবে জড়িয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখে আদালত আপাতত কুহেলিকে হাজিরা দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কুহেলির শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এক সকালে জোর করে জানলায় এলেন। বাইরের আকাশ কী ঝলমলে। হঠাৎ চোখ গেল নিজের হাতের কনুই-এর কাছে। কুঁচকে যাওয়া চামড়া ঝুলেছে কিছুটা। হাসলেন তিনি।

পৃথিবীতে মানুষ যখন জন্মায় তখন তার শরীরের চামড়া কুঁচকে থাকে। তারপর সেটা টানটান হয়। তারপরে চুল গজায়। বড় হয়। তারপর চোখে দৃষ্টি আসে। শেষে দাঁত ওঠে। না, শেষ দাঁতে নয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌবনের শুরুতে শরীর জানান দেয়। সেটা চলে দীর্ঘকাল। তারপর একটা দিন আসে যেদিন বন্ধ হয়ে যায় যৌবনধারা। তারপর দাঁত নড়ে, পড়ে। চোখে ছানি পড়ে, দৃষ্টি হয় ঝাপসা। চুল উঠে যায়। সবশেষে চামড়া যায় কুঁচকে। যেমন যেমন শরীর পেয়েছিল যাওয়ার আগে তেমন তেমন ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া।

তাঁর বয়সের মেয়েদের কাছে তিনি ঈর্ষার পাত্রী ছিলেন। কারণ তাঁর যৌবন নিটোল ছিল। প্রকৃতি যা দিয়েছিল তা ফেরত নিচ্ছিল না। এই মাস দুয়েকের মধ্যে এক ঝটকায় সব নিয়ে গেল নিয়তি। না, নিয়তি নয় কিন্তু কে তা তিনি জানেন না। প্রকৃতি তো নয়ই, প্রকৃতি তাঁকে নিঃস্ব করতে চায়নি।

এই ঘরে, বাথরুমে কোনও আয়না নেই। ওরা রাখতে দেয়নি। নিজের মুখ কেমন হয়েছে তা কুহেলি জানেন না। আঙুল বোলালে কিরকম অস্বস্তি হয়। তবু রুদ্রর কথা ভাবলে বুকে কষ্ট হয়। কেন পালিয়ে গেল রুদ্র? কেন বিশ্বাস করতে পারেনি তাঁকে? জ্ঞান ফেরার পর তিনি রুদ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন বলে ভেবে নিয়েছিল কেন? হয়তো কিছুই বলতেন না তিনি। রুদ্র তো তাঁকে এই ফ্ল্যাটে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়নি যেটা সে স্বচ্ছন্দে পারত। তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে, আগাম টাকা দিয়ে গেল কেন সে?

হঠাৎ মনে হল আজ যদি রুদ্র এসে সামনে দাঁড়াত তাহলে সব কিছু ভুলে

যেতে পারতেন তিনি। শুধু বলতেন, লোকগুলোর টাকা ফেরত দিয়ে দাও, প্লীজ।

টেলিফোন বাজল। আয়া বলল, 'মা, আপনার ফোন।'

ধীরে ধীরে কাছে এসে রিসিভার নিলেন কুহেলি, 'হ্যালো!'

'কেমন আছ তুমি?' শিবানীর গলা।

'আমি? আমি ভাল আছি।' হাসলেন কুহেলি।

'ফিরে এসে সব শুনলাম। এই অবস্থায় কি করে ভাল থাকো? আমার তো দুলাখ টাকা গেল। কিন্তু তুমি তো সব হারালে।' কাঠ কাঠ গলা শিবানীর।

কি বলবেন কুহেলি। সেটা ভেবে ওঠার আগে লাইন কেটে দিল শিবানী।

সুজাতার শরীর ভাঙছিল। দুটো ফ্ল্যাটে ছোটাছুটির পরিশ্রম, অমিয়র ব্যবহার এবং অসুস্থতা তাকে দুর্বল করে তুলছিল। সে ঠিক করল কুহেলিকে জোর করে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। কথাটা অমিয়কে বলতে সে ক্ষেপে গেল প্রথমে। চিৎকার করে বলল, 'রোজ পাওনাদারদের কেউ না কেউ এখানে আসছে। ওরা যদি ওনাকে দ্যাখে তাহলে আমাকে ছিঁড়ে খাবে। কোনও সিমপ্যাথি পাবো না। ভাববে ওঁর সঙ্গে আমিও প্যাক্ট করেছিলাম।'

'কিন্তু মাকে ওখানে একা রাখা ঠিক হচ্ছে না।' সুজাতা বলল।

'তোমার এত মাথাব্যথার কি আছে? অন্য কোনও ভাইবোন তো হাড়িকাঠে গলা বাড়ায়নি। যে যেমন পারে সরে গেছে। তোমার কি দরকার?'

'সেটা তুমি বুঝবে না।'

'আশ্চর্য। এই মহিলাই তোমাকে বিয়ে করতে চাও বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে?' অমিয় বলল।

'ওঁর কথা যদি তখন শুনতাম তাহলে—! যাক গে। আমি কিছুদিন মায়ের ওখানে গিয়ে থাকছি।'

'যেখানে ইচ্ছে যাও। তোমার কাছে নিশ্চয়ই টাকা আছে?'

'মানে?'

'মায়ের জন্যে এত করছ কিভাবে? যে টাকাটা তুলেছিলে সেটা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায়নি। আমাকে হাজার পাঁচেক দিয়ে যাও।'

তাই দিয়ে এসেছে সুজাতা। কিন্তু কলসির জল তো শেষ হয়ে এল। যদি মিস্টার পাকড়াশি তাঁর নামে টাকাটা না রেখে যেতেন—! ভাবতেই শিউরে উঠল সুজাতা।

ব্লাডসুগার কিছুতেই বাগে আসছে না কুহেলির। চেহারা আরও খারাপ হচ্ছে। উঠে বসলেই মাথা ঘোরে। সুজাতা আসায় তবু কথা বলার লোক পেয়ে একটু স্বস্তিতে আছেন। একদিন সকালে বেল বাজল। কাজের লোক দরজা খুলে

এসে জানাল, 'দিদি, ক্যুরিয়ার কোম্পানি থেকে লোক এসেছে।'

অবাক হয়ে সুজাতা গিয়ে দেখল একটি লোক স্যুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'ক্যুরিয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে আসছি। এখানে কুহেলি সেন নামে কেউ আছেন?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, আছেন।'

'এই দুটো জায়গায় ওর সই লাগবে। স্যুটকেসটা ওর নামে এসেছে।'

'কোত্থেকে?'

'বোম্বাই থেকে।'

'কিন্তু উনি খুব অসুস্থ। আমি সই করিয়ে আনব?'

'না দিদি। আমি না দেখে দিতে পারব না।'

'আসুন।'

কুহেলি বিছানায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। সুজাতা বলল, 'ইনি আমার মা। কুহেলি সেন।'

'আপনি কুহেলি সেন?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন কুহেলি।

'এই দুই জায়গায় সই করুন।' কলম এগিয়ে দিল লোকটা কাগজ দুটোর সঙ্গে। হাত কাঁপছিল কুহেলির। অনেক চেষ্টার পর সই হল। কাঁপা কাঁপা। নমস্কার জানিয়ে লোকটা চলে গেল।

'কিরে?' কুহেলি জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোম্বে থেকে স্যুটকেসটা পাঠিয়েছে কেউ।' সুজাতা ঝুঁকে স্যুটকেসের ওপর আঠা দিয়ে সাঁটা কাগজটা দেখল। টু কুহেলি সেন...। ফ্রম এ কে মহান্তি, চার্চ গেট, বোম্বে।

'এ. কে. মহান্তি নামের কাউকে চেনো?'

'না তো! ভুল করেনি তো লোকটা?'

'না। ওপরে তোমার নাম ঠিকানা লেখা আছে।'

টানাটানি করে বুঝল স্যুটকেস তালাবন্দী। দেখলেই বোঝা যায় বিদেশি স্যুটকেস। সুজাতা বলল, 'কি করে খুলব? চাবি নেই।'

বিকেলে একটা চাবিওয়ালাকে পাওয়া গেল। তাকে বলা হল চাবি হারিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়েছে। লোকটা আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষানিরীক্ষায় ডালা খুলতে পারল। সে যখন ঢাকনাটা খুলতে যাচ্ছে তখন বাধা দিল সুজাতা। 'থাক। হয়ে গেছে।'

'চাবি চাই না?'

'হ্যাঁ, চাই।'

লোকটা আরও পনেরো মিনিট সময় নিয়ে নকল চাবি দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে চলে গেল। স্যুটকেসে কি আছে তা দেখার কৌতূহল আয়া এবং রাতদিনের লোকের। কি সাপ ব্যাঙ বেরুবে বলে ওদের সামনে খুলল না সুজাতা। যদিও তার নিজেরও খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

সন্ধের পর ওরা যখন কেউ ঘরে নেই তখন স্যুটকেস খুলল সে। ওপরে একটা মোটা কাগজ। সেটা সরাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ, যেটা স্যুটকেসের মাপের ভেতরে টাইট হয়ে আছে।

প্লাস্টিকের ব্যাগের একাংশ ছিঁড়তেই চমকে উঠল সুজাতা। একশ টাকার বান্ডিলে ঢাকা রয়েছে ব্যাগটা। ওপরে একটা ভাঁজ করা কাগজ।

'এটা নিয়ে যেতে পারলাম না বলেই তোমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। ক্ষতিপূরণ নয়, ধরে নাও পুলিশের হাতে পড়ুক চাই না বলে পাঠালাম। তোমার কাজে লাগলে খুশি হব। আর—।'

ডালা বন্ধ করে খাটের তলায় স্যুটকেস ঢুকিয়ে রাখল সুজাতা। চিঠি দেখাল না কুহেলিকে।

মাঝরাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে তখন দরজা বন্ধ করে টাকাগুলো গুনল সুজাতা। আঠারো লক্ষ টাকা। হঠাৎ দেখল কুহেলি উঠে বসেছেন। অবাক হয়ে টাকাগুলো দেখছেন। চুপচাপ চিঠিটা এগিয়ে দিল সে।

'আমি পড়তে পারি না এই চশমায়!'

পড়ল সুজাতা। পড়া শেষ হলে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন কুহেলি। অদ্ভুত গলায় বলল, 'যাক বাবা, অমিয়র সব সমস্যা মিটে গেল। আর হ্যাঁ, শিবানীকেও টাকাটা ফেরত দিয়ে দিস। রুদ্র বাঁচিয়ে দিল।'

'বাধ্য হয়ে তোমাকে ভালবেসে দেয়নি। লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি বলে এখানে পাঠিয়েছে। বাকি টাকা তো চমৎকার সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে?' সুজাতা বলল।

'কি জানি! আমাকে দায়মুক্ত করে দিল। কজন দেয়।' চোখ বন্ধ করলেন কুহেলি। তার ঠোঁটে অদ্ভুত মিষ্টি হাসি। সন্দেহ হল সুজাতার। দ্রুত পাশে গিয়ে নাড়ির স্পন্দন খুঁজতে চেষ্টা করল সে। শরীর এখনও তপ্ত কিন্তু নিথর। অথচ হাসিটা রয়ে গেছে ঠোঁটে। ঠিক আগের মতো, সুন্দরী কুহেলি যেমন হাসতেন।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল সুজাতা।